ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

(তৃতীয় খণ্ড)

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান

BAZAR READING LIBRARY

প্র-১১৮

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২ হ্যারিসন রোড, :: :: কলিকাতা

প্রকাশক
ব্রজবিহারী বর্ম্মণ
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৯৪৬

[আড়াই টাকা]

প্রিণ্টার—
শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
মনোমোহিনী প্রেস
১১৮-এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকা

সূচীপত্র

প্র-২২৬

[এক]

সমাজবিজ্ঞান

১। সমাজবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য ১
২। ভারতীয় জাতিতত্ত্ব ৬

[দুই]

হিন্দু সমাজবিজ্ঞান

১। হিন্দু সমাজবিজ্ঞান ১৪
২। তাবু-তত্ত্ব ১৫
৩। হিন্দুবর্ণ-তত্ত্ব ২০
৪। শ্রেণী-তত্ত্ব ৩৩
প্রাচীন ইরাণের পদ্ধতি ৩৩
৫। জন-তত্ত্ব ৩৭
৬। গোত্র-পদ্ধতি ৪৪
৭। গোত্র-তত্ত্ব ৫৪
৮। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আক্রমণশীলতা ৭৩
৯। নব-হিন্দুর মর্য্যাদা ৭৮
১০। হিন্দু সামাজিক রাষ্ট্র ৮০
১১। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ ৮৬
১২। অসবর্ণ বিবাহের সন্তান ৯০
১৩। বিবাহ-পদ্ধতি ৯৪
১৪। দশকর্ম্ম-পদ্ধতি ১০৫

১৫। হিন্দু আইনের ভিত্তি ১০৯
১৬। হিন্দু আইনের বিভাগ ১২১
১৭। হিন্দু কৃষ্টির উৎপত্তি ১৩৬
১৮। হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান ২০১

[তিন]

মুসলমান সমাজবিজ্ঞান

১। ভারত ও ইসলাম ১৫৯
২। ভারতীয় মুসলমান সমাজ-তত্ত্ব ১৭০
৩। মুসলমান সমাজে 'লোকাচার' ১৭৪
৪। উভয় ধর্ম্মের ভাব-বিনিময় ১৭৫
৫। মুসলমান জাতি-তত্ত্ব ১৭৯
৬। পারস্পরিক সামাজিক অ-সহযোগ ১৮৫
৭। উভয়ের আচারের সাদৃশ্য ১৮৭

[চার]

খৃষ্টীয় সমাজবিজ্ঞান

১। খৃষ্টীয় সমাজ-তত্ত্ব ১৯৫

BAGHBAZAR READING LIBRARY
Call No. ....
Accession No. ....

ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান

[এক]

সমাজবিজ্ঞান

১। সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য

ভারতীয় সমাজের সুদীর্ঘ আলোচনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে ভারতের ইতিহাস অতি বিস্তৃত। বোধ হয় চীনের জাতীয় জীবনের ইতিহাস অপেক্ষাও ভারতীয় জাতির ইতিহাস প্রাচীন। এইজন্য ভারতীয় সমাজকে নানা সময়ে নানাবিধ আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, সমাজ স্থিতিশীল (Static) নহে, ইহা গতিশীল (kineto-dynamic); এইজন্য সনাতন অবস্থা বা ধারা বলিয়া সমাজে কোন কিছু থাকে না।

সমাজ-দেহের মধ্যে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই জগত চলিতেছে। যে হেগেলীয় দর্শনশাস্ত্র আজ জগতের বেশীর ভাগ ভাবুক (১) এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলে—চিন্তাক্ষেত্রের প্রতিপাদ্য (thesis), তদ্বিপরীতাবস্থা বা দ্বন্দ্ব (anti-thesis) এবং দ্বন্দ্ব-সমন্বয় (synthesis) পদ্ধতিতে একটি অনুষ্ঠান (phenomenon) বা প্রতিষ্ঠান (institution) উদ্ভূত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে বিবর্ত্তনের (evolution) অন্তর্গত 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম' (struggle for existence) নামকরণ করেন। এই বিতর্কের ধারা সমাজক্ষেত্রে প্রয়োগ

১। Mackieffert—Moral Ideas of the Nineteenth Century. দ্রষ্টব্য।

করিলে দেখা যায় যে সমাজক্ষেত্রেও নানা প্রকারের সংগ্রাম চলিতেছে। যখন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তখন উহাকে 'জাতির বহির্ভাগের দ্বন্দ্ব' (extra-racial struggle) বলা হয়, আর যখন, একটা জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় তখন তাহাকে 'জাতির অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব' (intra-racial struggle বা competition) বলা হয়। আর যখন একটা জাতির বিভিন্ন স্বার্থ-সম্বলিত লোক-সমষ্টির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা আধিপত্যের জন্য দ্বন্দ্ব হয় তখন তাহাকে 'শ্রেণী-সংগ্রাম' (class-struggle) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মানব সমাজে যেদিন হইতে শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে সেইদিন হইতেই তাহাদের দ্বন্দ্ব ভাবের উদয় হইয়াছে। এইজন্য বলা হয়, সমাজ একটি যুদ্ধক্ষেত্র, নানাপ্রকারের স্বার্থ এখানে দ্বন্দ্ব করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই সব দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই সমাজ চলিতেছে। সমাজ গতিশীল—ইহা কখন একস্থানে বসিয়া থাকে না, স্থাণুবৎ অবস্থান অর্থই মৃত্যু। দ্বন্দ্ব-বিহীন সমাজ নাই ; তবে আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতা (class-collaboration); কিন্তু ইহা দ্বন্দ্বের অবসানের বা দ্বন্দ্ব-বিহীনতার ফল নয়—বরং দ্বন্দ্বের ফলে একটা শ্রেণীর অপরাপরের উপর স্বীয় শক্তিবলে শাসন করা মাত্র। ইহা দ্বারা একটা স্বার্থকে অপর একটা শক্তিমান স্বার্থ দ্বারা দমন করা হয় মাত্র। এতদ্বারা সকল স্বার্থের বৈষম্য দূরীকরণ অথবা সর্ব্ব-স্বার্থের সম্মিলন হয় না। এইজন্য সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ মধ্যে কি কি শ্রেণী-স্বার্থ প্রকাশ পাইতেছে, শ্রেণীসমূহের স্বার্থের রূপ কি, এই সকল স্বার্থ কেন উদ্ভূত হইল, কোন্ স্বার্থের দ্বারা কি কি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিধিনিষেধসমূহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করেন। এক কথায়, সমাজ-তত্ত্বের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—একটা অনুষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠান কেন উদ্ভূত হইল, কি প্রকারে হইল এবং কি জন্য হইল তাহা জানা। (২)

২। Lester. F. Ward—Applied Sociology.

নির্ভর করে। জাতিতত্ত্ববিদেরা প্রাচীন অনৈতিহাসিক এবং বর্তমানের বর্ব্বরাবস্থায় অবস্থিত জাতিগুলির (Races and tribes) আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলির অনুসন্ধান করেন এবং কেন সেইগুলি উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করেন। সমাজতত্ত্ববিদেরা তুলনামূলক পরীক্ষা দ্বারা তন্মধ্যে কি কি সর্ব্বজনীন মূলসূত্র নিহিত রহিয়াছে তাহার নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। সমাজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান। ইহা দ্বারা মানব সমাজের অনেক রহস্য উদঘাটিত হয় এবং ফলে লোকের কুসংস্কারও বিদূরীত হয়।

জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদগণ বলেন, আজকাল জগতে অসভ্য (savage) বলিয়া কোন জাতি নাই। সকল জাতিই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা গঠিত হইয়াছে; যে-জাতি তাহার প্রতিকূল বাতাবরণ হইতে যত বিমুক্ত হইয়া নূতন অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাকে তত অগ্রগমনশীল জাতি বলিয়া গণ্য করা হয়, যে যত প্রাচীন সংস্কার ও বিধিনিষেধের নাগপাশে আষ্টে পৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া স্থাণুবৎ অবস্থান করে সেই জাতি বা লোকসমাজকে তত পশ্চাৎভাগে অবস্থিত বলা হয়।

মানবের সংস্কার, আইন-কানুন, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এবং বিধি-নিষেধ সমূহের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এইগুলির পশ্চাতে থাকে totemistic beliefs (৩) (গাছ পাথর ও জলকে পূর্ব্বপুরুষ, অতএব পূজ্য এবং তৎপ্রসূত বিধিনিষেধে বিশ্বাস) বা তদপেক্ষাও প্রাচীন ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক) ও তুকতাকে বিশ্বাস (magic and witchcraft)। আজ পর্য্যন্ত কোন জাতি বা ধর্ম্ম এই বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। সমষ্টি সম্বলিত একটা জাতি (ethnic unit) এইসব বিশ্বাস ধারণা লইয়াই প্রথমাবস্থায় সমাজবদ্ধ হয় (৪)। সমাজের অনুষ্ঠান

৩। S. Freud—Totem and Taboo.

৪। E. Durkheim—The Elementary Forms of the Religious Life.

ও প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি অর্থনীতির উপর স্থাপিত। অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানাদিরও রূপান্তর হয়, তজ্জন্য সামাজিক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হয়। যে-জাতির প্রতিষ্ঠানসমূহ যত বিচারমূলক পরীক্ষা-প্রসূত জ্ঞান (empirical knowledge) দ্বারা স্থাপিত, সেই জাতি তত উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে। অন্য কথায়, যেজাতির মধ্যে যত জ্ঞানবাদ বিচার দ্বারা (Rationality) তাহার সমাজ গঠিত হয় সেই সমাজ তত উন্নত।

এইসব জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি চাবিকাঠি দ্বারা ভারতীয় সমাজের বিবর্ত্তনের রূপ আবিষ্কার করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানকালীন জাতি-বিজ্ঞানের ও সমাজ-বিজ্ঞানের জ্ঞান দ্বারা বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যগুলির অনুসন্ধান হয় নাই। প্রথমতঃ খৃষ্টীয় মিশনারীদের মাপকাঠি দ্বারা এইগুলি বিচার হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্য-বাদীয় চক্ষু দিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় কৃষ্টির স্থান নিরূপিত হইতেছে এবং আমরা তাহা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া নিজেদের বিচার করিতেছি। প্রাচীন এশিয়া, প্রাচীন ও মধ্য যুগীয় ইউরোপীয় দেশসমূহের সমাজের অভিব্যক্তির সহিত তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভারতীয় সমাজ ও তাহার কৃষ্টির বিবর্ত্তন এক প্রকারেরই গতির ধারায় চলিয়াছে, অর্থাৎ ভারত সৃষ্টিছাড়া দেশ নয়, ইহার সমাজতত্ত্বের ধারা অন্য দেশের ন্যায়। প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎকালীন বহির্জগতেরই অনুরূপ ছিল, ভারতে এমন-কিছু অদ্ভুত অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাই যাহা সাধারণতঃ মানবজাতির বহির্ভূতাবস্থা। Rhys Davids (৫) সত্যই বলিয়াছেন যে বুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সমাজে যেসব আইন-কানুন বা প্রতিষ্ঠান-সমূহ ছিল তৎকালীন ভূমধ্যসাগরীয় জগতেও তাহার প্রচলন ছিল। এগেলিকও

৫। Rhys Davids—Dialogues of Buddha. P 99.

(৬) সত্যই বলিয়াছেন যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের ও আহারের বিধি-নিষেধ গ্রীক্, জার্মান, রুশ প্রভৃতি অন্য আর্য্য কৌমদের মধ্যে প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণাদি সংগৃহীত হইতেছে (৭)।

হিন্দুর যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ, খাদ্যাখাদ্যের বিচার, স্পর্শদোষ, বর্ণ-ভেদ, স্বীয় সমাজ মধ্যে বিবাহ (endogamy), সামাজিক স্তর-ভেদ, পৌরহিত্য-বাদ, জন্তু ও বৃক্ষাদির প্রতি দেবত্ব আরোপ, মূর্ত্তিপূজা, আচার, নানা প্রকারের সংস্কার, (যাহাকে আজকাল কুসংস্কার বলা হয়) বৈর-দেয়, বদলী প্রথা, বর্ণ প্রাধান্য প্রভৃতি দ্বারা আজ হিন্দু তথাকথিত সুসভ্য জাতিসমূহ হইতে পৃথকরূপে চিহ্নিত হইয়াছে, এইসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন এশিয়া এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে অজ্ঞাত ছিল না। এইগুলি ভারতের বৈশিষ্ট্যও নয়, হিন্দুর বৈচিত্র্যও নয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার বিবর্ত্তনের ধারার সহিত আসে এবং পরিবর্ত্তনের সঙ্গে চলিয়া যায়। এ-সবের জন্য হিন্দু চির-অভিশপ্ত নয়, তবে যেসব সুবিধা পাইয়া পাশ্চাত্য জাতিগুলি আজ উন্নত রাজনীতিক কারণবশতঃ হিন্দু বহুদিন হইতেই তাহা হইতে বঞ্চিত। এইজন্য হিন্দুর বিবর্ত্তন বাধা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎগমনশীল হইয়াছিল।

কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় এই যে হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থাকে সনাতন ভাবিয়া অনেকে উহা কায়েমী করিতে চাহেন এবং মনে করেন যে এই অবস্থাই তাহাকে

৬। Eggling in 'Encyclopædia of Religion and Ethics' quoted in 'Man in India' vol. XIV. No. 4, P 98.

৭। এই সব বিষয়ে Hasting's "Encyclopædia"; Jastro—'Aspects of Religious Belief and Practice in Babylonia and Assyria'; J. J. Modi—Anthropological Papers. pt II; Wilkinson—The Manners and Customs of the Ancient Egyptians; C. Handy—"The Problem of Polynesian Origins; N. Warde Fowler—"Religious Experiences of the Roman People" দ্রষ্টব্য।

বাঁচাইয়া রাখিবে। তাঁহারা বর্ত্তমানের সামাজিক অবস্থাকে শাশ্বত ভাবিয়া বেদে দেখিতে চাহেন! কিন্তু সকল সমাজেরই উত্থান, পতন ও পরিবর্ত্তন আছে, এ-বিষয়ে আমরা ভুল করি কেন? আমাদের অতীতের জীবনকে বুঝিবার জন্য ভারতীয় সমাজের সমাজ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণাও আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইবে। কি-কি অর্থনীতিক-সামাজিক শক্তি দ্বারা অতীতের সমাজ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, কি-কি দ্বন্দভাব দ্বারা এই সমাজ ক্রম-বিকশিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন।

আজ ভারতের সকল প্রদেশ নানা প্রকারের গবেষণা দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। এখানে ঐ সকল তথ্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া গোটাকতক কথা আরও আলোচনা করিয়া উক্ত প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

ভারতীয় জাতিতত্ত্ব

ভারত নানা মূলজাতীয় লোকের (Biotype) সম্মিলন স্থল। হিন্দু বলিলে একটা বিশুদ্ধ রক্ত-বিশিষ্ট জাতি বুঝায় না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই মহাদেশের লোকদের আকৃতি, ভাষা ও উচ্চারণ, আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার কথা জানিতেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতে সকল প্রকারের লোককে একটা নিখিল-ভারতীয় শাসনের অন্তর্গত করিয়া এক ছাঁচে ঢালিয়া একত্বপূর্ণ একজাতি (homogeneous nationhood) করা দুঃসাধ্য ছিল। কেবল অশোকের সময়ে একবার এ-বিষয়ে কথঞ্চিৎ চেষ্টা হয়। * হয়ত সেই প্রচেষ্টারই ফলে আজ সকলে নিজকে ভারতবাসী বলিতে শিখিয়াছে। গুপ্তযুগে ভারত একটা নূতন ছাপ প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলে বর্ত্তমানের হিন্দুর কাঠামোটা প্রাপ্ত হয়। রাজনীতিক একত্ববোধ সৃষ্ট হইতে পারে নাই বলিয়া হিন্দু প্রাচীন গ্রীস ও উনবিংশ

---

* E. B. Havell—"The History & Aryan Rule in India"

শতাব্দীর জার্ম্মানীর ন্যায় কৃষ্টিগত একজাতীয়তা (cultural nationality) ভাব উদ্ভূত করিয়াছিল। বেদের নদী-স্তুতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া তন্মধ্যে ভারতের দক্ষিণের নদী কাবেরীকে উল্লেখ করিয়া পৌরাণিক নূতন নদী-স্তুতি রচিত হইয়াছে এবং আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথকে এক সংস্কৃতির অন্তর্গত "ভারতবর্ষ" আখ্যা প্রদান করা (৮) এই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই কৃষ্টিগত একজাতীয়তার ফলে আজ কাশ্মীরের লাল মুখ ব্রাহ্মণ, বাংলা ও মাদ্রাজের কাল মুখ ব্রাহ্মণ এক গোত্রীয় ও এক বর্ণের লোক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। আজ সমগ্র ভারতে হিন্দু নামধারী ব্যক্তিরা একই মুহূর্ত্তে, একই মন্ত্রে, একই প্রকারের উপাসনা করেন এবং সকলেই গৃহ্যসূত্র-প্রসূত সংস্কারাদি সম্পাদন করেন। রাজনীতি ও ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও হিন্দুর একত্বের ইহা জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

ভারতীয় সমাজের লিখিত বিবরণ বেদের সময় হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া গৃহীত হয়। বেদের জনসমূহ কোন্ মূলজাতীয় লোক ছিল তদ্বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা গণ্ডগোল বাধাইয়াছেন। ম্যাক্সমূলার ইউরোপের ইণ্ডো-ইউরোপীয়-ভাষীদের "আর্য্য" নামকরণ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে "আর্য্য" শব্দটি ইউরোপীয় রাজনীতিক আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে (৯)। ইউরোপের প্রত্যেক বড় জাতিই নিজেদের অকৃত্রিম ও আদি আর্য্য বলেন এবং নিজেদের শারীরিক লক্ষণসমূহ এই কল্পিত আর্য্যের প্রতি আরোপ করেন। ইহাদের মধ্যে জার্ম্মানরা খুব বড় গলায় নিজদিগের কল্পিত পূর্ব্বপুরুষ "গার্ম্মানদের"

৮। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যাহা সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণ তাহার নাম ভারতবর্ষ (২।৩।১)...ইহার পূর্ব্বদিকে কিরাতগণ পশ্চিমে যবনেরা অবস্থান করিতেছে এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন" (২।৩।৯)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হইয়াছে, "হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত স্থান পুণ্যক্ষেত্র ভারত নামে প্রসিদ্ধ..." (৫৯তম অধ্যায়, ৯১)।

৯। Ripley—European Races—Aryan Controversy.

(German) খাঁটি ও আদিম "আর্য্য" বলেন এবং মধ্যযুগীয় তথাকথিত টিউটনদের সেই জাতির প্রতীক স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র তাহার অনুসরণ করিয়া "গার্ম্মাণ" আর্য্যদের কৃতিত্বের চিহ্ন আবিষ্কার করিতে থাকেন। এই সময়ে এই মতকে "Germanism" (১০) (জার্ম্মানবাদ) বলা হইত। জার্ম্মান পণ্ডিতেরা এই গার্ম্মান-আর্য্যদের উপর মানব শরীর ও চরিত্রের উৎকর্ষতা আরোপ করেন। এইজন্য ফরাসী লেখক ফিনো (১১) ঠাট্টা করিয়া বলেন, "আর্য্য" মতটি ইণ্ডো-ইউরোপীয় মতে পরিণত হয়, তাহা আবার জার্ম্মান —'Allemand' মতে পরিণত হয়"। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে ফ্রান্সে কেল্টিক মতবাদ (Celticism) সৃষ্টি হয়। তাঁহারা বলেন, গোলমাথা-সরু-নাক ও brunette গাত্রের বর্ণ-বিশিষ্ট জাতিটি (যাহা ফ্রান্স হইতে পামীর উপত্যকা পর্য্যন্ত জায়গায় বসবাস করে) তাহারাই আসল আর্য্য। এই জাতিটির নামকরণ করা হইয়াছে "Alpine" এবং ইহার এসিয়াস্থিত শাখাকে "Armenoid" বলা হয়। ইটালির সার্জি এবং ইংলণ্ডের টেলরও এই মত সমর্থন করেন (১২)।

কিন্তু এই জার্ম্মাণবাদ জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যবাদীয় মতে পরিণত হয় এবং ইংলণ্ডেও তাহা গৃহীত হয় (১৩)। শেষে তাহার ধাক্কা আমেরিকায় পৌঁছায়। ইংলণ্ডের লোকেরা টিউটন-ভাষী বলিয়া জার্ম্মাণ মতবাদ তথায় অনেকের দ্বারা আদৃত হয়; তাহারা ও জার্ম্মাণরা উক্ত মতবাদের চাবিকাটি দ্বারা ভারতের জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব নিরূপণ করিতে থাকেন। ইহার ফলে তাহারা বৈদিক-আর্য্যভাষীদের মধ্যে "গার্ম্মান"

১০। Sergi—The Mediterranean Race.
১১। J. Finot—"L'agonie et mort de Race.
১২। Taylor—The Origin of the Aryans.
১৩। Ramsay Muir—Nationalism and Internationalism.

খুঁজিতে থাকেন এবং বলেন যে এই শ্বেতকায় আর্য্য ও কৃষ্ণকায় অনার্য্য (আদিম) অধিবাসীদের সংঘর্ষের ফলে হিন্দুর জাতিভেদ ও তজ্জাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। আমরাও ইহাদের মুখে ঝাল খাইয়া তাহাকে শাশ্বত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং উপন্যাসে, কাব্যে, গাথায় ও প্রবন্ধে এই উজ্জ্বল-শ্বেত (blonde) গার্ম্মান ও অশ্বেত আদিম ভারতীয়ের সংগ্রাম লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি। আর অতি উৎসাহীরা বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্যে উহার নজীর খুঁজিয়া বেড়ান। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর মতের চাকা ঘুরিয়া যায়, জার্ম্মান মতবাদীরা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারেন; কারণ, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে ভূ-গর্ভ হইতে আদিম প্রস্তর যুগের শেষকালীন ভূ-স্তরে একই গর্ত্ত মধ্যে গোল মাথা ও লম্বা মাথার নর-করোটি আবিষ্কৃত হয়! এই জন্য জার্ম্মান মতবাদ যাহা পূর্ব্বে লম্বা মাথা সরু-নাক-দীর্ঘাকৃতি লক্ষণ-বিশিষ্ট টিউটনকেই খাঁটি আর্য্য বলিত, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া নর্ডিক মতবাদে (nordicism) রূপান্তরিত হয়। এক্ষণে তাঁহারা বলেন, আদিম উত্তর-ইউরোপীয় জাতি উভয় প্রকারের করোটি-বিশিষ্ট; তবে তাহারা নীল চক্ষু ও কটা চুল বিশিষ্ট, অতএব ব্লণ্ড এবং তজ্জন্য তাহাদের "নর্ডিক" (উত্তর-ইউরোপীয়) নামে চিহ্নিত করা হউক। কিন্তু ইউরোপের উত্তর-পূর্ব্বকোণে এই আকৃতি-বিশিষ্ট লোকেরা মঙ্গোলীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন। সেইজন্য কেহ কেহ তাহাদিগকে East Baltic race (পূর্ব্ব-বাল্টি মূলজাতি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ব্রডস্কী (Jochelson-Brodsky) সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে এক তাতার-জাতির সন্ধান বাহির করেন; তাহারা 'ব্লণ্ড'-লক্ষণযুক্ত! এইজন্য জার্ম্মানীর আইক্‌ষ্টেড (Eickstedt) এবং ইংলণ্ডের হ্যাডন (Haddon) Proto-nordic (নর্ডিক-পূর্ব্ব) বলিয়া একটা কল্পিত জাতির সৃষ্টি করেন। ইহারা বলেন, এই জাতিই সাইবেরীয়ার এই স্থান হইতে ইউরোপে গিয়া নর্ডিক হয় এবং ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কোন কোন ভারতীয় নরতত্ত্ববিদ্ এই Proto-nordic-দের বৈদিক-আর্য্যরূপে

ভারতে শুভাগমন করাইয়াছেন। কিন্তু ইহাও নর্ডিক মতবাদের রূপান্তর এবং একটা গোঁজামিলনরূপ মত মাত্র।

একণে অ-জার্মানরা নর্ডিক মতবাদকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। হ্যাডন (১৪) বলেন, মূলজাতি (Race) বলিয়া আর কোন বিশুদ্ধ জাতি নাই। ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণ মিশ্রিত। একণে Ethnic units, অর্থাৎ এক কৃষ্টি-সম্বলিত জাতিসমূহই জগতে আছে ; আর চাইল্ড (১৫) বলিতেছেন— নর্ডিকদের দেবত্বে উন্নীত করিবার প্রচেষ্টাকে সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব-বিজয় পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে এবং 'আর্য্য শব্দটি ভয়ানক দল সমূহের দলগত ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে— The apotheosis of the Nordics has been linked with the policies of imperialism and world domination. The word 'Aryan' has become watchword of dangerous factions. "। ভিয়েনার Anthropos পত্রিকার সম্পাদক কপ্পরস্ বলেন, ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য্য প্রশ্নটির সমাধান করিবার সময় এখনও আসে নাই এবং বেশীর ভাগ জাতিতত্ত্ববিদ্ এখনও ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের প্রাচ্য দেশীয় উৎপত্তির মত পোষণ করেন (১৬)। এই প্রকারে দেখা যায় যে আর্য্য মতবাদ রাজনীতিক ও জাতীয় সংস্কারের আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছে (১৭)।

১৪। Haddon and Huxley—"We Europeans"

১৫। V. G. Childe—"The Aryans"

১৬। W. Koeppers—"Die Indo-Germanen Frage im Lichte der historis chen Voel kerkuude"—Anthropos, BK 30 ; 1935.

১৭। Dr. B. N. Datta—Vedic Funeral Customs and Indus Valley Culture"—Man in India ; vol. xvi—No 4 & vol. xvii—No. 1.

কিন্তু বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা যাহাই বলুন না কেন, আমাদের দেশেও একদল বৈজ্ঞানিক ভারতে নর্ডিকের অনুসন্ধান করেন। তাঁহারা বৈদিক আর্য্যের সহিত নর্ডিককে সনাক্ত (identified) করিতে চান এবং তাহাদের অনুসরণ করিয়া অনেক ভারতীয় ভারতে 'নর্ডিক' খোঁজেন। অনেকে হিন্দুর জাতি-ভেদকে সমর্থন করিবার জন্য নর্ডিক মতবাদকে ধরিয়া আছেন! বোধ হয়, বর্ণাশ্রম-প্রসূত বনিয়াদী স্বার্থকে বাঁচাইবার শেষ চেষ্টা হইতেছে Race-Theory দ্বারা উহার সমর্থন।

পুনঃ হিন্দুর বর্ণভেদকে এক-এক শ্রেণীর গাত্র বর্ণের সহিত সনাক্ত করিয়া আরও গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইউরোপীয় এবং তাহাদের শিষ্যেরা ব্রাহ্মণ বর্ণ-শ্বেত, অতএব শ্বেতবর্ণের মূলজাতীয় লোক ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিয়া নানা মূল-জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে (Race-admixture) হিন্দুর জাতিভেদের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা প্রাচীন পারস্যের সমাজ-পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে তথায় প্রাচীনকালে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজেদের পার্থক্য প্রকাশ করিত। শুক্ল বর্ণ বিশুদ্ধতার পরিচায়ক বলিয়া অথর্ব্বান পুরোহিতেরা শ্বেতবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিত (Dinkard. Vol. 5. 1 ; P 299) ; যোদ্ধারা রক্তবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিত (Dinkard. Vol. 5, P 299) ; আর সাধারণ লোক শোকের চিহ্নস্বরূপ কাল ও নীলবর্ণের বস্ত্র পরিধান করিত (১৮)।

এক্ষণে কথা এই ভারতীয়েরা কোন্ মূলজাতীয় লোক? অধিকাংশ নরতত্ত্ববিদ্ তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean Race) জাতির অন্তর্গত বলেন। মধ্য-এশিয়ার আনউ (Anau) সহরের ভূগর্ভে তিন চারি হাজার অথবা ততোধিককাল পূর্ব্বের স্তরে যেসব নর-করোটি প্রাপ্ত হওয়া

১৮। Dhalla—Zoroastrian Civilization, P 365.

গিয়াছে তাহা ভূমধ্যসাগর জাতীয় বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে (১৯)। পারস্তের লোকদের সাধারণতঃ এই মূলজাতীয় লোক বলিয়া গণ্য করা হয় (২০)। বর্ত্তমানে জার্ম্মান নরতত্ত্ববিদ্ আইকষ্টেডট (২১) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে উত্তর-ভারতীয় (পঞ্জাব ও মধ্যদেশ) এবং দক্ষিণ-ভারতীয়েরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। তবে আরমেনইড জাতীয় এবং অন্যান্য মূল-জাতীয় লক্ষণের লোকও ভারতে আছেন। মার্শাল বলিতেছেন, পঞ্জাবের লোক চিরকালই মিশ্রিত জাতি (২২)। আফগানীস্থানেও মলিন বা কাল গাত্র বর্ণের লোক রহিয়াছে। আর দেখা যায় যে, বেদের কয়ক ঋষি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। তাহা হইলে রক্ত বা শ্বেত-বর্ণের জাতি আসিয়া কৃষ্ণকায় ভারতীয়দের জয় করিয়া বর্ণভেদ (জাতিভেদ) সৃষ্টি করে এবং এই মূলজাতিগত বৈষম্যের উপর জাতি-পদ্ধতি বিবর্ত্তন করে, এই কথা উঠে না।

তাহা হইলে বর্ণভেদ কি প্রকারে উদ্ভূত হইল—পুনরায় এই কথা উঠে। হিন্দুদের ধারণা যে ইহা ভগবৎ-সৃষ্ট—ঋকবেদের "পুরুষ-সূক্তে" ইহা উল্লিখিত আছে। এই অপৌরষেয় ব্যবস্থা হিন্দুজাতির পক্ষে চিরন্তন। কিন্তু প্রাচীন অন্যান্য দেশের সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তির বৃত্তান্তের সহিত তুলনা করিলে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে প্রাচীন ইরাণেও উক্ত প্রকারের ধারণা ছিল। তথায়

১৯। Sergi in Pumpelly's "Exploration in Turkestan": Carnegie Publications, No 73.

২০। Daniloff—"Characteristics of the Persians" (In Russian).

২১। Eickstedt—Rassenkunde Und Rassengeschichte der Menschheit.

২২। Marshal—Mahenjo-daro and Indus Valley Civilization, Vol. I.

শরীরের বিভিন্নাংশ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের উদ্ভবের কথাও আছে (২৩)। প্রাচীন চীনে চৌ (Chou) বংশের রাজত্বকালে চীনের সমাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং পেশা বংশগত ছিল (২৪)। তৎপর ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়াতে ঠিক হিন্দুদের ন্যায় সমাজব্যবস্থা ছিল; আর গ্রীসে, আইওনীয়াতে এবং প্রাচীন এসিয়া মাইনরে সমাজ চারিভাগে বিভক্ত ছিল। সত্যই রামসে বলিয়াছেন—In Ionia, in European Greece, on the Anatolian plateau and in India we must suppose that here did exist once a social state, which was adopted to the four-fold way of life. (২৫)—আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আইওনিয়া, ইউরোপীয় গ্রীস, আনাটোলিয়ার উপত্যকা এবং ভারতে এক সময়ে এমন এক সামাজিক রাষ্ট্র ছিল যাহা জীবনের কর্ম্মকাণ্ডকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। সর্ব্বশেষ দেখা যায় যে, খোদ ইংরেজ ও জার্ম্মানদের টিউটনিক পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে এই ধারণা ছিল। সাগাতে বলে যে রিগ দেবতা তিন প্রকারের আকৃতি বিশিষ্ট তিন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেন—Thrall (দাস) Karl (কৃষক), Jarl (যোদ্ধা) (২৬); আবার, Heimdall সাগাতে (Saga) Jarls, Yeomen এবং Thralls এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। এবং পুরুষসূক্ত অপেক্ষা এই টিউটনিক গল্পে আরও সুস্পষ্টরূপে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের আকৃতিরও পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে, অথচ ইউরোপীয়েরা তন্মধ্যে বিভিন্ন মূলজাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইলেন না, অন্যপক্ষে

২৩। Dr. Dhalla—"Zoroastrian Civilization, P 285; "Dinkard"—Vol. I, P 37.

২৪। Li Ung Bing,—"Outline of Chinese History": Chap X, P 48.

২৫। Sir William Ramsay—"Asianic Element in Greek Religion" P 246.

২৬। Mc Culloch—The Mythology of all Races; Eddic—ch. 17; Bluntschli—The Theory of the State.

হিন্দুর বর্ণভেদে তাঁহারা বিভিন্ন মূলজাতির সন্ধান পাইলেন। আসলে, এই তুলনামূলক পাঠ দ্বারা এই সন্ধান পাই যে প্রাচীন ইণ্ডো-ইউরোপীয় এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় জাতিসমূহের মধ্যেও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সমাজ-পদ্ধতি ছিল ; ইহা শুধু ভারতেই ছিল না।

[দুই]

১ হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞান

এক্ষণে কথা এই যে, ভারতে এই সামাজিক ভেদ বর্ত্তমানের জাতিভেদরূপে কি প্রকারে বিবর্ত্তিত হইল। হিন্দুর বর্ত্তমান জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে ; তন্মধ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে আজকাল ইহার উৎপত্তি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন (২৭)। ইহা এক একটি পেশা লইয়া এক একটি গিল্ড বা সংঘ হইয়াছিল, সেই গিল্ডগুলিই বর্ত্তমানের জাতিসমূহে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই মোটামুটি নূতন দলের ধারণা। ইহা সত্য যে বর্ত্তমান জাতিগুলির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিলে দেখা (২৭ ক) যায় যে একটা পেশা লইয়া একটা জাতি গঠিত হইয়াছে ; আবার একই জাতি হইতে একদল বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করিয়া কালে আবার নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানটি প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতেছে ! আবার এক একটি কৌম (tribe) অবস্থার পরিবর্ত্তনে endogamous caste-রূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। রিসলী এইগুলিকে Ethnic castes বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিম-পঞ্জাবে জাট ও গুজার কৌমেরা পূর্ব্ব-পঞ্জাবে

২৭। Nesfield ব্যতীত Koeppers, Bougle—"Essai Sur le Regime de Castes (1908); Max Weber—Grundriss der Sozialoekonomik, Ch. IV Religioes Soziologie.

২৭ (ক)। B N. Datta.—Studies in Indian Social Polity.

বাস করিয়া জাতিতে পরিণত হইয়াছে (২৮)। আবার বিভিন্ন যাযাবার কৌমগুলি (wandering theivish tribes) বর্ত্তমানের গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জমি পাইয়া এক জায়গায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া endogamous caste এ পরিণত হইয়েছে (২৯)।

কিন্তু পেশা লইয়া পৃথক সামাজিক লোকসংঘ সংগঠিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আহার ও বিবাহ বন্ধ হয় কেন? জার্ম্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্সওয়েবার (ইনি ধর্ম্ম দ্বারা ইতিহাসের ব্যাখ্যা—Religious Interpretation of History করিয়াছেন) বলেন, ইহার সহিত ধর্ম্মভাব বিজড়িত আছে। কিন্তু এই ধর্ম্মভাবটি কি? প্রাচীন ও আদিমাবস্থায় অবস্থিত কৌমগুলির মধ্যে এই ধর্ম্মভাব কি টটেম ও তৎ-প্রসূত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নয়? ম্যাক্স ওয়েবারের মতে টটেম-প্রসূত তাবুগুলিই খাদ্যাখাদ্য, স্পর্শ এবং কাহার সহিত আহার করিতে পারা যায় ইত্যাদি অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া Standকে (সামাজিক পদ) caste এ পরিণত করে।

---

২ তাবু-তত্ত্ব

এতদ্বারা লোকসমষ্টি আইন ও আচারগত রক্ষাকবচ (Guarantee) ব্যতীত ধর্ম্মানুষ্ঠানিক (ritual) রক্ষাকবচ প্রাপ্ত হয়। তাবু গুলি (taboo) (৩০) অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে তাহা কতকগুলি বিধি-নিষেধে আবদ্ধ; আবার সেইগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া কেবলমাত্র খাদ্য ও স্পর্শজনিত তাবুতে পরিণত করা যায় (৩১)। প্রকারভেদে তাবুগুলি হিন্দুর আচার মধ্যে স্থান

২৮। Ibbetson—Tribes and Castes of the Punjab.

২৯। Haikerwal—Economic and social aspects of crime in India.

৩০। Crawley—The Mystic Rose.

৩১। Dr. B. N. Datta—Studies in Indian Social Polity.

পাইয়া "দোষ"রূপে নিরূপিত হয়। মধ্যযুগে ভারতের বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা তিন প্রকারের 'দোষ" গণনা করিয়াছেন : (ক) জন্যদোষ ; (খ) স্পর্শদোষ ও (গ) দৃষ্টিদোষ। আবার ফ্রয়ডের ন্যায় মনস্তত্ত্ববিদ্ ও ম্যাক্স স্মিডটের ন্যায় জাতি-তত্ত্ববিদ্ পলিনেসীয়দের মধ্যে জাতিভেদ ও তাবু-বিশ্বাস নিরীক্ষণ করিয়া উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেণী-লক্ষণ (class-character) দেখিতে পান (৩২)। কাহার সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপন ক রিতে পারা যায়—এই সকল প্রশ্নের মধ্যে শ্রেণী-চৈতন্য (class-consciousness) রহিয়াছে! প্রাচীন ভারতেও মহেঞ্জো-দাড়োর সময় হইতে টটেম-বাদের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতেরা ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে এই বিশ্বাস পাইয়াছেন ; কেহ কেহ আবার অনুমান করেন, বেদেও উহার অস্তিত্ব ছিল (৩৩)।

কেবল শ্রেণী-চৈতন্য থাকিলেই ছুঁতছাতের উৎপত্তি সৃষ্টি হয় না। সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বলেন, তাবুর পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে "মানা" (Mana) বিশ্বাস। ইহার অর্থ—একটা অতিন্দ্রীয় শক্তিতে বিশ্বাস। আদিম জাতিসমূহের মধ্যে বিশ্বাস যে মানব শরীর ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে একটা অতিন্দ্রীয় শক্তি (মানা) আছে এবং এই শক্তি আধারানুযায়ী ভাল বা মন্দ ফল উৎপাদন করে। উচ্চ শ্রেণীর লোকের 'মানা' অধিকতর কার্য্যকারক এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের 'মানা' মন্দফল প্রদায়ক। এইজন্য পলিনেশীয় অভিজাতেরা কোন স্থানে আহারার্থ নিমন্ত্রিত হইলে তাহারা আগে আহার করিয়া গোলামদের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া যায়, কারণ মাটি নিম্নশ্রেণীয় লোকদের স্পর্শে তাবু মধ্যে পরিগণিত হয়। পলিনেসীয়রা যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে ষাঁড়ের মাংস ভক্ষণ করে ; কারণ, তাহা হইলে

৩২। Freud—Totem & Taboo ; Max Schmidt—Ethnology.

৩৩। Macdonell—Vedic Mythology.

ষাঁড়ের ন্যায় তেজ তাহার শরীরেও আসিবে। এবম্প্রকারের দ্রব্যগুণ ও স্পর্শ-জনিত ভালমন্দ ইউরোপে সেদিন পর্য্যন্তও ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডের রাজা স্পর্শ দ্বারা লোকের scrofula প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিতেন, এই বিশ্বাস লোকের ছিল (৩৪)।

ভারতীয় সমাজেও এই 'মানা'-বিশ্বাস বহু প্রাচীনকাল হইতে দৃষ্ট হয়! এইজন্যই চণ্ডালের জল বিশ্বামিত্রের নিকট অস্পৃশ্য ছিল, যদিচ ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার মাষকলাইয়ের ডাল খাইতে কোন আপত্তি ছিল না (ছান্দোগ্যোপনিষদ)। প্রাচীন তাবুগুলিই বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধ হইয়া আজও বর্ত্তমান আছে। এই শব্দটি অথর্ব্ববেদে "সাপ-তাড়ান" মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। তুলনামূলক পাঠ দ্বারা প্রাচীন সভ্য ও বর্ত্তমানের আদিম অবস্থার জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রকারের তাবু অথবা বিধি-নিষেধের উৎপাত দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল (৩৫)। আজ টটেম-প্রসূত নিষেধগুলির অর্থ না বুঝিয়া আমরা উহাকে সনাতন ধর্ম্ম-ব্যবস্থা বলিয়া বিশ্বাস করি।

বেদপ্রসূত আর্য্যদের ধর্ম্মগুলি ভারতের বিভিন্ন মূলজাতীয় লোকদের বরাবরই হজম করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বগ্রাসী। একটা জাতিকে জীর্ণীভূত করিতে গিয়া তাহার সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কারগুলিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম মানিয়া লয়। আজও সেই অনুষ্ঠান চলিতেছে! কাজেই সেই জাতির পূর্ব্ব-সংস্কারগুলিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের সহিত খাপ খাওয়াইয়া হজম করা হয়। এই প্রকারে নানা জাতির নানা টটেম-বিশ্বাসজনিত সংস্কার হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস-রূপে গৃহীত হইয়াছে। পুরাণে বৃক্ষরূপ টটেম ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে জীর্ণীভূত হইয়াছে। যথা,

---

৩৪। Boswell—Life of Johnson—জনসন্ স্বয়ং এই প্রকারে Scrofula ব্যারামের জন্য রাণী Annie-র স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত পুস্তকে উল্লেখ আছে।

৩৫। Dr. B. N. Datta—Op. cit.

স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে "শূদ্র" বলিল, 'সুরগণ যে বৃক্ষরূপী হন এ মহৎ আশ্চর্য্যের কথা, চাতুর্মাস্তে দেবগণ সকল বৃক্ষেই বাস করেন" (২৫২।১)। বেদে অশ্বত্থ বৃক্ষের মহিমা বর্ণিত আছে, বৌদ্ধেরাও অশ্বত্থবৃক্ষে শ্রদ্ধাবান; অন্যদিকে মহেঞ্জো-দাড়োতে অশ্বত্থবৃক্ষের পূজার নিদর্শনপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। সেইরূপ বৈষ্ণব শাস্ত্র-সমূহে আমলকী ও তুলসী গাছের মহিমা প্রকীর্ত্তিত আছে। আবার বাঙ্গলার নব-স্মৃতিতে নৈষ্ঠিক হিন্দু বিধবার মুশুর ডাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে! পুনঃ অমুক দিবসে অমুক জিনিষ ভক্ষণ নিষেধ, অমুক সময়ে অমুক স্থানে যাওয়া নিষেধ, আঁকার ভয়, বাঁকার ভয়, হাঁচি-টিকটিকির ভয় ইত্যাদি আজ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত। কিন্তু হিন্দুর কোন্ ধর্ম্মতত্ত্বে বা দর্শনশাস্ত্রে এই নিষেধ-বিধিগুলিকে ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ পাওয়া যায়? মনুস্মৃতিতে "মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ" (৫।১৫) বলিয়া ব্রাহ্মণের মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু বাঙ্গলার নব্য স্মৃতিকার রঘুনন্দন বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের উহা খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এরূপ হইল কেন? ইহার কারণ, বাঙ্গালী জাতির যেসব সংস্কার ও প্রাকৃতিক কারণবশতঃ দৈনন্দিন জীবনের ব্যবস্থা তাহা কোন ধর্ম্মই উড়াইয়া দিতে পারে নাই। অনুরূপ অনুসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, বাউরী, সাঁওতাল, কাছাড়ী প্রভৃতি আদিম জাতীয় লোকেরা হিন্দু হইয়া তাহাদের টটেমকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রাত্য দেবতার উপাসনা করিতেছে, কিন্তু তাবুগুলি এখনও পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই (৩৬)। এই প্রকারে দেখা যায়, আদিম ও প্রাচীন সংস্কার এবং বিধি-নিষেধগুলি হিন্দুর ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে। সেগুলি নিশ্চয়ই আদিম কৌমগত ছিল। পরে কৌমগত শ্রেণী বা সংঘসমূহ সংগঠিত হইলে ঐ নিষেধগুলিও শ্রেণী-স্বার্থের

৩৬। Dr. B. N. Datta—Traces of Totemism in some Tribes and Castes of North-Eastern India—"Man in India," vol. xiii. Nos 2 & 3.

রক্ষাকবচরূপে তন্মধ্যে কার্য্যকরী হয়। নিম্ন-পেশার লোকদের "মানা" মন্দ, আর উচ্চ-পেশার লোকদের "মানা" ভাল। সামন্ততান্ত্রিক যুগে বংশ ও কৌমগত কৌলিন্যের সংস্কার আবির্ভাব হওয়ায় অনেক জাতির পতন ঘটে। এইজন্যই বোধ হয় কৃষিজীবী বৈশ্য এক সময়ে দ্বিজত্ব হইতে পতিত হয়; আবার রজক ও করঙ্গাগোপ (ইঁহারা পশু castrate করেন, বাঙ্গলায় এই জাতি আছে।) অস্পৃশ্য হয়, পক্ষান্তরে সংগোপ বাঙ্গলায় জলাচরণীয় সংশূদ্র। যাঁহারা তিল পিষিয়া তৈল তৈয়ার করেন তাঁহারা অনাচরণীয় তেলী বা 'কলু' হইলেন; আর অপর একদল তিল বেচেন বলিয়া 'তিলি' নাম নিয়া আচরণীয় বলিয়া ব্যবস্থা পান! এবম্প্রকারের কারণবশতঃই বোধ হয় স্বর্ণকার পতিত (৩৭)।

লেখকের অনুমান এই যে, মধ্যযুগের নব-বৈষ্ণবেরাই 'ছুৎছাৎ' দোষটি অতিমাত্রায় বাড়াইয়া তোলেন। কথিত আছে, রামানুজ হইতেই নানাবিধ দোষের ব্যাখ্যান দেওয়া হয়। গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামীকৃত "হরিভক্তি বিলাস" (ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিশাস্ত্র) পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল দোষসমূহের ভিত্তি হইতেছে সমাজতাত্ত্বিকদের "মানা-বাদ"। ব্রাহ্মণের দৃষ্টি শূদ্রান্নের উপর পতিত হইলে তাহাতে দোষ হয় না, কিন্তু ইহার বিপরীতটি ঘটিলে মহা-সর্ব্বনাশ! বাংলারই অনেক যায়গায় ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বা শূদ্রের বাড়ীতে পূজা করিতে গিয়া মাটিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া দেবতাকে প্রণাম করেন না! ইহা কেবলমাত্র জাত্যাভিমান এবং ইহার পশ্চাতে শ্রেণী-লক্ষণ লুক্কায়িত আছে।

এইসব স্থলে পূর্ব্বোক্ত পলিনেসীয় অভিজাতদের সংস্কারের প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উচ্চবর্ণের স্পর্শও তদ্রূপ, আবার দ্রব্যগুণ আছে। তুলসীপাতা

৩৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্বর্ণকারকে প্রথমে 'সংশূদ্র' বলা হইয়াছে, পরে আবার ব্রহ্মশাপে পতিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে (ব্রহ্মখণ্ড, ১০।১৫—১৫)।

খাইলে অমুক গুণ হয়, দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ করিলে উহার গুণ ভোজনকারী প্রাপ্ত হয়। এইজন্য মহাপ্রসাদের গুণ আছে (হিন্দুর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ, রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানের Lord's hosts এবং সকল সম্প্রদায়ের খৃষ্টানের Eucharist Festival, আর ইহুদি এবং মুসলমানের কোরবাণী ও সেই মাংস ভক্ষণ প্রভৃতির মূলে একই Mana-spirit কার্য্যকরী হয়)। এই সকল সংস্কারের মূলে তাবু ও 'মানা-শক্তির' প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। কাজেই প্রত্যেক কৌম ও শ্রেণীর প্রাচীন সংস্কারগুলিকে হিন্দুর জাতি-ব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই অমুককে বিবাহ করা নিষেধ এবং অমুককে স্পর্শ করা নিষেধ প্রভৃতি বিধানগুলি সমাজ মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া প্রত্যেক জাতিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই তাবুগুলির মধ্যে শ্রেণী-লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্ম 'নয়া মানুষ সংঘবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আর একদল লোক হইতে উচ্চ হয় কি প্রকারে? এস্থলে আমাদের class character এবং তাহার পদ নিরূপণ করিতে হইবে।

—

৩ হিন্দু বর্ণ-তত্ত্ব

ভারতের বর্ত্তমান জাতিভেদ (Caste system) বুঝিতে হইলে বেদ ও স্মৃতি বিশেষ সহায়ক হইবে না; কারণ, দেখা গিয়াছে যে বর্ত্তমানের সমাজ বিবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই স্মৃতিসমূহ লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জাতিভেদের ভিত্তি হইতেছে হিন্দু-সভ্যতার শেষ যুগের পেশাগত 'গিল্ড-পদ্ধতি' (১) এবং উহার সহিত হিন্দুর হাড়ে-মাংসে বিজড়িত ও মজ্জাগত আদিমাবস্থা-প্রসূত magic, sympathetic magic, Mana-spirit, Taboo প্রভৃতিতে বিশ্বাস এবং শ্রেণীসংগ্রাম।

১। লেখমালায় উল্লিখিত শ্রেণীসমূহ একণে সেই নামের জাতিসমূহে বিবর্ত্তিত হইয়াছে।

একটা জনসংঘের পেশা দ্বারা উহার সমাজে স্থান নিরূপিত হয় এবং তাহার সামাজিক পদ (status) অনুযায়ী তাহার 'মান' ও পদ প্রাপ্ত হয়। কাজে-কাজেই শ্রেণী-চৈতন্ত প্রণোদিত হইয়া এই জনসমাজ নিজ অপেক্ষা নিম্নপদের সমাজের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান ও আহার-বিহারাদি সম্পর্কিত সম্বন্ধ স্থাপনে নিতান্তই অনিচ্ছুক। আদিমকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বিবাহ ও আহারাদি দ্বারাই সাম্য স্থাপিত হইতেছে। কেন আফ্রিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশসমূহে এবং আমেরিকায় অ-শ্বেতজাতীয় লোকদের (coloured men) সহিত শ্বেত-কায়েরা এবম্প্রকারে সাম্য স্থাপনে অনিচ্ছুক এবং অনেক স্থলে আইন দ্বারা বিবিধ বিধি-নিষেধ স্থাপিত হইয়াছে? উক্ত দেশসমূহের সাম্রাজ্যবাদী লেখকেরা ইহাকে "উচ্চ সভ্যতা" রক্ষাকল্পে এবং Eugenics-এর অজুহাত দেখান (২)। কিন্তু এই সকল জাতিগত বিদ্বেষের (race-prejudice) মূলে কি অর্থনীতিক ভিত্তি নাই? আসলে, এরূপস্থলে শাসক ও শাসিত, বিজেতা ও বিজিত জাতীয় মনোবৃত্তি-প্রসূত উচ্চ ও নীচ জাতিরূপ ধারণা লুক্কায়িত থাকে। আজকাল সাম্রাজ্যবাদীয় মনোবৃত্তি যত বৃদ্ধি পাইতেছে, জাতিগত বিদ্বেষও জগতে তত উগ্র হইতেছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রেণী-লক্ষণ, যাহা শোষক ও শোষিতের অবস্থা-সঞ্জাত। আজকাল জগতে কোন্ রাষ্ট্রের লোকেরা উচ্চজাতীয় এবং কোন্ লোকেরা নীচ জাতীয় তাহা কে নিরূপণ করিবে? রাজনীতিক সংগ্রামই উহা নিরূপিত করিতেছে বলিয়া

২। একবার গ্লাসগো সহরে Swimming pool-এ তথাকথিত রঙ্গীন লোকদের (coloured men) sanitation-এর অজুহাত দেখাইয়া স্নান করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল! আমেরিকায় নিগ্রো জাতীয় লোকেরা শ্বেতকায়দের সহিত এক জায়গায় স্নান করিতে পারে না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নিষেধ নাই কিন্তু তথাকার swimming pool-এও তাহারা যায় না। সামাজিক নিষেধই সেখানে কার্য্যকরী হয়!

৯.১১৮৩

প্রতিভাত হইতেছে (৩)। তাহা হইলে দেখা যায়, রাষ্ট্র-শক্তিই একটা লোক-সমষ্টির মান-মর্য্যাদার ভিত্তি। উচ্চ-বৃত্তিধারী লোক রাষ্ট্রশক্তির বলে বলীয়ান্ হইয়া সমাজে স্বীয় পদ-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। বাঙ্গলার অতীতে কেন মসীজীবী কায়স্থ ব্রাহ্মণের নীচে স্থান পাইল এবং 'সৎ-শূদ্রদের' মধ্যেও 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া গণ্য হইল (বল্লাল-চরিত দ্রষ্টব্য) তাহার কারণ রাজনীতিক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেন গুর্জ্জর প্রতিহারদের শাসকশ্রেণীয় প্রতিহার-গণ ক্ষত্রিয়রূপে উন্নীত হইল, কেন পতিত জাঠগণ নিজেদের কতকগুলি রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছে; মারাঠাদেরও তদ্রূপ অবস্থা—ইহার কারণ 'পুরুষ সূক্ত' ও স্মৃতিতে পাওয়া যাইবে না; ইহার মূলীভূত কারণ রাজশক্তির মধ্যে নিহিত আছে। কোন্ পেশা বড়, আর কোন্ পেশা নিকৃষ্ট উহা কি প্রকারে নির্ণীত হইবে? বাঙ্গলায় কায়স্থ বৃত্তিধারী লোকেরা কেন নিজেদের উচ্চ বলিয়া মনে করেন? কেন বর্ণাশ্রমী সমাজে গন্ধ-বণিক জলাচরণীয় ও সৎশূদ্র বলিয়া বিবেচিত এবং সুবর্ণ-বণিক পতিত? কেন তিন শ্রেণীর তেলীর মধ্যে—"কেহ চাষী, কেহ ঘনা, কিনিয়া বেচয়ে কেহ তেল" ("কবিকঙ্কণ চণ্ডী" দ্রষ্টব্য)—পার্থক্য উপস্থিত হইল, কেনই-বা একই জাতির মধ্যে একদল উচ্চ ব্যবসায়ী বা জমিদার হইয়া নিজেদের "বৈশ্য সাহা" বলিতেছেন এবং শাসকদের নিকট হইতে তদনুযায়ী

৩। ভার্সাই সন্ধির পর লেখকের জনৈক জার্ম্মান সহপাঠী বলেন, একজন ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী তাহাকে লেখকের অধ্যাপকের নাম করিয়া বলেন—তিনি যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক হন তাহা হইলে তিনি অবশ্য স্বীকার করিবেন যে Latin Culture জার্ম্মান Culture অপেক্ষা উচ্চ! ইহা শুনিয়া লেখক বলেন যে ইহা রাজনীতিক কথা। বিগত যুদ্ধের পর জার্ম্মান জাতি বিজেতৃ জাতীয় লোকদের সম্মান দেখাইত। বল্কান যুদ্ধের পর আমেরিকায় কাগজে পত্রে বুলগেরিয়া সুসভ্য জাতির মধ্যে গণ্য হয়। রুষ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পুনঃ ১৯৪৫ খৃঃ পরাজিত জার্ম্মানীর এবং বিজেতৃ সোভিয়েট-রুষের পর আজ কি?

রাষ্ট্রিক জীবনে স্থান পাইতেছেন এবং কেনই-বা প্রাচীন বৃত্তিধারীরা "শুঁড়ি" নামে অভিহিত হইয়া অসৎ শূদ্রত্বে পতিত হইয়া রহিয়াছেন এবং তজ্জন্য রাষ্ট্রিক-জীবনে তাহাদের স্থানও শাসকদের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে; যেনই-বা ভারতের অনেকস্থলে দুই প্রকারের কায়স্থ দেখা যায়, যাহাদের মধ্যে উচ্চ-বৃত্তিধারিগণ "কায়স্থ" ও ভদ্রলোক এবং কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন আর হালচাষীশ্রেণী "লাঙ্গলা" অথবা "হেলে কায়েত"রূপে ভদ্র কায়স্থদের সমাজ হইতে পৃথক হইয়া বাস করেন (ইহাদের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান চলে না) (৪); কেনই-বা স্থানবিশেষে 'কায়স্থ' ভদ্র জাতি ও 'কায়েত' নিম্ন জাতি? 'কায়েত'দের সম্পর্কে ছড়াও প্রচলিত আছে:—"কায়েত কা ঘর পাণি পিয়া বাচেনা কোই জাত।" কেন এবং কি প্রকারে বহুবিধ বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও (৫) রাজপুত-ক্ষত্রিয় শাসকরূপে উন্নীত হইল; আর কেনই-বা গাগাভট্টের বিধান (স্কন্ধ পুরাণান্তর্গত সহ্যাদ্রিখণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং অন্যান্য পুরাণ ও ব্রাহ্মণদের বিধান সত্ত্বেও কায়স্থেরা ভারতে ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্বজন স্বীকৃত হয় নাই; কেনই-বা পশ্চিমের চাষী কুরমী (ইহারা বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন) মধ্যভারত ও মহারাষ্ট্রে 'কুনবী'-রূপে পরিচিত হইয়া শিবাজীর সময় হইতে 'মারাঠা' নামে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন এবং মারাঠা সর্দ্দারেরা ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন; কেনই-বা জাঠ

৪। নগেন্দ্রনাথ বসু—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 'রাজন্যকাণ্ড'; কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়; Ethnology of the Kayasthas পৃঃ ১৫০, ১৬১; শ্রীযুত বসু ইহাদের উপকায়স্থ বলিয়াছেন।

৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (ব্রহ্মকাণ্ড, ১০।৯৬—১০৬) ও বল্লালচরিতে রাজপুতকে বর্ণশঙ্কর বলা হইয়াছে। বাঙ্গালায় মুলা পঞ্চানন বর্ণশঙ্কর বলিয়া তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অস্বীকার করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, রাজপুতের সহিত বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। আজও উত্তর বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে ঘাটোয়াল, ভুইয়াঁ প্রভৃতি জাতিরা রাজপুতকে তাহাদের নিম্নস্তরের জাত বলিয়া গণ্য করে।

অতীতে অতি হীনাবস্থাপ্রাপ্ত জাতি ছিল এবং পঞ্জাব ও রাজপুতানায় উদয়পুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত—গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাদের হাতে জল খায় না—এবং উত্তর-রাজপুতানায় তাহারা সৎশূদ্র, এমন-কি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে? এই প্রকারের সকল তথ্যের ব্যাখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে বর্ত্তমান ভারতের জাতি-ভেদের মূল তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। নানা উপাদানের (factors) একত্র সমাবেশে জাতিভেদ-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রাচীন কৌমগত ধর্ম্মের (tribal religion) 'মানা' ও 'তাবুর' প্রভাব বিজড়িত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি "শ্রেণীসংগ্রাম" দ্বারা প্রত্যেক জাতির স্থান বা পদ সমাজে নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। উপরোক্ত জাতিগুলি শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বারা বর্ত্তমানের সামাজিক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্রেণী-সংঘর্ষ মধ্যে অর্থনীতিক-রাজনীতিক কারণবশতঃ যে-জাতি যতটা রাষ্ট্রিক ক্ষমতা সমাজের মধ্যে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে সেইজাতি সমাজে ততটা মর্য্যাদা নিজের জন্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। এই কারণবশতঃ "লাঙ্গলধারী কায়েত" অপেক্ষা কানুনগো, কারিন্দ, দেওয়ান প্রভৃতির বৃত্তিধারী মসীজীবী কায়স্থ উচ্চপদস্থ ভদ্রজাতিতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যেসব জাতি লাঙ্গল ত্যাগ করিয়া তরবারী ধারণপূর্ব্বক অতীতে শাসকশ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারা আজ ক্ষত্রিয়শাসকে পরিণত হইয়াছে ; অন্যপক্ষে কানুনগো-গিরি, কারিন্দাগিরি, ওকালতি করিয়া শাসক-শ্রেণীতে উন্নীত হওয়া যায় না। সেইজন্য ভদ্র কায়স্থের বিবর্ত্তন আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের ব্যবস্থাপত্রের কোনও মূল্য নাই, এই সত্যটি প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয় (৬)।

৬। বাস্তবক্ষেত্রে 'ব্যবস্থাপত্র' ও 'ফতোয়া' কার্য্যকরী হয় না। হিন্দুর পক্ষে তাহা নিয়তই দেখা যায় এবং মুসলমানের পক্ষেও তদ্রূপ! বিগত মহাসমরের সময় তুর্কির খলিফার 'জেহাদ'রূপ ফতোয়া স্তাম্বুলের সেখ্-উল্-ইস্লামের এবং রোম্যানদের সেখদের ফতোয়া বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্যকরী হয় নাই।

পঞ্জাবের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া Ibbetson সত্যই বলিয়াছেন, Caste is a status-group (৬)। জাতি হইতেছে একটি বিশিষ্ট মর্য্যাদাপ্রাপ্ত লোক-সমাজ। কিন্তু হিন্দুর অধঃপতনের যুগে এই পদ-মর্য্যাদার আর নূতন বিবর্ত্তন হয় নাই। যে যে-পদ অর্জ্জন করিয়াছে, সে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য এই কয়েক শতাব্দী নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদে জীবন কাটাইয়াছে। লেখক বহুপূর্ব্বে বর্ত্তমান জাতি-পদ্ধতি সম্পর্কে এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—A caste is a group sentiment of safety (৭) অর্থাৎ বর্ত্তমানে জাতি হইতেছে একটা লোক-সমষ্টির পদ-মর্য্যাদা বা শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সমষ্টিগত ভাব যাহাতে তাহা অক্ষুণ্ণ, অটুট ও নিরাপদে থাকিতে পারে। আজ জাতির গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়া সেই লোকসমষ্টি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। যখন কেহ বলেন, 'অমুক আমার জাতি মারিল' বা 'আমি জাতিচ্যুত হইলাম' তখন সেই লোকের সামাজিক মর্য্যাদাতে আঘাত করা হয়, অথবা তাহাকে তাহার সামাজিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত করা হয়, সেই ব্যক্তি নিজের সমাজের মাপকাঠি দ্বারা অবনমিত হয়। কিন্তু এই সকল জাতিচ্যুত লোক বা অন্য প্রকারে নব-সংঘবদ্ধ লোকসমূহ একত্রিত হইয়া পুনরায় একটা সমাজ গঠন করে। কালক্রমে উহা একটি নূতন জাতিতে বিবর্ত্তিত হয় এবং পরে এই নূতন জাতিটি কল্পিত চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি বর্ণমধ্যে গুণকর্ম্মানুসারে প্রবেশ করে অথবা তাহার জন্য চেষ্টা করে। এই অনুষ্ঠানটি চিরকালই ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। এইজন্যই হিন্দুর মধ্যে এত বিভিন্ন প্রকারের 'জাতি'।

৬। Ibbetson—A glossary of the Tribes & Castes of the Punjab.

৭। B. N. Datta—Das Indische Kasten System in 'Anthropos'; "Studies in Indian Social Polity" দ্রষ্টব্য।

'চাতুর্ব্বর্ণ্য' একটি কল্পনা (Fiction) মাত্র ; যুগে যুগে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি হইতেছে এবং আজও ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র সর্ব্বত্র সৃষ্ট হইতেছে ! চক্ষুষ্মান মাত্রেই ইহা দেখিতে পান (৯)।

আজ হিন্দুসমাজ অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত, প্রত্যেক জাতির নিজের নিয়মকানুন, সামাজিক রীতিনীতি (mores) ও পুরোহিত প্রভৃতি দ্বারা একে অন্য হইতে পৃথকীকৃত। এইজন্যই বলিতে হয়, Hindu society is a congeries of communities, অর্থাৎ হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিমাত্র। একটা কেন্দ্রীভূত রাজনীতিক-সামাজিক শাসনের অভাবে একজাতিত্ব (nationhood) প্রাপ্ত না হইয়া বিভিন্ন লোকসমষ্টি বিভিন্নভাবে গতিশীল হইয়াছে। এইজন্যই রাজনীতিক্ষেত্রে বলা হয় যে, হিন্দুরা শতধাবিচ্ছিন্ন কিন্তু ইহাতে এই সকল উচ্চ-নীচ জাতিরা আদৌ লজ্জিত নয় ! এইজন্যই লেখক অন্যত্র বহুপূর্ব্বেই বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে "A 'caste' is a family pride" অর্থাৎ জাতি বংশগত গরিমায় পর্য্যবশিত হইয়াছে। যিনি যে জাতিতে জন্মিয়াছেন তাহাতেই তিনি গরীয়ান্ ; "আমি অমুক জাতির ঘরে জন্মিয়াছি," এই বলিয়া প্রত্যেকেই বংশগৌরবের গর্ব্ব করেন। পুরুষ-সূক্ত কল্পিত 'চাতুর্ব্বর্ণ্য,' পুস্তকেই উল্লিখিত রহিয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই এক একটি "Res Publica" (সাধারণ-তন্ত্র) সৃষ্টি করিয়া নিজের জাতিরই বড়াই করেন। 'সৎ-শূদ্র' ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিবার স্পৃহা রাখেন না এবং 'অসৎ-শূদ্র' ও 'সৎ শূদ্রে'র সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন না (১০)। সমাজতত্ত্বানুযায়ী, দেখা যায়

৯। বাঙ্গালায় 'শিবগোত্রীয়' সামবেদী ব্রাহ্মণ বংশের সহিত লেখক পরিচিত আছেন। অথচ ইহাদের সহিত তথাকথিত তপশীলভুক্ত কোন জাতীয় লোকের সহিত কুটুম্বিতাও আছে !

১০। অধুনা ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। "রুটী" ও "বেটি" দ্বারা সাম্য স্থাপন করিবার ইচ্ছা সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম"।

যে, হিন্দুর সামাজিক ভঙ্গী (social attitude) হইতেছে 'Domestication of mores of different castes' (বিভিন্ন জাতির রীতিনীতির পারস্পরিক সহনশীলতা) ; প্রত্যেক জাতিই নিজের রীতিনীতিতে শ্রদ্ধাবান্ এবং তদ্বারা অপরকে উত্যক্ত করে না।

আজ হিন্দুসমাজ দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ভারতের সর্ব্বত্রই জাতিসমূহ নাম ও পদমর্য্যাদা পরিবর্ত্তন করিতেছে; বর্ত্তমান শিক্ষা ও ইংরেজ শাসন এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। পরলোকগত নরতত্ত্ববিদ্ Haddon-এর কথায় আমাদের বলিতে হয় "Save the vanishing data" অর্থাৎ জাতিতত্ত্বের সংবাদের জন্য জাতি ও কৌমগুলির অবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কারণ তাহাদের স্বরূপ এবং অবস্থা দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নচেৎ ভারতের অতীতের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অভাবে অনুসন্ধান কার্য্যে বৈজ্ঞানিকদের যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ভবিষ্যতেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে (১১)।

বর্ত্তমানে প্রত্যেক জাতিই নিজেকে উন্নীত করিতে চায়, নিজের সামাজিক পদমর্য্যাদা বাড়াইতে চায়। কিন্তু উক্ত প্রচেষ্টা সাম্যের দিকে অগ্রসর না হইয়া উপস্থিত বৈষম্যকেই বজায় রাখিয়া নাম পরিবর্ত্তন করতঃ কল্পিত চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য প্রত্যেক জাতি প্রয়াস পাইতেছে। প্রত্যেক জাতিই সংস্কৃত পুস্তকসমূহ হইতে একটা কল্পিত জাতির নাম গ্রহণপূর্ব্বক নিজেদের পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত করিতেছেন এবং তাঁহারা যে প্রাচীন দ্বিজ-শ্রেণীসমূহের অন্যতম তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন! তাঁহারা বৈজ্ঞানিক

১১। বোধহয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন জাতিসমূহ নাম পরিবর্ত্তন করিতেছে। এইজন্য রাজপুত, জাঠ, মারাঠা, গুর্জ্জর-প্রতিহার প্রভৃতি নাম ইতিহাসে পাইয়া ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে বিদেশাগত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন। প্রাচীন-ঐতিহাসিক জাতিগুলি (tribes) আজ কোথায়? তাহারা কি নামপরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যেই নাই?

অনুসন্ধান ও সমাজতাত্ত্বিক তথ্যের ধার ধারেন না (১২)। এই বিষয়ে কিছু বলা চলে না ; কারণ এই সকল বিষয়ে তাঁহারা বেশী ভাবপ্রবণ ! এ বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে তাঁহারা অপমানিত বোধ করেন (১৩)।

কিন্তু লেখকের বিশ্বাস চাতুর্ব্বর্ণ্য জগতের একটা মস্তবড় কল্পনা (Fiction)! ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে বেদে চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্যতীত চর্ম্মণী, তক্ষণ, রথকার, তাঁতি প্রভৃতি পেশাগত জাতিগুলির উল্লেখ আছে। পুরুষ-সূক্তের গল্প যে বিরাট-পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বহির্গত হইল, এই কল্পনা দ্বারা কি প্রকারে প্রমাণিত হয় যে শরীরের মধ্যে মুখই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য বর্ণের লোকসমূহ নিম্নাঙ্গ হইতে উৎপন্ন এবং তজ্জন্য নিকৃষ্ট ? বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা উক্ত কাহিনীর মোটেই মূল্য দেন না। তাহারা প্রতিবাদে কি বলিয়াছেন তাহা জানা নিতান্ত দরকার (অশ্বঘোষের বজ্রচ্ছেদিকা, মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ সরুহপাদের 'অদ্বয় বজ্র' টীকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ভবিষ্যপুরাণেই লিখিত আছে 'ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্র মরীচি শুক্লায় ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুকা পুষ্পবর্ণাঃ। ন চাপি বৈশ্যাঃ হরিতালতুল্যাঃ

১২। বাঙ্গলাদেশের কোন একটি কৃষিজীবী জাতির অবস্থা উন্নত হইলে তাহারা জাতির নাম ও মর্য্যাদা বদলাইবার জন্য এত ব্যগ্র ও অধীর হইয়া উঠে যে নিজেদের জাতির উৎপত্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত (Theory) জাহির করে। অবশেষে তাহারা বলে যে তাহারা রাজপুতানা হইতে আগত এবং তাহারা তথাকার রাজপুতদের জ্ঞাতি, আর বাঙ্গলাদেশ তাহাদের বিমাতা! অথচ প্রাচীন বাঙ্গলাসাহিত্যে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই জাতির নামোল্লেখ আছে।

১৩। এ বিষয়টি লেখক স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছেন। প্রত্যেক জাতি হইতে তাহাদের দাবী প্রচারের জন্য মাসিক পত্রিকা ও বহু পুস্তক লিখিত হইতেছে।

শূদ্রাঃ ন চাঙ্গর সমানবর্ণাঃ (৪১)! অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রই জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল নহে…শূদ্রেরাও অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের নহে। এতদ্বারা বর্ণ-বিষয়ে কল্পিত ও রূপক গল্পের উপর একটা নূতন আলোক-সম্পাত করে। যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য একই বিরাট পুরুষ বা প্রজাপতির শরীর হইতে উদ্ভূত সন্তান তখন তাহারা বাহ্যিক আকৃতিতে পৃথক হইবে কি প্রকারে? মহাভারতেও উল্লিখিত আছে "চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিদ্যতে। সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যন্তে বর্ণশঙ্করঃ" (শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়)। অর্থাৎ যদি বর্ণ দেখিয়া জাতি নিরূপণ করিতে হয় তাহা হইলে দেখা যায় সকলেই বর্ণশঙ্কর! পুনরায় বজ্রসূচীতে বলা হইয়াছে, "যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়…এক্ষণে এবং পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কালেও শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি, অতএব বর্ণবিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না" (১৪)। মহাভারত এবং বজ্রসূচীর এই উক্তিই নরতত্ত্ববিদ্‌দের অনুসন্ধানকে সমর্থন করে।

আবার বিরাট পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যে গল্প প্রচলিত আছে তাহারই বিপরীত বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ ৫ম অধ্যায়ে লিখিত আছেঃ যথা, "ততঃ স্বচ্ছতোঽন্যানি……মুখতোঽজাঃ স সৃষ্টবান (৪৬)…..পদ্ভ্যামশ্বান্ স মাতঙ্গান্ শরভান্ গবয়ান্ মৃগাণি" (৪৭)। অস্যার্থ, ব্রহ্মা অথবা প্রজাপতির মুখ হইতে ছাগ, পদদ্বয় হইতে অশ্ব, হস্তি প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে (এই বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, নবম অধ্যায় ৪০ শ্লোকও দ্রষ্টব্য)। কিন্তু পরের অধ্যায়ে (বোধ হয় পুরুষসূক্তের গল্পের সহিত মিলাইবার জন্য) বলা হইয়াছে "ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথমে সত্ত্বোদ্রিক্ত প্রজাগণ জন্মিয়াছে…ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মুখ, বক্ষঃস্থল, ঊরু ও পাদ হইতে সমুদ্গত (১।৬৩-৬)। কিন্তু উক্ত বর্ণনা বৈদিক গল্পের সহিত পুরাপুরি

১৪। বজ্রসূচী in complete works of Raja Rammohan Roy, Vol. I. P. 382.

মিলে না। (অন্যপক্ষে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণাদির গুণগত উৎপত্তির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে: "এইরূপে প্রজাগণের বৃত্তি উপায় স্থিরীকৃত হইলে প্রজাপতি তাহাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাদের মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা এবং অপর প্রজার রক্ষাকারক তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভয় হইয়া কেবলমাত্র "সর্ব্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান" এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিত তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত তাহাদিগকে বৈশ্য এবং যাহারা শোকার্ত্ত, দুঃখপরায়ণ, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য ও অন্যান্য জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যায় রত থাকিত তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন" (৮।১৫৫—১৫৯)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্তিতে এই তথ্য অবগত হওয়া গেল যে বৃত্তি, অর্থাৎ পেশা অনুযায়ী বর্ণ অথবা শ্রেণীসমূহ উদ্ভূত হইয়া তাহাদের পদগত মর্য্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাকে এইরূপে ব্যাখ্যাও করা চলিতে পারে যে সামাজিক শ্রেণীসমূহ তাহাদের অর্থনৈতিক মর্য্যাদানুযায়ী সমাজে স্থান পাইয়াছে।)

এই সকল উক্তি হইতে দেখা যায়, যাঁহারা বিরাট পুরুষের মুখ হইতে বহির্গত বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকেন তাঁহাদেরই প্রণীত ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে অন্যপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়! তাহা হইলে নিরক্ষর ও তাহাদের সন্তানেরা বৈজ্ঞানিক homology (সমকর্ম্ম) যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কি এই কথা বলিতে পারে না, যেহেতু জীবতত্ত্বের মতে ছাগল অপেক্ষা ঘোড়া, হস্তি ও উষ্ট্র উচ্চতর জীব, তজ্জন্য শূদ্রেরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ধর্ম্মপুস্তকসমূহ হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের (ইনি বেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) পৌত্র শৌনকের চারি পুত্র কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য আবার কেহবা শূদ্র হইয়াছিল (বায়ুপুরাণ, ৩৮ অধ্যায়; বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৮।১; হরিবংশ, ২৯, অগ্নি ২৮)। ধৃষ্টকেতুর বংশের ভার্গভূমির চারিপুত্র চারিবর্ণে বিভক্ত হয় (হরিবংশ—৩২, বিষ্ণু ৫।৮।৯); মনু তনয় ধৃষ্ট ব্রাহ্মণ হয় (ভাগবত ৯।২২); ক্ষত্রিয় বৈবস্বত

মনুর পৌত্র নাভাগ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন (বিষ্ণু ৪।১।১৩)। আর এই বংশের কারুষ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন (বিষ্ণু, ৪।১।১৪) এবং পৃষধ্র (ইনি একজন বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি) গুরুর একটি গোবধ করিয়া শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছিলেন (অগ্নি, ২৩৭।৩৭ ; হরিবংশ, ১০।১১।৯।২ ; বিষ্ণু, ৪।১।১৩)। দুষ্মন্তের বংশের ক্ষত্রিয়গণ হইতে গার্গ্য, প্রিয়ংবদ ও মদগল্য বংশীয় ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হন (শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ)। দেবাপী ও সিন্ধুদ্বীপ ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (মহাভারত, শল্য পর্ব্ব)। সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন (রামায়ণ—বালকাণ্ড, ৫৮।৯); ব্যাস, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিরা শূদ্রাগর্ভজাত, বশিষ্ঠ বেশ্যাগর্ভজাত, সত্যকাম জাবলাদাসী গর্ভজাত, মণ্ডুক, ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতি পশুজাত এবং অগস্ত্য কুম্ভোৎপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন! "বজ্রসূচী" নামক পুস্তকে জাতিভেদ মতকে খণ্ডন করিয়া কোন্ কোন্ ঋষি কোন্ কোন্ পশু বা শূদ্রা গর্ভজাত তাহার এক লম্বা তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।)

এই সকল উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রাহ্মণশ্রেণীর দাবীর বিপরীত জবাবই পাওয়া যায়। এইসব দৃষ্টান্ত হইতে সকলবর্ণের একই মূল উৎপত্তির কথা পাওয়া যায়। বর্ণগুলি তৎকালে জন্মগত জাতি (caste) ছিল না; লোকে বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। আর শ্রেণী দ্বারাই লোকের পদমর্য্যাদা (status) নির্দ্ধারিত হইত। ব্রহ্মপুরাণে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে "ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যও যদি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ব পায় (২২৩।৫০—৫৮) আবার ভারতীয় লোকদের বর্ণ-শাঙ্কর্য্যের কথার উল্লেখ আছে! পুনঃ ঋষিদের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে এই সংবাদ জানা যায় যে তাহাদের অনেকের মাতাই হয় দাসী, না হয় টটেমিক জাতিসমূহ হইতে উদ্ভূত, তজ্জন্য পশুজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুনরায় মহাভারতে ভৃগুর মুখ দিয়া বলান হইয়াছে, "ব্রাহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং"; আবার "ত্যক্ত স্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ…কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজা শূদ্রতাং গতাঃ (মোক্ষধর্ম্ম, অধ্যায় ১৮৪) অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হয়, কর্ম্মভ্রষ্ট দ্বিজই

(ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রিয় বা শূদ্র হয়। ব্রহ্মপুরাণে শিবের মুখ দিয়া উক্ত হইয়াছে "দেবি! নিম্নোক্ত শুভকর্ম্ম সকলে আচরণ করিলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি বিবিধ গুণে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে (২২৩।১৩—৩২)। এই সকল উক্তিতে কর্ম্ম দ্বারাই শ্রেণীর পরিবর্ত্তনে মানবের বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় এবং 'অ-ব্রাহ্মণেরাও যে প্রথমে ব্রাহ্মণবর্ণীয় ছিল সেই সংবাদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অত্রি সংহিতাতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, যে বিপ্র সাত্ত্বিক আহার করে সে মুনি; যে-বিপ্র বেদান্ত পাঠ করে এবং সাংখ্যযোগের আলোচনা করে সে দ্বিজ; যে-বিপ্র যুদ্ধে শত্রু জয় করে সে ক্ষত্রিয়, যে বিপ্র কৃষিকর্ম্ম ও গোপালন করে এবং ব্যবসায়াদি করিয়া থাকে সে বৈশ্য, যে বিপ্র লাক্ষা, লবণ, জাফরাণ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে সে শূদ্র; যে বিপ্র চুরি অথবা ডাকাতি করে, মৎস্য এবং মাংসপ্রিয় সে নিষাধ; যে বিপ্র ধর্ম্ম ও সংস্কার-বিহীন এবং জীবের প্রতি নিষ্ঠুর সে 'চণ্ডাল (৩৬৬—৩৭৪) (১৫)। যাঁহারা বেদোক্ত দস্যু ও দাসদের বংশধরগণকে বর্ত্তমানে শূদ্র জাতিতে পরিণত বলিয়া মনে করেন তাঁহারা ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩।১৮) বলিতেছে, "বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" তাহা হইলে দাসবংশোদ্ভব শূদ্রেরা গায়ত্রী-মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋগ্বেদের ঋষি বিশ্বামিত্রের সন্তান, অতএব দ্বিজ। এই স্থলেও দ্বিজ এবং শূদ্রবর্ণের এক উৎপত্তির কথা স্বীকৃত হইয়াছে। পুনঃ ঋক-বেদের ঐলুষকবষ ঋষিদৃষ্টসূক্ত সমূহ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে বেদে "সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ" ছিল।

এই সকল উদ্ধৃত বচন হইতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ্য পুস্তকসমূহে আসলে চাতুর্ব্বর্ণ্যের লোকদের উৎপত্তির একত্ব (monogenism) স্বীকৃত হইয়াছে। তবে ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতেই যে কর্ম্ম-গুণে অন্য বর্ণের লোক উৎপত্তি হয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

১৫। Translated by M. N. Dutt, Pp.—302—330.

পক্ষান্তরে জৈনগণ ব্রাহ্মণ-বর্ণিত সৃষ্টি-তত্ত্ব (cosmogony) একেবারেই স্বীকার করেন না! তাঁহারা বলেন, ইক্ষাকুবংশীয় আদিনাথ বা ঋষভনাথ (ইনি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর) সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন (১৬)। কিন্তু মূলকথা এই যে বিভিন্ন প্রকারের উৎপত্তির একত্ব ভারতীয় আর্য্যকৃষ্টি-প্রসূত কোন ধর্ম্ম অস্বীকার করেন নাই।

---

৪ শ্রেণী-তত্ত্ব

প্রাচীন ইরানের পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতের বর্ণ বা শ্রেণী-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে প্রাচীন ইরানের সমাজ পদ্ধতির সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদগণ তুলনামূলক পাঠ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে একসময় 'বৈদিক-আর্য্য' ও ইরানের 'আইর্য' জাতিদ্বয় একত্রে বাস করিত। এই জাতি দুইটির জনশ্রুতিও একপ্রকারের ছিল। পরে ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যাপারে কলহ ও বিবাদ হওয়ায় তাহারা পৃথক হইয়া যায় এবং একের দেবতা অপরের নিকট 'অসুর' বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন, এই কলহের নিদর্শন ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (১।১১২।১৩)! কক্ষিবান ঋষি বলিতেছেন,—"ইষ্টাশ্ব ও ইষ্টরশ্মি শক্রতারক নেতাদিগের কি করিতে পারে?" এই বিষয়ে মাক্সমূলার, কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, ঘোষ প্রভৃতি অনুসন্ধানকারীগণ অনুমান করেন, এই "ইষ্টাশ্ব," বক্তার (বাল্খ) ইরানী রাজা বিতস্প বা গস্তাস্পকে বুঝাইতে পারে। জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মগ্রন্থে (Farvardan—Yast, XII, 99) বর্ণিত আছে যে জারতুষ্ট্র বক্তার কিয়ানীয় বংশের রাজা বিতস্প বা গস্তাস্পকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন (১)। তিনি তাহাকে স্বীয় রাজ্যের চতুস্পার্শ্বের

১৬। ৺পুরাণ নাহারের জৈনধর্ম্ম বিষয়ে ইংরেজী পুস্তক দ্রষ্টব্য।

১। এই বিষয়ে "Dhalla Zoroastrian Civilization", P.XXVII দ্রষ্টব্য।

কৌমদের বলপূর্ব্বক জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেদের উপরোক্ত শ্লোক উহারই ইঙ্গিত করিতেছে। কিন্তু পরলোকগত ঘোষ মহাশয় এবং আরও কেহ কেহ যখন বলেন যে ঋগ্বেদের জারতুষ্ট্রের নামোল্লেখ রহিয়াছে তখন সেই বিষয়ে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা কোন অনুসন্ধানকারীই স্বীকার করেন না। ঋগ্বেদের "জরদষ্টি', (৭।৫৭।৭) শব্দের অর্থ কোনপ্রকারেই জারতুষ্ট্র হইতে পারে না। মূল দেখিলেই ইহার অন্য অর্থ প্রকাশ পাইবে। ম্যাক্সমুলার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনুবাদকগণ উক্ত শব্দে এই অর্থ পান নাই। অন্যপক্ষে, বেদের "ইষ্টাশ্ব" যদি ইরানী বিতস্পের সহিত এক বলিয়া ধার্য্য হয় তাহা হইলে আমরা বেদের এই সূক্তের তারিখ নির্দ্ধারণ করিতে পারি। কিন্তু জারতুষ্ট্রের তারিখ নিয়া অনেক বিতর্ক আছে (২)।

পারস্যের জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মপুস্তকে (বুন্দেহেস) উল্লিখিত আছে, ধর্ম্মসংস্কারক বা আহুর মজদার উপাসনা স্থাপক জারতুষ্ট্রের তিন পুত্র সমাজের তিনটি শ্রেণী সৃষ্টি করে (৩)। প্রথমে তিনি নিজেই এই তিন শ্রেণীর পদের প্রতীক ছিলেন, পরে তাঁহার তিন পুত্রের দ্বারাই তিন শ্রেণী বিভিন্ন হইয়া বংশবৃদ্ধি হয়। এই সঙ্গে তিনটি পৃথক অগ্নির কথা উল্লেখ আছে, তাহা পরে তিন বর্ণের লোক সমষ্টি দ্বারা বিভক্ত হয়। এই সময়ে একটি শিল্পী শ্রেণী (Artizan class) ইরানে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহারা গণ্য হইত না। সম্ভবতঃ তাহারা কৃষি শ্রেণীর সঙ্গেই গণ্য হইত (৪)।

অন্যপক্ষে ডিনকার্ড (Dinkard) নামক ধর্ম্মপুস্তকে সমাজকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই বিভাগকে মানব শরীরের সহিত তুলনা

২। এই বিষয়ে Prof. Jackson-এর পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান সোভিয়েট রুশ বৈজ্ঞানিকেরা ইহার তারিখ আরও প্রাচীন বলিয়া ধার্য্য করেন।

৩-৪। Spiegel—Eranische Altertumskunde, Vol. II Pp. 549-550.

(analogy) করা হইয়াছে, মস্তকের সহিত পুরোহিতশ্রেণীর, হস্তের সহিত যোদ্ধা শ্রেণীর, পেটের সহিত কৃষিজীবীদের (agriculturists) এবং পদের সহিত শিল্পীদের (artisans) (৫)। এই বর্ণনার সহিত ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুস্তকের বর্ণনার কতকটা মিল আছে, এতদ্বারা তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন ইরান এবং ভারতে যোদ্ধৃশ্রেণীর পরেই কৃষিজীবীদের স্থান ছিল কিন্তু চীনে শেষোক্তদের স্থান বুদ্ধিজীবীদের, অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর পরেই ছিল (৬) অর্থাৎ চীনে সৈন্য শ্রেণীর স্থান সর্ব্ব নিম্নে! জারতুষ্টীয় Yasna নামক ধর্ম্মপুস্তকে শেষোক্ত ইরানীশ্রেণীর নাম 'হুতি' (Huti or Huiti) বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানের অনুসন্ধানকারিগণ বলেন—আরও একটি শ্রেণীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না। ইহাদের রাজনীতিক অধিকার প্রদত্ত হইত না। একজন স্বাধীন পুরুষ (freeman) নিজেকে অপরের নিকট বাঁধা দিয়া নিজের স্বাধীন মুক্তাবস্থা হারাইত (৭)। শেষ জারতুষ্টীয় সাম্রাজ্য (Sassanian Empire) প্রতিষ্ঠাতার প্রধান পুরোহিত টান্সার তাঁহার বিবৃতিতে (৪র্থ ৫ম খৃষ্টাব্দে) তৃতীয়, অর্থাৎ কৃষিজীবীদের পরিবর্ত্তে একটা মসিজীবীশ্রেণীর (Scribe) (৮) নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মধ্যে যে সব লেখক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, রাজনীতিক,

৫। Dhalla—Zoroastrian Civilization, P 285.

৬। Ling ung Bing—Op. Cit. 48.

৭। W. Geiger—"Ost iranische Kultur im Altertum" Ch. VIII Pp 415-481.

৮। প্রাচীন জগতের প্রাচ্যদেশ সমূহে—যথা, ইজিপ্ত, ব্যাবিলন, পারস্য প্রভৃতি দেশে কালক্রমে শাসক শ্রেণীর পার্শ্বেই রাজ্য সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের লেখক রূপে একটি বুদ্ধিজীবিশ্রেণী বিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ভারতেও অশোকের সময় 'রাজুক' (প্রাকৃত—'লাজুক') শ্রেণী ছিল এবং যাহারকেই 'কায়স্থ' বলিয়া একটি শ্রেণীর নাম প্রথমে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়! নিশ্চয়ই বহুপরে এই শ্রেণী জাতিতে পরিণত হয়।

আইনগত ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় সম্বন্ধীয় দলিলাদি লিখিত তাহাদের এবং তীষকদের, কবিদের এবং দৈবজ্ঞদেরও তিনি গণনা করিয়াছেন (৯)। পুনঃ সোভিয়েট রুশের পণ্ডিতদের নূতনাবিষ্কার যে সাসানীয় যুগে সামন্ততন্ত্র এবং Guild System (পেশাগত সংঘ) উদ্ভূত হইয়াছিল। (১০) এই সব বিবরণের সহিত প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিবর্ত্তনের কতখানি সৌসাদৃশ্য আছে তাহা আমরা ইহা হইতেই বুঝিতে পারি (১১)। ব্রাহ্মণ্য পুস্তক সমূহে একই সমাজ হইতে অন্যান্যদের উৎপত্তির কথা অস্বীকৃত হয় নাই। বর্ত্তমান ভারতে অনেক শিল্পীজাতি কেন পতিত তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের গল্প অপেক্ষা (ব্রহ্ম খণ্ড, ১০ম অধ্যায়) হয়ত এই ইরানী তথ্যের আলোকের সাহায্যে বোধগম্য হইতে পারে। সমাজের একটা শ্রেণীর বা লোকসমষ্টির উত্থান ও পতন, পুরোহিতদের ব্যবস্থা বা অভিশাপের দ্বারা সম্ভবপর হয় না। তাহার পশ্চাতে রাজনীতিক-সমাজতাত্ত্বিক অনুষ্ঠানসমূহ থাকে। ইরাণী ধর্ম্মপুস্তক সমূহ পাঠে এইরূপ উপলব্ধি হয় যে হিন্দুর সমাজ কেবল পুরোহিতদের খামখেয়ালীপ্রসূত নয়। ইহার মূল আরো অনেক সুদূর অতীতে নিহিত আছে। ইহার অভিব্যক্তির একটা কার্য্যকারণ রহিয়াছে। আজ আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি এবং সেই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ নাই বলিয়া আমরা সেই বিবর্ত্তনের ধারা ও সূত্র অনুসরণ করিতে পারি না।

৯। Dermesteter—"Lettre de Tansar au roi de Tabaristan" in J. A. 1394, quoted by Dhalla "Zoroastrian Civilization." Pp 517—51.

১০। "Moscow News" April, 1944. Pigulevskaya র "Iran under khasrau II" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১১। লেখক ও তাঁহার অধ্যাপক পরলোকগত F. Von Luschan (বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নরতত্ত্বের অধ্যাপক) উভয়ে এই একমতে উপনীত

৫ জন-তত্ত্ব

একণে প্রশ্ন ওঠে, ভারতীয়েরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল কিন্তু তৎসত্ত্বেও "কৌম' অথবা 'জন'রূপ পদ্ধতি (tribal system) আজ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে উহার পরিবর্ত্তে জনপদের নামধারী লোকসমাজ পরিলক্ষিত হয়। ইহা কি প্রকারে সংঘটিত হয়? বৈদিকযুগে কুলসমূহের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুলগুলি এক গোষ্ঠি-প্রসূত এবং নানাপ্রকারের সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ; এই প্রকারের আবদ্ধ কুলগুলি সম্মিলিত হইয়া একটা 'জন' বা "কৌম' (tribe) সংগঠন করে। তখন তাহাদের আত্মীয়তার কথা স্মরণ থাকে, সেইজন্য তাহারা নিজেদের কুল অথবা জনের পরিচয়ে পরিচিত হয়। ভারতীয় একটি জন যে একই পিতৃপুরুষপ্রসূত তাহা পৌরাণিক কাহিনীতেই বিবৃত হইয়াছে। যখন বলা হইয়াছে ঋষি কক্ষিবন্তের পুত্রগণ (মৎস্যপুরাণ অনুসারে তাহার পিতা ঋষি দীর্ঘতমার পুত্র) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ইত্যাদি এবং যখন এই সকল ব্যক্তিগণের নামানুসারে পরে বিভিন্ন জনের বাসস্থলের নামও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তখন ইহার মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক বিবর্ত্তনের একটা খুব বড় ধাপের সংবাদ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাতি-সমূহের বিবর্ত্তনের ধারা নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায়, একটি লোক-সমষ্টি উহার কৌমগত অবস্থায় একটি টটেম অথবা একটি কল্পিত রাজাকে তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ বলিয়া থাকে। বৈদিক দেবতাগণ এই প্রকারেরই বড় বড় রাজা ছিলেন (মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ; মহীধর এবং দুর্গাচার্য্যের উক্তি দ্রষ্টব্য); তাহারা

হইয়াছিলেন যে ভারতীয় আর্য্যদের জাতিতত্ত্বের চাবিকাটি ইরানেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বিষয়ে সূক্ষ্মভাবে তুলনামূলক অনুসন্ধান প্রয়োজন। এশিয়া মাইনরে চারিসহস্র বা ততোধিক বৎসরের পূর্ব্বের মিটানীদের সংস্কৃতমূলক ভাষা ও ইন্দ্র, বরুণ, নাসত্য দেবতাদের পূজার সংবাদ আবিষ্কৃত হওয়ায় এই তথ্য আরও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে।

নিশ্চয়ই hero-eponym, অর্থাৎ কোনও কৌমের কল্পিত রাজা অথবা পূর্ব্বপুরুষ যিনি পরিচালক বা দলপতি ছিলেন। ইহার পর তাহারা দেবত্বে উন্নীত হয়েন (Apotheosis) (১)। সেই সময় কৌমের নাম হইতেই এই চালকের নামকরণ হয় বা তাহার নাম হইতে কৌমের নামকরণ হয়; কারণ কৌমের সকলেই তাহারই বংশধররূপে গণ্য হয়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি কৌমের চালকগণই বোধ হয় (hero-eponym) হইয়া কক্ষিবন্ত বা দীর্ঘতমা (মৎস্যপুরাণের মতে এবং বিষ্ণুপুরাণের মতে) ঋষির পুত্ররূপে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে; তদ্রূপ মৎস্যপুরাণে (৪৮শ অধ্যায়) দুষ্মন্তের বংশে পাণ্ড্য, কেরল, চোল, কর্ণ পুত্রগণ উৎপন্ন হয়; "এই সকল পুত্রের অধিকৃত জনপদগুলিও পাণ্ড্য, চোল ও কেরল নামেই খ্যাত।" দ্রুহ্যের বংশে গান্ধার, "এই গান্ধারের নামানুসারেই সুবিশাল গান্ধার দেশ প্রসিদ্ধ।" অনুর বংশের পুত্রগণের নামে সুসমৃদ্ধ জনপদগুলির নাম—কেকয়, ভদ্রক, সৌবীর ও পৌর। এই কেকয়ের পিতার নাম শিবি (১—২১)। সংস্কৃত পুস্তকে শিবি নামে একটি ক্ষত্রিয় কৌমের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের সহিত শিবিদের যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রদীপের এক পুত্রের নাম বাহ্লিক। ইহার নামানুসারেই (বর্ত্তমান বাল্‌খ) দেশের নামকরণ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। (২)।

১। প্রাচীন জাতিগুলির দেবতারাও এই প্রকারে রাজা ও যোদ্ধা হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। রোমানযুগে মেসিনার Evenmerus এইসব দেবতাদের অতীত যুগের রাজা ও যোদ্ধা বলিয়াছিলেন। (Plutarch, quoted by Moret "Kings and Gods of Egypt"; P. 100)।

২। আবেস্তা অনুযায়ী বাহ্লিকের প্রাচীন নাম—বক্‌্রা এবং ইহা ইরানীয় ইতিহাসের প্রথমযুগের পিসদাদীয় ও কিয়ানীয় রাজবংশের রাজধানী ছিল। প্রকাশ হয়, বহুপরে এই স্থানটি ভারতীয় উপনিবেশের অন্তর্গত হওয়ায় হিন্দু লেখকেরা "বাহ্লীক" নামে একটি hero-eponym খাড়া করেন।

এইরূপ দেখা যায় যে ভারতেও অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রথমে কৌমগত সামাজিক সংঘবদ্ধতা (tribal organisation), তারপর জনপদগত সামাজিক সংঘবদ্ধতা (territorial organisation) বিবর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে এই সকল জনপদের লোক আর কৌমের নামে পরিচিত হয় না। তাহাদের বশ্যতা (obedience) তখন বাসস্থানে প্রদত্ত হয়। তখন তাহারা এক কৌমের লোক, এই স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া এক জনপদের লোক বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। এই প্রকারে কুল-প্রথা ভাঙ্গিয়া জনপদসমূহ (territorial districts, marches, communes) (৩) সৃষ্ট হইয়া তত্রত্য লোকসমূহ বাসস্থলের নামে নিজেদের সামাজিক সংঘবদ্ধতা বিবর্দ্ধন করে। এই প্রকারে যখন একটি কৌম একটি নির্দ্দিষ্ট জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তখন রক্তগত আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে ঐ জায়গার মাটি ও ভূমির সম্পর্ক দ্বারা তাহার সামাজিক সংঘবদ্ধতা গঠিত হয়। (৪)। তখন রাজশক্তি (sovereignty) কৌম হইতে ভূমিতে ন্যস্ত হয়। যেমন, "পূর্ব্বে ইংরাজদের বাসভূমিকে ইংলণ্ড বলা হইত; এক্ষণে যাঁহারা ইংলণ্ডে বাস করে তাহারা ইংরেজ" (৫)। এইরূপে ভারতেও দেখা যায়, পুরাকালে এক একটি কৌম তাহাদের টটেমগত একটি কল্পিত চালক অথবা রাজার নামে পরিচিত হইত। তাহাদের বশ্যতা (obedience) তাহাদের কৌমের পরিচালকের কাছে ছিল। তাহারা যেখানেই থাকুক না কেন, কৌমের আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিত। ইহার মধ্যে ক্ষত্রিয় কৌমগুলির নাম তখন শিবি, উশীনর, কুরু, পুরু, অনু, দ্রুহ্য, লিচ্ছবি প্রভৃতি

৩। E. Durkheim—"La Division du travail Social."

৪। Sumner Maine—"Notes on the History of Ancient Institutions," 1874.

৫। Sumner Maine—Notes on the History of Ancient Institutions P. 21.

ছিল। আর বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে বশিষ্ঠ, অঙ্গিরস, অত্রি প্রভৃতি কুল ছিল এবং প্রত্যেক কুল আবার পরিধেয় বস্ত্র, শিখা প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর পৃথকভাবে চিহ্নিত হইত। কিন্তু এই বিবর্ত্তনের পরের স্তরে দেখা যায় যে বুদ্ধের সময় হইতে ব্রাহ্মণেরা উদীচ্য, প্রাচ্য প্রভৃতি ভূভাগের সহিত সনাক্ত (identified) হইয়াছে। তাঁহাদের দেশগত আচার-ব্যবহারের পার্থক্য এবং বিভিন্নতাও সৃষ্ট হইয়াছে (উদীচ্যেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং মগধের ব্রাহ্মণদের নিম্নস্তরের মনে করিয়া তাহাদের "ব্রহ্ম-বন্ধু" বলিতেন) (৬)। ইহার আরও পরে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণেরা সারস্বত, গৌড়, মালব্য, কান্যকুব্জ, সরযুপারী, মৈথিলী, কোঁকনস্থ, দ্রাবিড় ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। এই সময়ে "কুল" গোত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণেরা জনপদে বিভক্ত হইয়া সেই দেশীয় লোক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এখন একগোত্রীয় লোকই বিভিন্ন জনপদের অধিবাসী হইলে ভিন্ন দেশীয়—অতএব পর বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। এতদ্বারা অন্য দেশের ন্যায় একই বিবর্ত্তনের ধারা দৃষ্ট হইয়া থাকে, রক্তগত (বংশগত) আত্মীয়তা-রূপ সামাজিক বন্ধনের পরিবর্ত্তে দেশগত সামাজিক সংঘবদ্ধতা উদ্ভূত হইয়াছে। কোনও অজানিত সময়ে (বোধ হয় কোন রাজনীতিক কারণবশতঃ) ভারতের ব্রাহ্মণেরা উত্তরের "পঞ্চ গৌড়" এবং দক্ষিণের "পঞ্চ দ্রাবিড়" এই দুই শ্রেণীতে পুনরায় বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী স্তরের বিবর্ত্তন হইতেছে বর্ত্তমানের প্রাদেশিক বিভাগ। এই রূপে দৃষ্ট হইবে যে লোক প্রথমে একটা hero-eponym-এর নামে পরিচিত হইত; তৎপর তাহারা একটা নির্দ্দিষ্ট জনপদের সহিত সনাক্ত হইয়া সেই নামেই পরিচিত হয়: যথা, ঋষি পুত্র বঙ্গের বাসস্থলের নাম হইল "বঙ্গ"। সুতরাং যে বঙ্গে বাস করে সে-ই বঙ্গীয় বা বাঙ্গালী। এক্ষণে উত্তরের এবং পূর্ব্বের বা দক্ষিণের একই গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পরস্পর আত্মীয় বলিয়া

৬। Fick—"Sociale Gliederung..."

স্বীকার করেন না। কুলগত সম্পর্ক ভাঙ্গিয়া জনপদগত সম্পর্ক গঠিত হয়; উহাও আবার মধ্যযুগে প্রদেশ বা রাষ্ট্রগত সম্পর্কে অভিব্যক্ত হয়। বোধ হয়, মধ্যযুগে ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় এই প্রকারের প্রাদেশিক অভিব্যক্তি হয়। আধুনিক সময়ে যে এক গোত্রের বা এক বর্ণের অথচ বিভিন্ন প্রদেশবাসী লোকদের মধ্যে পৃথক পৃথক লোকাচার পরিদৃষ্ট হয় তাহা ভারতের ইতিহাসে একজাতিত্ব সংগঠনের অভাবেই হইয়াছে।

দেখা যায় হিন্দুর সকল জাতির ভিতরেই কৌমগত অথবা জনপদগত বিভিন্নতা বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুজাতির সমাজ বিভিন্ন সমাজের সমষ্টি (congeries of communities) বলিয়া ইহার সর্ব্বাংশ সভ্যতার বিবর্ত্তনের সমধাপে আরোহণ করিতে পারে নাই। সেইজন্যই একটি প্রচলিত কথা আছে, "বার রাজপুতের তের হাঁড়ি"। কায়স্থেরা (৭) আসলে বারটি কৌমে বিভক্ত; তাহারা কল্পিত চিত্রগুপ্তের বার পুত্রের বংশধর, অতএব বারটি কুলে বিভক্ত,—এইরূপ দাবী করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্তের রূপক কাহিনীটি বাদ দিয়া যদি তাহাকে কায়স্থ গিল্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয় তাহা হইলে তাঁহার বার পুত্রেরা এই সকল কৌমের hero-eponym ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। তবে তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি কৌম (মাথুর, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি) এক সময়ে ঐ নামের জনপদের সহিত সনাক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তবে অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে কতকগুলি জাতির মধ্যে উভয় প্রকারের সামাজিক বন্ধন যুগপৎ বিরাজ করিতেছে। এই বিবর্ত্তনের পরের স্তর হিন্দু-সমাজ বিবর্ত্তন করিতে পারে নাই। অন্যান্য দেশে জনপদগুলি একত্রিত হইয়া একজাতিত্বে (Nationhood) বিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু ভারত উহা করিতে

৭। N. N. Vasu—Ethnology of the Kayasthas (in Bengalee) এবং এই সম্পর্কে Dr. D. N. Mazumder-এর নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য।

পারে নাই বলিয়াই হিন্দু চিরকাল শতধা-বিচ্ছিন্ন। সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যতন্ত্র হিন্দুর ইতিহাসের বেশীরভাগ সময়ে অবর্ত্তমান ছিল বলিয়াই হিন্দুদের একচ্ছত্র দেবতারূপ একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম (monotheism) পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া অনুমিত হয়।

এক্ষণে বাঙ্গলার অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে অতীতের কৌমগুলি, যথা—পৌণ্ড্র, বগদ (বাগ্দী) [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য], কোঁচ, কৈবর্ত্ত, নমশূদ্র, আগুরী, বাউরী, ভূমিজ, সামবঙ্গীয়, মাল, খ্যান প্রভৃতি কৌমগুলি আর এখন স্বতন্ত্রভাবে বাঙ্গলায় নাই। তাহারা হয় "জাতিতাত্ত্বিক জাতি" (Ethnic castes) রূপে, না-হয় অন্য প্রকারের হিন্দুসমাজের কোন-না-কোন একটা স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কৌমগুলি [ইহারাও নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন] হয় একটা "জাতি" (caste) রূপে আছেন, না-হয় নরতাত্ত্বিক ধারানুযায়ী বিশাল বর্ণসঙ্কর লোকসমষ্টির মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কাজেই বাংলার-কৌম-পদ্ধতি আর নাই; পাল-রাজাদের সময় হইতেই খাঁটি বাঙ্গলার লোক-মধ্যে কৌম-পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাঙ্গলার সমুদয় জাতিই জনপদে বিভক্ত; রাঢ়ী, (উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ী), বারেন্দ্র, বঙ্গজ ইত্যাদি। বাঙ্গলায় তথাকথিত কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণ বাংলায় জনপদ পদ্ধতি (territorial organisation) বিবর্ত্তিত করিয়া সমাজবদ্ধ হইয়াছেন। বাঙ্গলার বাহিরের বিভিন্ন জনপদের ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গলায় আসিয়া বাঙ্গলায় জনপদ ভিত্তিতে নূতন সমাজ-বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছেন (৮)। বাঙ্গলায় পশ্চিমের দ্বাদশ কৌমের কায়স্থগণের সমাজের পরিবর্ত্তে জনপদগত বিভাগ—দুই প্রকারের রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ ইত্যাদিতে বিভক্ত হইয়াছে। এমন-কি, পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত অনাচারণীয় বাউরী জাতির

৮। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভারতের সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সমাবেশ হইয়াছে। ইঁহাদের কুলজীগ্রন্থে ইহা উল্লিখিত আছে।

সমাজও জনপদে বিভক্ত হইয়াছে (৯)। এইজন্য বঙ্গের হিন্দুসমাজ কৌমগত সমাজ নহে—জনপদগত সমাজ; এবং পাল যুগে ইহা এক রাষ্ট্রিকতাপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্টিগত এবং রাজনীতিক একজাতিত্ব বিবর্ত্তন করে। লেখক এই বিবর্ত্তনকে বাঙ্গলার 'প্রথম সামাজিক সমীকরণ' (First Social Integration) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১০)। অতঃপর সেন রাজাদের আমলে এক-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সকলকে আনয়ন করা হয়। বাঙ্গলায় সেন রাজাদের সার্ব্বভৌমত্বের অবসানেও এই বিবর্ত্তনের ধারা সমগ্র বাঙ্গলায় চৈতন্য-রঘুনন্দনের সময় পর্য্যন্ত চলে বলিয়া অনুমিত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন জাতির সমীকরণের সংবাদ পাওয়া যায়; এবং এই সময়েই নব-ব্রাহ্মণ্যবাদীয় রঘুনন্দনের স্মৃতি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতি "হরিভক্তি বিলাস" রচিত হয়। এই সময়ে বাঙ্গলায় হিন্দু এক-কৃষ্টি ও এক-আইন-সম্বলিত এক-জাতিত্বে বিবর্ত্তিত হয়। কেন্দ্রীয় স্বাধীন রাজশক্তির অভাবে বোধ হয় স্থানীয় সামন্তদের সহায়তায় এবং পূর্ব্ববঙ্গে সেন ও দেব রাজবংশ আরও শতবর্ষ রাজত্ব করায় এই বিবর্ত্তন সম্ভব হয়। বাঙ্গালা-সাহিত্য পাঠে ইহাই অনুমিত হয় যে বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ এই সময়েই তাহার বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করে। এই বিবর্ত্তনকে লেখক "বাঙ্গলার দ্বিতীয় সামাজিক সমীকরণ" (Second Social Integration) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সমীকরণের পর যখন অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুরা বাঙ্গলায় বসবাস করিতে থাকেন তখন তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের মধ্যে আর জীর্ণিভূত হন নাই। তাঁহারা আজও বাঙ্গালী সমাজের বাহিরেই আছেন। এই সময় নব-ব্রাহ্মণ্যবাদ বাঙ্গলায় অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া

৯। B. N. Datta—Ethnological Notes on some of the castes of West Bengal, Vide "Man in India." Vol. XV, No. 4 1935.

১০। B. N. Datta—Vide "Modern Review." "Population of Bengal", July—September, 1937.

সকল হিন্দুকে এক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সূত্রে গ্রথিত করে। ফলে, বাঙলার হিন্দুরা এক আচার ব্যবহার অনুসরণ করে; ভারতে আর কোথাও যদি ব্রাহ্মণ্যবাদ সকল শ্রেণী ও সকল জাতি দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে তবে তাহা এক বাঙলায়ই হইয়াছে (১১)।

বাঙলার বাহিরে মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি থাকা সত্ত্বেও জনপদগত সামাজিক বন্ধন বিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য তথায় একজাতীয়তার ভাব বিশেষভাবে বিবর্দ্ধিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডিউক্ অব ওয়েলিংটন মহারাষ্ট্রীয়দের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "They are the only nation in India" (ভারতের তাহারাই একমাত্র 'নেশন'—জাতি)।

মুসলমান যুগে জাতিগত সামাজিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে যে-জায়গায় সুবিধা পাইয়াছে জনপদ-সংঘবদ্ধতা ভাষা ও কৃষ্টির একত্বের মধ্য দিয়া একজাতিত্বের দিকে বিবর্ত্তিত ও অগ্রসর হইয়াছিল। উত্তরে হিন্দু আমলের শেষ ভাগ হইতে ভাষাগত প্রাদেশিকতার ভিত্তি স্থাপিত হইতেছিল, মুসলমান যুগে তাহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজ যুগে রাজনৈতিক বাতাবরণের জন্য তাহা প্রাদেশিক স্বজাতিকতাতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। একণে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা তাহাদের কুলগত, ধর্ম্মগত একত্ব ভুলিয়া গিয়া প্রাদেশিক বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে পর বলিতেছেন এবং ভাষাগত পার্থক্য এই বিভিন্নত্ব আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে।

---

৬ গোত্র পদ্ধতি

হিন্দুর 'গোত্র'রূপ প্রতিষ্ঠানটি তাহার সমাজ-শরীরে আজ অবধিও আটার মত লাগিয়া আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সমাজতাত্ত্বিক বিবর্ত্তনের ধারা যে

১১। রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব কোন মান্দ্রাজী সাধু লেখককে বলিয়াছেন যে, তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া কেবল বাঙলায়ই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হিন্দুর মধ্যে সর্ব্বজনীনভাবে গৃহীত হইতে দেখেন। এই উক্তি খুবই সত্য।

বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা হইয়াছে তাহা বলিয়া মনে হয় না। সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, জনপদগত সংঘবদ্ধতা যেমন ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকে, প্রাচীন পদ্ধতি [যাহা কাহারও কাহারও দ্বারা "টটেমগত 'সামাজিক' (১) সংঘবদ্ধতা" বলিয়াও অভিহিত] ক্ষীণতর হইতে থাকে (২)। ডুর্কহাইমের মতে, দুইটাই বস্তুতঃ বিরুদ্ধবাদী প্রতিষ্ঠান। বরং এই দুইটাকে সামাজিক অভিব্যক্তির দুইটি স্তর বলা যায় (৩)। দ্বিতীয়টির বিবর্তনের ফলে প্রথমটি অন্তর্হিত হয়। কিন্তু হিন্দুর গোত্র-রূপ প্রতিষ্ঠানটি হিন্দুত্বের পরিচায়করূপে আজও বিদ্যমান আছে। এইজন্যই ইহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

সমাজতাত্ত্বিকেরা বলেন, হিন্দুর 'গোত্র' গ্রীকের Gene (৪), রোমান Gens, কেল্টিক Clan এবং জার্মাণদের কৌম (tribe) নাম একই কর্ম্ম বাচক (analogous), অর্থাৎ ইহা একটা গোষ্ঠীর, অর্থাৎ পিতৃকুলগত একরক্ত-সম্পর্কীয় (agnate) লোকেরই পরিচায়ক। গোত্র দ্বারাই বৈদিক আর্য্যেরা কে কোন্ গোষ্ঠীর তাহা নির্ণীত হইতেন বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য পুস্তকসমূহে (বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত আছে, কেবল ব্রাহ্মণেরই গোত্র আছে, অন্য বর্ণের গোত্র নাই, তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র দ্বারাই পরিচিত হইত। ব্রাহ্মণ্য-পৌরহিত্যবাদ বলে—অন্যান্য বর্ণের এবং জাতির লোকেরা তাহাদের পুরোহিতের গোত্র দ্বারাই পরিচিত হয়। এখন বলা হয়

১। Howith—The Native tribes of South-East Australia; P. XIX,

২। Moret & Davy—"From Tribe to Empire", P 37.

৩। Durkheim—in Annie Sociologique, 1898—1932 Vol IV. & IX.

৪। এই বিষয়ে The Cambridge Mediaeval History, Vol. II Chap. XX, p 631 দ্রষ্টব্য।

বৈশ্যশূদ্রের গোত্র নাই; তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদেরও যে গোত্র ছিল তাহা নানা সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মধ্যযুগে অব্রাহ্মণদেরও যে গোত্র থাকিত তাহা শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের পূর্ব্বে নাগবংশীয় ভারশিব রাজবংশের গোত্র ছিল "বিষ্ণুবৃদ্ধ" (৫)। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশে একটি কুলের প্রতিষ্ঠাতার নামেই তার গোষ্ঠী পরিচিত হইত। বৈদিকযুগেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা না; ব্রাহ্মণেরা যেমন বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল ক্ষত্রিয়রাও তদ্রূপ ছিল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে শেষোক্তেরা প্রথমোক্তদের গোত্র দ্বারা কিরূপে পরিচিত হইবে? এবং ইতিপূর্ব্বেই ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে ক্ষত্রিয় কুল সকলের চারণ ছিল এবং কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সাহায্য না নিয়াই নিজের যজ্ঞাদি ক্রিয়া স্বয়ংই সম্পন্ন করিতেন। পুরাণাদিতেও দেখা যায়, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকুল হইতে অনেক ঋষি, এমন কি বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরও উদ্ভব হইয়াছে (মৎস্য, ১৪৫।১১৫-১১৮)। তবে ব্রাহ্মণেরাই আদি গোত্র সমূহের প্রতিষ্ঠাতা—এই দাবী কি প্রকারে গ্রাহ্য হইতে পারে?

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে (১।৭।৪—৫) ব্রহ্মার মানসপুত্র নয় জন। তাঁহারা পুরাণে ব্রহ্মা বলিয়া নির্ণীত হন (১।৭।৬)। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উক্ত তালিকায় মনুর নাম যোগ করিয়া ব্রহ্মার দশটি মানস পুত্র বলা হইয়াছে (৬৪'৮৮)। এই ঋষিরাই আদি Patriarch। বর্ত্তমান সময়ের অনুসন্ধান কারিগণের মধ্যে ম্যাক্সমূলার বলেন (৬), যেসব অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ছিলেন তাহারা সাতজন ঋষির সন্তান বলিয়া দাবী করিতেন। কিন্তু প্রাচীন

৫। Corpus Inscriptionum Indicarum Vol III. No 55 "Chamak Copperplate inscription of the Maharaja Pravarasena, P. 240—241.

৬। Max Mueller—A History of Ancient Sanskrit Literature, P. 386.

প্রস্তাবে আটজন পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। এই আট গোত্র হইতে পরে বহু গোত্র উৎপন্ন হয় (আট হইতে উনপঞ্চাশ গোত্র এবং ইহারাও বহু গোষ্ঠীতে বিভৃত হয়) (৭)। ম্যাক্সমূলার বলেন, যজ্ঞে অগ্নির আবাহনকে 'প্রবর' বলা হইত (৮)। ব্রাহ্মণ যজ্ঞকালে তাহার প্রদত্ত আহুতি পূর্ব্বপুরুষদের নিকট নিয়া যাইবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিত। এই সময়ে ব্রাহ্মণ তাহার পিতৃপুরুষগণের নামোল্লেখ করিত। এই প্রকারে পিতৃপুরুষগণের আবাহনকে 'প্রবর' বলা হইত। "গোত্র' ও 'প্রবরের' তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে একটি গোত্রের প্রবর সমূহ আবার অন্যত্র নিজেরাই গোত্র-প্রবর্ত্তক হইয়াছে। এই প্রকারে গোত্রের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ, একটি মূল বংশের লোকেরা নিজেদের পৃথক বংশ (clan) স্থাপন করিয়া কুলসমূহ বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত কুল একত্রিত করিয়া একটি কৌম (tribe) সংগঠিত হয়। এইজন্য যে-সকল দেশে এখন কুল-প্রথা বিদ্যমান আছে, সেখানে পরিচয় প্রদানকালে নিজের নাম, তাহার কুলের নাম, তাহার কৌমের নাম তত্রত্য অধিবাসীরা বলিয়া থাকে। হিন্দুর গোত্র ও প্রবরের আধ্যাত্মিক দিকটা বাদ দিলে এই সকল দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত হিন্দুর কৌমগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনায়ও এই প্রকারে কুল সমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও মধ্যযুগীয় রাজপুতদের মধ্যে যে-প্রকারের কৌম ও কুলপ্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এইরূপ প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ উক্ত প্রকারেরই ছিল এবং এখনও আছে।

এক্ষণে কথা এই যে, ব্রাহ্মণের বেলায় যে-প্রকারের বিবর্ত্তন হইয়াছিল, অন্যান্য বর্ণের বেলায় কি বিভিন্ন ধারা উদ্ভূত হইয়াছিল? ক্ষত্রিয়দের বেলায় পুরাণ সমূহে বিভিন্ন কৌম ও কুলের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—সূর্য্যবংশীয় মান্ধাতার বংশে হারিত হইতে অঙ্গিরস নামে

৭। R. Ghose—History of Hindu Civilisation, P58.

৮। Max Mullar—A History of Ancient Sanskrit Literature, P. 386.

ক্ষত্রিয়কুল প্রবর্ত্তিত হয় (৪।৩।৫); পুনঃ মান্ধাতার পুরুকুৎস নামক পুত্রের বংশে সগর রাজা ও তাহার বংশে রামচন্দ্রের জন্ম হয় (৪।৪)। ইহাঁরা সকলেই ইক্ষাকু বংশীয়। ইক্ষাকু বংশে নিমি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বংশেই জনক রাজার জন্ম হয় (৪।৫)। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তাঁহার পুত্র চন্দ্র (৪।৬।৫), এবং চন্দ্রবংশও বিবিধ কুলে বিভক্ত হয়: নহুষ, যযাতি (ভরত বংশ), কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন (হৈহয় বংশ), পুরুরবার বংশে গাধি (কৌশিক বংশ)। আবার চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার বংশে গৃৎসমদ (বৈদিক ঋষি) জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র শৌনক—, এই শৌনকই চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তয়িতা (৪৮।১); এই বংশে ভার্গভূমি হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তিত হয়। ইহারা কাশ্যপ ভূপালগণ (৪।৮।১)। তৎপর রজির-বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে (৪।৯)। তৎপর যযাতির বংশে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য, যদু এবং অনু উদ্ভূত হন (৪।১০)। আবার, ইহাঁদের বিভিন্ন বংশ উদ্ভূত হয় (৪।১৫—১৭)। পুরুর বংশে অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, তৎপুত্র মেধাতিথি; এবং এই মেধাতিথি হইতেই কণ্বায়ন নামে দ্বিজগণ উৎপন্ন হন (৪।১৯।১-২)। আবার ভরতের বংশে গর্গের পুত্র শিনি—এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীর্ত্তিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (৪।১৯।৯)। আবার এই বংশের উরুক্ষয়ের তিন পুত্রই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন (৪।১৯।১০)। 'মুদ্গল' হইতে জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া 'মদ্গাল্য' নামে অভিহিত হয়েন (৪।১৯।১৬)। এই বংশে কুরু জন্মগ্রহণ করেন; এই বংশেরই বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ। ইহারাই মাগধ নরপতি (৪।১৯।১৮-১৯)। কুরুবংশীয় জন্মেজয়ের বংশে ক্ষেমক জন্মগ্রহণ করেন; এই ক্ষেমক সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—যথা, "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ যে বংশকে বহু রাজর্ষি জন্মগ্রহণ করিয়া অলঙ্কৃত করিয়াছেন......" (৪।২১।৪)।

এইরূপে আমরা দেখি, ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেও একটি বীজ-কুল হইতে কি প্রকারে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও 'কুল' প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছিল। এই সকল বংশ-তালিকা জাতিতাত্ত্বিক বিচারসহ, অর্থাৎ একটি বীজ বংশ হইতে নূতন নূতন

'কুলের' উদ্ভব হইয়াছে এবং এইগুলি একজন আদি পুরুষের নাম স্মরণ করিয়া একটি কৌমের অন্তর্গত বলিয়া মনে করে। যদি সূর্য্যবংশ বা চন্দ্রবংশ একটি কৌম (tribe) হয়, তাহা হইলে এই বংশ হইতে বহু লোক দ্বারা বিভিন্ন কুল (clan) সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহারা পৃথক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আদি-পুরুষের নামে পরস্পরের সহিত জ্ঞাতিত্ব স্মরণ করিয়া থাকে। এই পূর্ব্বপুরুষকে সকলেই পূজা করিত। বিভিন্ন বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রবরদের পূর্ব্বপুরুষ ভাবিয়া পূজা অর্চ্চনাতে আহ্বান করিয়া এক কৌমগত আত্মীয়তা বজায় রাখিত। মৎস্য পুরাণে বিভিন্ন গোত্র ও প্রবরের বংশ-তালিকা প্রদানকালে এক মূলগোত্রীয় বিভিন্ন প্রবরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে (১৯৫।৩৬; ১৯৫।১১; ১৯৫। ১২-২০)। এতদ্বারা আমরা এই সমাজতাত্ত্বিক তথ্য পাই যে একটি কৌম (tribe) হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন শাখা পৃথক হইলেও তাহারা একই পিতৃ-পুরুষ হইতে জাত বলিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এতদ্বারা তাহারা exogamous (কৌমের বাহিরে) বিবাহ করিত। বোধ হয়, এই প্রথার মূলে টটেমবাদীয় বিশ্বাস-ই কার্য্যকরী ছিল (৮) বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গেল যে ক্ষত্রিয়কুল হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণকুলের উদ্ভব হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের (ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরস, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ) অন্যতম (১।৭।৪—৫)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই তালিকার সহিত মন্থর নাম প্রদত্ত হইয়াছে (৮৭।৮৮)। কিন্তু মনু সংহিতাতে যেসব নাম প্রদত্ত হইয়াছে (১।৩৪—৩৫) তাহার সহিত এই তালিকা মিলে না। তথায় মন্থর নাম নাই এবং প্রচেতা ও নারদের নাম আছে। আবার এই ক্ষত্রিয়কুল হইতে বৈদিক ঋষিও উদ্ভূত হন এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তকও হন। আবার ভরত-বংশ হইতে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকুল সমূহের সৃষ্টি হয়।

৮। এই প্রকারের বিবাহ বিষয়ে Fraser "Totemism and Exogamy", Durkheim "The Elementary Forms of the Religious life" দ্রষ্টব্য।

এই বিবরণ হইতে আমরা এই তথ্য অবগত হইলাম যে কেবল ব্রাহ্মণরাই আদি-গোত্র প্রবর্তক বা আদি প্রজাপতি (Patriarch) ছিলেন না।

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মাত্র সাতজন আদি-গোত্রীয় লোক ছিলেন, যাঁহারা গৃহে অগ্নি রক্ষা করিতেন; ইঁহারা হইলেন—ভৃগু, অঙ্গীরস, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অত্রি, অগস্ত্য (৯)। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে, আঙ্গীরসেরা ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব (৪।২।২)। ঋগ্বেদের বামদেব (৪র্থ মণ্ডল) ও ভরদ্বাজ (৬ষ্ঠ মণ্ডল) ঋষিগণ মৎস্যপুরাণের (১৩২ অধ্যায়) মতে অঙ্গীরস-বংশীয়; গৌতমও তদ্রূপ (মৎস্য, ১৯৬।৩)। মৎস্যপুরাণেই উল্লিখিত আছে ভরদ্বাজ, ভরত রাজার দত্তকপুত্র হইয়া 'বিতথ' নাম গ্রহণ করেন এবং সেই ভরদ্বাজ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় প্রকারের সন্তান জন্মগ্রহণ করিল (৪৯।৩০—৩৩)। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের মন্ত্রদ্রষ্টা হইতেছেন গৃৎসমদ ঋষি—বিষ্ণুপুরাণে ইঁহাকে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়ন বলেন, ইনি পূর্বে অঙ্গীরস-গোত্রীয় ছিলেন, পরে ভৃগু-গোত্রীয় গৃৎসমদ হন (১০)। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে ইনি পুরুরবার বংশজাত (৪।৮।১)। বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ু-পুরাণে বলা হইয়াছে যে ইনিই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করেন। বিশ্বামিত্রের বিষয় নিয়া সংস্কৃত সাহিত্য পরিপূর্ণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ইনি চন্দ্রবংশীয় কৌশিক বংশের লোক ছিলেন। ইনি এবং ইঁহার দত্তক পুত্র দেবরাট্ (শুনঃশেপ—ইনি প্রথমে ভৃগু-গোত্রীয় ছিলেন—বিষ্ণু ৪।৭।১৭), পরে পৃথক গোত্র ও প্রবর প্রবর্তন করেন। এই দেবরাটেরই বংশে যাজ্ঞবল্ক্য জন্মগ্রহণ করেন (মৎস্য,১৯৮।৪৫)। মৎস্যপুরাণে অত্রির সম্পর্কে বলা হইয়াছে—"অত্রির পুত্র শ্রীমান সোম। ইঁহারই বংশে জাত বিশ্বামিত্র তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন" (১৯৬।১—২)। ইহা হইতে অত্রিকে ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভব বলিয়া অবশ্যই ধরিতে হইবে। বিষ্ণুপুরাণ

৯। B. Ghose—op. cit., P. 59।

১০। R.C Dutt—History of Civilization in Ancient India, P 104.

মতে অত্রি ক্ষত্রিয় 'রাজন' পুরুরবার পিতামহ ছিলেন (৪।৬)। আর একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক বৈদিক ঋষি (৮ম মণ্ডল) ছিলেন কণ্ব। বিষ্ণুপুরাণ (৪।১৯১-২), ভাগবতপুরাণ (৪।২০।৬-৭) এবং মৎস্যপুরাণের (৪৯।৪৭) মতে ইনি পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব ছিলেন। উরুক্ষয়, কপিল বা কপি, শৈন্য, গার্গ, পুরুমীঢ়, মৌদগল প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গোত্রীয়েরা ক্ষত্রিয় পুরুবংশীয় ছিল (মৎস্য, ৫০।৪৪ ; বায়ু ৯৯, ২৭৪ ; বিষ্ণু ৪, ১৯।৯-১৬)। আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'ঔপমানব্য' গোত্র আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে ইহার পিতা উপমন্যু ঋষি কাম্বোজ দেশের লোক ছিলেন (বংশ ব্রাহ্মণ) (১১)। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছে—ক্রতু, অঙ্গিরা ও শিব রাজা উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুবের বংশধরগণ (১৩।৪-৭)। আবার ভৃগুবংশের একজন গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম হইতেছে 'কাম্বোজ' (১২।১৮)। এই কাম্বোজ যদি কাম্বোজ জাতীয় লোক হন তাহা হইলে আর একজন কাম্বোজ দেশীয় লোক আর্য্য-গোত্র মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। অনুমান হয় এই স্থলে আসল তথ্য লুকাইত করা হইয়াছে। ভৃগু নিজেই বিদেশ-জাত বলিয়া সন্দেহ হয়। 'কাম্বোজ'একটি দেশের নাম এবং সেই দেশবাসীরাও উক্ত নামে অভিহিত হয়। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহ্মার মানস-পুত্রদের মধ্যেও সকলে একবর্ণের ছিল না ; কতিপয় ক্ষাত্র-গোত্রীয়ও ইহাদের ভিতর ছিলেন। তৎপর সাগ্নিক আদি-গোত্রীয়দের মধ্যেও কতিপয় ক্ষত্রিয়বর্ণের লোক ছিল। তাহা হইলে কেবল ব্রাহ্মণেরাই আদিকাল হইতে গোত্র-বিশিষ্ট এবং অন্যান্য বর্ণের গোত্র ছিল না—এই কথা কি প্রকারে টিকিতে পারে? এক্ষণে কথা উঠে, বৈশ্যদের কি কোন গোত্র ছিল না? যখন বৈশ্য বর্ণের লোকদের মধ্যে বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিল, তখন তাহাদের যে কোন গোত্রই ছিল না এ কথা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? বরং ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রসমূহে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে বৈশ্যেরা দ্বিজবর্ণের অন্তর্গত। তজ্জন্য তাহাদেরও ব্রাহ্মণ এবং

১১। Quoted in Indische Studien by Weber 4, 372 ; বংশ ব্রাহ্মণ (১।৪-৫)।

ক্ষত্রিয়দের ন্যায় গোত্র ছিল বুঝিতে হইবে। মৎস্যপুরাণে তিন বর্ণের লোক হইতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উদ্ভব স্বীকার করা হইয়াছে (১৪৫।১১৫-১১৮)। আবার বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইতেছে—"হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যুগে যুগে অসংখ্য মহাত্মা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অতীত হইয়াছেন; আমি তাহাদের বহুত্ব নিবন্ধন ও প্রত্যেক কুলের পুনরুক্তি ও বহুত্ব ভয়ে ঐ 'পরিসংখ্যা' নির্দ্দেশ করিলাম না (২৪।৪৩-৪৪)।" এই সকল উক্তি হইতে বুঝিতে হইবে যে বৈশ্যদেরও গোত্র ছিল।

এক্ষণে শূদ্রদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। আজকাল বলা হয়, শূদ্রদের গোত্র ছিল না (রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্ব' এবং 'উদ্বাহতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য)। পুরোহিতের গোত্র দ্বারা তাঁহারা পরিচিত হন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মীয় শাস্ত্রসমূহ হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণ হইতে শূদ্র হওয়া এবং বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে; তদ্ব্যতীত কতিপয় ধর্ম্মপুস্তকে ভ্রষ্ট-ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্র এবং অন্ত্যজের উৎপত্তির কথাও বিবৃত হইয়াছে। ইঁহারা পতিত হইয়া কি গোত্র, প্রবর-পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের নাম অস্বীকার করিতেন? আজও পৃথিবীতে কোথাও কেহ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিলেও পূর্ব্বপুরুষদের পরিচয় অস্বীকার করেন না; এমন কি ভারতবর্ষেও নয়। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীনকালে অনেক লোকের দুইটি গোত্রও থাকিত। একগোত্রীয় লোক ভিন্নবংশে পালিত পুত্ররূপে গৃহীত হইলে এই পোষ্যপুত্র দুই কুলেরই গোত্র রক্ষা করিত। ইহাকে "দ্ব্যামুষ্যায়ণ" গোত্র বলা হয় (ছান্দোগ্য উপনিষদ ও উহার শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য) (১২)।

১২। একটি লোকের দুইটি গোত্র (দ্ব্যামুষ্যায়ণ গোত্র) থাকার প্রথা বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভেও ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের একটি তাম্রশাসনে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধ্রদেশের রাজা ... বিক্রমাদিত্য তেকানে ত্রিলোচন পল্লবের সহিত যুদ্ধে নিহত হন (লাইন ২৩-২৫)। তাঁহার অন্তঃসত্বা রাণী পুরোহিতের সহিত পলাইয়া মুদিভেমু

পুরাণসমূহে আমরা ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়বর্ণে এবং ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণবর্ণে বিবর্ত্তিত হইতে দেখি। এই সংবাদও জানা যায় যে ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব কোন ঋষিদের পুত্র চতুর্ব্বর্ণেই প্রবেশ করিয়াছিল। যখন তাহারা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে প্রবেশ করে তখন তাহারা কি নিজেদের পিতৃপুরুষদের নাম গোত্র লোপ করিয়াছিল? পুরাণে যখন এই প্রকারের দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইয়াছে তখন এই প্রকারের অনেক অনুষ্ঠানই সমাজে ঘটিত—তাহা না হইলে এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ হইত না। যখন বলা হইয়াছে যে শৌনকের পুত্রগণ চারিবর্ণে প্রবেশ করিল তখন নিশ্চয়ই একই পিতার সন্তানগণ নিজেদের বিভিন্ন বংশগত জাতি (caste) বা মূলজাতিতে (race) বিভক্ত করে নাই, বরং এই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর (class) মধ্যে নিজের গুণকর্ম্মগত মর্য্যাদা অনুসারে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বর্ণসমূহ শ্রেণী ছিল, কোন জন্মগত বংশানুক্রমিক (hereditary caste) 'জাতি' ছিল না—উক্ত সংবাদ দ্বারা আমাদের পূর্ব্বের আলোচনাই সমর্থিত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

BAGHBAZAR ... C... LIBRARY

অগ্রহারে (দেবস্থান) আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথাকার বিষ্ণুভট্ট সোমজী তাঁহাকে কন্যার ন্যায় পালন করেন; তথায় রাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই পুত্রের "বিষ্ণুবর্দ্ধন" নামকরণ করা হয়; এবং দুইপক্ষের গোত্র—মানব্য ও হারীত, তাহাকে প্রদান করা হয় (লাইন ২৫-২৯)—The Pamulavaka Copper-plate grant of Vijayaditya VII By R. Subba Rao in "The Quarterly Journal of the Andhra Historical Society", July, 1927.

(৭) গোত্র-তত্ত্ব

উপরোক্ত অনুসন্ধানের ফলে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে আদিতে সকল বর্ণেরই গোত্র এক ছিল। যখন বিষ্ণুপুরাণ মতে শৌনক চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তন করিলেন তখন তাঁহার বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণপ্রাপ্ত পুত্রগণ কি পিতৃ পরিচয় (গোত্র) বিলুপ্ত করিয়াছিল? আবার ভার্গভূমির পুত্রগণ যখন চারিবর্ণে বিভক্ত হয় তখন কি তাহারা তাহাদের কুলগত পরিচয় (গোত্র) পরিত্যাগ করিয়াছিল? তদ্রূপ ক্ষত্রিয় মনুর পুত্র 'নীভাগ' যখন বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয় তখন কি তদ্রূপ হইয়াছিল? পৃবীধ্র যখন শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছিলেন তখন কি তিনি গোত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? এই পৃবীধ্র, ঋকবেদের দশম মণ্ডলের একজন ঋষি (এতদ্বারা একজন শূদ্রকে বৈদিক ঋষিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। আবার উশনঃ সংহিতায় উল্লিখিত আছে "সপিণ্ড —শূদ্রের জন্ম-মরণে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ (উশনঃ ৬।৩৬) এতদ্বারা কি সূচিত হয় না যে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ও গোত্র একই ছিল?

পুরাণসমূহের এই সকল উক্তির দ্বারা আমাদের ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হয় যে আদিকালের চাতুর্ব্বর্ণ্যের একই উৎপত্তি ছিল। তজ্জন্য সকলেই এক গোত্রীয় ছিলেন। সামাজিক স্তর বা শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা তাহারা পরে পৃথকীকৃত হন, কিন্তু তজ্জন্য গোত্র ও প্রবর পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইতে পারে না। মনু প্রভৃতি পুস্তকসমূহে শূদ্রকে 'অনার্য্য' এবং বর্ণাশ্রমীয় সমাজের বাহিরের লোক বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। হালের ভারতীয় লেখকেরা এই শব্দের ইউরোপীয় অর্থ প্রয়োগ করেন। তাহারা শূদ্র অর্থে—Pre-Dravidian, Dravidian, Austroloid, non-Caucasian অর্থ গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজে প্রয়োগ করিয়া গোল বাঁধাইয়াছেন। ফলে, হিন্দুসমাজে কেহ Nordic খুঁজিতেছেন, কেহ বা Negrito খুঁজিতেছেন!

বর্ত্তমান ভারতের যে সব জাতিদের বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় তাহাদেরও গোত্র এবং প্রবর আছে। যতদূর জানা যায়, এইগুলি তথাকথিত ব্রাহ্মণ গোত্র। মধ্যযুগ হইতে যে কয়টি জাতি (caste) হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কায়স্থ, রাজপুত ও মারাঠা অন্যতম। ইহাদের সকলেরই গোত্র ও প্রবর আছে; আর সেইগুলি 'আর্যেয়'। এক্ষণে কথা উঠে, কবে ও কখন হইতে ইঁহারা এইসব গোত্র প্রাপ্ত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে প্রথমে "কায়স্থ" শব্দটি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এই শব্দটি যে একটি রাজকীয় পদবাচক ছিল তাহা বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তক সমূহ পাঠে স্পষ্টই বোধগম্য হয়। মিতাক্ষরা, সৌরপুরাণ, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি পুস্তকসমূহে কায়স্থদের 'রাজোপসেবকাঃ' 'রাজ সম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ'। 'রাজবল্লভ' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং বাঙ্গলার প্রাচীন রাজাদের শিলালিপি এবং অন্যান্য পুস্তকসমূহে রাজার 'কায়স্থ-বৃদ্ধ' এবং গ্রামের 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' বা 'প্রধান-কায়স্থ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে ইহা 'পদবাচক' ছিল। এই সঙ্গে [বর্ণ-পদ্ধতির মধ্যে কায়স্থদের যে-স্থানই থাকুক] তাহাদের গোত্র ও প্রবরগুলি ব্রাহ্মণ্য-পদ্ধতি অনুযায়ী। তৎপর রাজপুতের উত্থান ইতিহাসে প্রকাশ পায়; শেষে আসে মারাঠাগণ। রাজপুতদের গোত্রাদি ব্রাহ্মণ্য প্রথানুযায়ী। শ্রীযুত বৈদ্য ও পরলোকগত বসু মহাশয় বলিয়াছেন (১), মারাঠাদের গোত্রও ব্রাহ্মণ্য-পদ্ধতি অনুযায়ী। বৈদ্য বলেন, রাজপুত ও মারাঠাদের গোত্র এবং প্রবর প্রাচীন ক্ষত্রিয়ের সহিত এক— তজ্জন্য তাহাদের তিনি প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলেন। কিন্তু তিনি নিজেই

১। N. N. Vasu—kayastha Ethnology দ্রষ্টব্য। নগেন্দ্রবাবু কায়স্থদের প্রথম হইতেই একটা 'জাত' (caste) হিসাবে ধরিয়া নিয়াছেন। তাহার History of Kamrupa, Vol. III, Chap III; Kayastha Ethnology' (in Bengali) দ্রষ্টব্য। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকসমূহ পাঠে বোধগম্য হয় এই শব্দটি রাজকীয় পদবাচক ছিল।

বলিতেছেন, শিবাজী চিতোরের শিশোদীয় বংশোদ্ভব অথচ তাঁহার গোত্র ছিল 'কৌশিক', যদ্যপি শিশোদীয়গণের গোত্র হইতেছে 'বৈজবাপা'। তিনি বলেন, ইহা বিজ্ঞানেশ্বরের বিধানানুসারেই সংঘটিত হইয়াছিল; কারণ তিনি 'ক্ষত্রিয়দের পৃথক গোত্র নাই, তাহারা পুরোহিত ব্রাহ্মণের গোত্রই ধারণ করিবে'—এই মত প্রকাশ করেন (২)।

বর্ত্তমানের অ-ব্রাহ্মণ জাতিগুলির ব্রাহ্মণ্য গোত্র কি প্রকারে আসিল তাহার আজও যথার্থ অনুসন্ধান হয় নাই; তজ্জন্য সেই প্রশ্নের নিরাকরণ এই স্থলে সম্ভবপরও নহে। তবে যেটুকু অনুসন্ধান হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ্য পৌরহিত্য-তন্ত্রের দাবীর উপর ঘোর সন্দেহই উপস্থিত হয়।

এক্ষণে রাজপুতদের বিষয় ধরা যাউক। জয়ানকের 'পৃথিরাজ বিজয়' এবং 'হাম্বির মহাকাব্য' নামক পুস্তকদ্বয়ে সূর্য্যমণ্ডল হইতে 'চহমান' (চৌহান) রাজপুত কৌমের আদি পুরুষের মর্ত্ত্যে আগমনের কথা উল্লেখ আছে। (৩) অন্যপক্ষে রাজপুত চারণেরা এই কৌমটিকে 'আবু পর্ব্বতে' বশিষ্ঠ ঋষির যজ্ঞ কুণ্ড হইতে উদ্ভূত—তজ্জন্য 'অগ্নিকুল' নামে অভিহিত করেন (৪)। ইহা হইতে তাহাদিগের ভারতীয় উৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিজোলিয়া প্রস্তর-লিপিতে এই বংশের নামের তালিকায় সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তির নাম ও গোত্র

২। Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, Pp 324-325.

৩। রামকুমার বর্ম্মা—হিন্দী সাহিত্যিকা আলোচনাত্মক ইতিহাস এবং H. C. Roy—Dynastic History of Northern India, Vol II.

৪। Todd's Annals and Antiquities of Rajasthan, Edited by W Crookes

উল্লেখকালে তাহাকে 'বৎস্য' গোত্রীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (৫)। ইনি নাকি 'বৎস্য' ঋষির প্রিয় ছিলেন। (EP. Ind. Vol XI P, 70 ff.) আবার আবু পর্ব্বতের লুনটিগা লিপিগুলিতে বলা হইয়াছে—সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ দুইটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বচ্চ (বৎস) ঋষি চহমান নামক নূতন যোদ্ধাদের সৃষ্টি করেন (৬)।

এই সকল শিলালিপি হইতে এরূপ সন্দেহ জাগে যে চোহমান বা চোহান কৌমটি একটি 'নব-ক্ষত্রিয়' দল এবং তাহারা ব্রাহ্মণ্য গোত্র গ্রহণ করিয়াছে। অন্যপক্ষে চিতোরের বিখ্যাত শিশুদিয়া রাজপুত কৌমটির গোত্র হইতেছে 'বৈজয়াপা' (Vaijayapa)। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, এই কৌমটির প্রাচীন নাম ছিল 'গুহিল-পুত্র', 'গুহিলোট' (৭)। তাহারা ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই সূর্য্যবংশীয় রামচন্দ্রের বংশাবতংশ হিন্দু-সূর্য্যবংশ আদিতে গুজরাটের আনন্দপুরের ব্রাহ্মণ গুহদত্তের বংশধর ছিল (৮)। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ নিজকে 'মহীদেব' ও 'বিপ্রকুল-নন্দন' বলিতেন। (৯) আবার বালাদিত্যের 'চাটসু (Chatsu) লিপিতে এই বংশকে 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রান্বিত (Brahma-Kshatranvita) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১০)। তাহা হইলে এখানে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল যে ক্ষত্রিয়কুলশ্রেষ্ঠ বাপ্পারাওয়ের বংশ আসলে ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে

৫-৬। EP. Ind. Vol: 9. No D. P. 71 ff; EP. Ind Vol 12. P. 197.

৭। H. C. Roy—Op. cit. Vol, I p 629 ; Vol II, p 1153 ; D. R. Bhandarkar—B. R. A. S New Series, Vol V 19^9, Pp. 176—187

৮। H. C. Roy—Op. cit. Vol 11, p 1855, 1167 ff; Vol I P 356

৯। Ind. Antiquary, Vol 39, P. 186 ff.

১০। EP. Ind. Vol. 12, P. 10 ff.

Vaijayapa গোত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন (১১)। প্রত্নতত্ত্ববিদের অনুসন্ধানের ফলের সহিত এই তথ্য মিলিয়া যায়। তাহা হইলে এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে একটি নাগর ব্রাহ্মণ বংশ বর্ণ ও বংশ পরিচয় পরিবর্তন করিয়াও স্বীয় গোত্র-অপরিবর্ত্তিত রাখিল। জয়পুরের কছওয়া রাজপুতদের গোত্র হইতেছে 'মানব্য'। শ্রীযুত বৈদ্য বলেন, এই গোত্রের ঋষির নাম মনুতেও উল্লেখ নাই এবং পুরাণেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না (১২)।

বোধ হয় মনুর পুত্র, অতএব 'মানব' এবং এক মনু ক্ষত্রিয় ছিলেন, তজ্জন্য এই গোত্র এই বংশে ব্যবহার করিলে কার্য্যকরী হইবে—এইরূপ গোজামিল দেওয়া হইয়াছে। পুনরায়, রাঠোরদের গোত্র হইতেছে 'গৌতম'। বৈদ্য মহোদয় এই গোত্রও মনুতে খুঁজিয়া পান নাই (১৩) কিন্তু পুরাণে উক্ত নামের উল্লেখ আছে। এই সকল সংবাদ হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে রাজপুতদের গোত্র সকল সময় 'আর্যে্য়' নয়। রাজপুত জাতির বিবর্ত্তনের সময় নানাবিধ গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে এবং তৎকালীন অবস্থানুযায়ী কেহ-বা পুরাতন গোত্র রাখিয়াছেন, আবার কেহ-বা ব্রাহ্মণ্য গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

একণে কায়স্থদের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। তাহাদের সবই ব্রাহ্মণ্য গোত্র; কিন্তু কথিত হয় যে শূদ্রের গোত্র নাই; তাঁহারা পুরোহিতের গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের পৃথক গোত্র নাই। কিন্তু প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব গোত্র ছিল, ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং পুরাণেও বৈশ্যদের কুলের কথা আছে। কায়স্থদের এই ব্রাহ্মণ্য গোত্র কোথা হইতে আসিল তাহা নিয়া অনেক বিতর্ক আছে।

১১। N. N. Vasu—Social History of Kamarupa, Vol. III, P. 103। তিনি স্কন্দপুরাণের 'নাগরখণ্ড' এবং নাগর পুষ্পাঞ্জলী নামক পুস্তক হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

১২। Vaidya—Vol III P. 477

১৩। Vaidya—Vol. III. P. 477.

এই বিতর্কমূলক বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া ইহা বলিলেই এই-স্থলে যথেষ্ট হইবে, তাঁহাদের উৎপত্তি ও বর্ণ নিয়া অনেক বাদানুবাদ আছে এবং বাংলার কায়স্থদের উদ্ভব বিষয়ে কিছুদিন পূর্ব্বেও বিতর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। ডাঃ ভাণ্ডারকর তাহাদিগকে বাঙ্গলায় ঔপনিবেশিক প্রাচীন নাগর ব্রাহ্মণদের সহিত এক বলিয়া মনে করিতে চাহেন; কারণ, তাহাদের বংশগত পদবী, গোত্র ও প্রবর উক্ত ব্রাহ্মণদের সহিত মিলে (১৪)। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, গৌড়ীয় কায়স্থদের কতকগুলি গোত্র বিহারের অম্বষ্ঠ কায়স্থ ও বঙ্গের বৈদ্যদের সহিত মিলে (১৫)। বাঙ্গলায় বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে বিবাহও হইয়াছে এবং পূর্ব্ববঙ্গে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায়) এখনও এই দুইটি শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত রহিয়াছে। ৺দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "ধন্বন্তরী গোত্রের সেন ভূমির রাজা বিমল সেনের বহু পুত্রের মধ্যে কয়েকটি বৈদ্য এবং অবশিষ্ট কয়েকজন কায়স্থ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল (১৬); বৈদ্যজাতীয় মহাকুলীন কায়স্থ জাতীয় শোভাকর নাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।" (১৭)। নগেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, পাঁচটি নাম ও গোত্র ব্যতীত নাগর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের এই বিষয়ে সাধারণতঃ মিল নাই (১৮)। অন্যপক্ষে ডাঃ ভাণ্ডারকর বলেন, এই নামগুলি মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের অনেক ক্ষত্রিয়

১৪। Dr. Bhandarkar in Indian Antiquary, March 1932, Pp 45, 52

১৫। N. N. Vasu—Social History of Kamrupa, Vol. III, P. 161B.

১৬। এই পুথির বিষয় নগেন্দ্রবাবুও গৌড়ীয় কায়স্থদের বিষয়ে তাঁহার এক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। পূর্ব্বের উক্ত প্রকারের বিবাহ সম্বন্ধে "দীনেশ চন্দ্র সেন—বৃহৎ বঙ্গ" ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫১৭-৫১৮ দ্রষ্টব্য।

১৮। N. N. Vasn—Op. cit. p 162.

রাজবংশের পদবীর সহিত মিলে (১৯)। তিনি আরও বলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গলার কায়স্থ পদবীর অন্ততঃ চব্বিশটি খৃষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাহার মধ্যে অন্ততঃ দশটি পদবী খৃষ্টপূর্ব্ব, দ্বিতীয় শতাব্দীতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, এতদ্বারা বোধগম্য হয় যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় একই মূলজাতি (race) হইতে উৎপন্ন (২০)। এই বিষয়ে নগেনবাবু বলিয়াছেন, এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে কায়স্থগণ প্রথমে প্রাচীন ক্ষত্রিয় বর্ণেরই অন্তর্গত ছিল। তিনি আরও বলেন, এই পদবীগুলি উত্তর-পশ্চিমের গৌড় ব্রাহ্মণ, উদীচ্য ব্রাহ্মণ ও গৌড় রাজপুতদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে (২১)। কিন্তু বংশগত নাম বা পদবী লইয়া বর্ণ অথবা জাতির বিচার চলে না; কারণ বিহারের কায়স্থদের মধ্যে পাঁড়ে, তেওয়ারী, মিশ্র প্রভৃতি পদবীও আছে (২২)।

এই প্রকারের তথ্যাদি দ্বারা আমরা বিশেষ লাভবান হই না—কেবল এইটুকু মাত্র তথ্যই সংগৃহীত হয় যে পূর্ব্বে লোকে পদ বা বর্ণ অথবা জাতি (caste) পরিবর্ত্তন করিলেও তাহার গোত্র পরিবর্ত্তন করে নাই (২৩)। বর্ণা-

---

১৯-২০। Bhandarkar—Op cit. pp 63-65

২১। N. N Vasu—Op. cit. Pp. 175-176

২২। N. N. Vasu—Ethnology of the Kayasthas, p 51

২৩। মহাপণ্ডিত রাহুল সংকৃত্যায়নজী লেখককে বলিয়াছেন, গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত 'বাভন' জাতীয় লোকদের গোত্র ও প্রবরের সহিত ঐ স্থানের প্রাচীন লিচ্ছবীদের গোত্র ও প্রবরের মিল আছে; যদিও প্রথমোক্তেরা বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন এবং শেষোক্তেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয় ছিলেন। এই প্রকারে অনেক জাতি যে নাম ও পদ পরিবর্ত্তন করিয়াছে তাহার অনেক নজীর আছে। শ্রীযুত গুপ্তে 'চিৎপাবন' ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলিতেছেন, "Foreigners at first, Konkanasthas at the second stage and Poona Brahmans or Deccanese Brahmans of the present generation, they illustrate how caste denominations do undergo change." মহারাষ্ট্রীয় কায়স্থদের বিষয়েও এই প্রকারের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। Appendix to Duff's—'A History of the Mahrattas,' Vol. I. P. II

প্রমথধর্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্ত সম্রাটদের গোত্র ছিল—'ধরণা' বা 'ধরণি'। ইহা আর্যের নয় এবং তাহারাও ব্রাহ্মণ গোত্র গ্রহণ করে নাই। এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে 'গোত্র' হইল লোকের কুল-পরিচায়ক। দক্ষিণ-ভারতের দৃষ্টান্ত নিলে দেখা যায় যে মহীশূরের (২৪) অব্রাহ্মণ জাতিদের এগারটি গোত্রের মধ্যে প্রথম তিনটি ব্রাহ্মণ্য-গোত্র এবং বিভিন্ন অব্রাহ্মণ জাতিদের মধ্যে ইহার সংখ্যাও কম নয়। আবার "আগাসা" জাতির গোত্র হইতেছে "আরাসিনা" এবং "অরিসিনা" অর্থ হইতেছে "হরিদ্রা" (turmeric)। "আরাসিনা" গোত্র টটেম-জাত উৎপত্তির কথাই বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং এতদ্বারা অন্ততঃ মহীশূরের 'আগাসা" জাতিকে সম্পূর্ণভাবে দ্রাবিড়ীয় বলিয়া চিহ্নিত করে (২৫)।

পূর্ব্ব-ভারতের কতকগুলি তথাকথিত আদিম জাতিসমূহের বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে উহাদের মধ্যে টটেমবাদের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় (পশ্চিম-বঙ্গের বাউরীদের মধ্যেও ঐরূপ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়)। তাহারা কাশ্যবক (striped heron) এবং কুকুরকে আঘাত করে না (২৬)। রিসলী বলেন, কাশ্যবককে তাহারা তাহাদের জাতির প্রতীক স্বরূপ বলিয়া মনে করে। আবার খেরিয়াদের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "এই জাতির বিভিন্ন বিভাগগুলি (Septs) (২৭) টটেম-জাত (totemistic)। মানভূমের 'দলমা' পাহাড়ের খেরিয়াদের ভেড়া হইতেছে টটেম। আবার কোরা বা কেউরা বা খয়রাদের বেলায় তিনি বলিতেছেন, তাহারা মুণ্ডাদের ন্যায় বিশিষ্টভাবে টটেমিক বিভাগে বিভক্ত (২৮)। রিসলি বলেন, সাওতালদের টটেম হইতেছে—নীল গাই, বন্য হংস, বাজপক্ষী, মারিন্দা ঘাস, শঙ্খ, পান ইত্যাদি (২৯)। অন্যদিকে রেভারেণ্ড এনডেল কাছারীদের

২৪-২৫। Census of India, Vol. V. Mysore—Part I, Report, Pp 507, 512

২৬। B. N. Datta—Traces of Totemism in some tribes and castes of N.-E. India, "Man in India", Vol. 13, 1933.

২৭। Risley—The Tribes & Castes of Bengal, p 79

২৮-২৯। Risley—Op. Cit., Vol. I.

বিষয়ে বলিতেছেন, "১৭৯০ খৃঃ তাহাদের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বর্ণের হিন্দু বলিয়া মানিয়া নেন এবং তাহাদিগকে মহাভারতের ভীমের বংশোদ্ভব বলিয়া ঘোষণা করা হয়"। তিনি বলেন, "পূর্ব্বে তাহাদের কৌমপদ্ধতি টটেম্ জাত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাদের বিভিন্ন বিভাগের নাম হইতেছে—স্বর্গ, পৃথিবী, ব্যাঘ্র, মঙ্গল, তৃণ, পাট, বংশ, কাঠ-বিড়াল, বাদাম বৃক্ষ"। যোসা—অ' রই বা বাঘ-ল-অ' রই (ব্যাঘ্র লোকে) বিভাগ ব্যাঘ্রের সহিত সম্পর্ক দাবী করে। আর তাহারা সাজা বা সিজি (Eupharbia splendens) গাছ পূজা করে" (৩০)। লেখক অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে আসামের কাছাড়ীরা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে না, কিন্তু শ্রীহট্টের কাছাড়ীরা বৈষ্ণব এবং হিন্দু বলিয়াই পরিচয় প্রদান করে। লেখক পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকালে একদল তথাকথিত আদিম জাতীয় লোকের সাক্ষাৎলাভ করেন। ইহারা নিজদিগকে দেশওয়ালী মাঁঝি (বেহারী সাওতাল বা খেরওয়াল) বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহারা বাঙ্গলায় বাস করিতেছেন এবং রামায়ৎ সম্প্রদায়ের শিষ্য। ইঁহারা বলিলেন, ইহাদের গোত্র—সরভজ, হংস ঋষি, মাণ্ডিল্য, শুকপক্ষি। উক্ত তালিকার একটিও ব্রাহ্মণ্য-গোত্রের নহে, বরঞ্চ টটেম গোত্রগুলি রূপান্তরিত হইয়া এই নাম ধারণ করিয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে বর্ণাশ্রমের বাহিরের লোকেরা টটেম গোত্রীয় ছিল এবং এখনও আছে, আর যাহারা হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম-পদ্ধতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের কাহারও কাহারও অনার্য্য গোত্র এখন ধরা পড়ে। তবে অনেক অনার্য্যভাষী জাতি আর্য্যের গোত্র গ্রহণ করিতেছে, যথা—আসামের অহম জাতিদের ব্রাহ্মণ্য-গোত্র আছে (৩১)।

৩০। Sidney Endle—The Cacharis, Pp 6-35

৩১। B. N. Datta—"Anthropological Notes on some Assam Castes—Anthrop. Papers, New series, No V. p 12, 1938.

বাঙ্গালার তথাকথিত অন্ত্যজ জাতিদের গোত্র পরিবর্তন সম্পর্কে রিসলী বলেন, "যে সব জাতি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইতেছে তাহারা উচ্চ জাতিদের নিকট হইতে যেসব ব্রাহ্মণ্য গোত্র ধার করিয়া গ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে শাণ্ডিল্য একটি বৈদিক ঋষি হইতে পক্ষিতে পরিণত হইয়াছে" (৩২)। কলিকাতার কোন একস্থানের ডোম জাতীয় লোকেরা লেখককে বলিয়াছেন যে তাহাদের আর্ষেয় গোত্র আছে এবং ব্রাহ্মণও আছে। পুনশ্চ, উচ্চ জাতিসমূহের কোন কোন্ গোত্র দেখিলে উপরোক্ত সন্দেহ হয়। বাঙ্গালার বাঁকুড়া জেলার কোন ছত্রি (সামন্ত) তাহার গোত্র 'শাগ ঋষি' (শাক) বলিয়া লেখককে জানাইয়াছেন। বাঙ্গালার গোপ জাতির মধ্যে 'কর্কট' গোত্র আছে; বাঙ্গালার কলু জাতির কোন ভদ্রলোক তাহার জাতির গোত্রসমূহের মধ্যে 'লিকঙ্কিনী' নামে একটি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বাঙ্গালার কায়স্থ জাতির কোন বংশের গোত্র হইতেছে 'বাসুকী'। এইসব গোত্রের নাম আর্ষেয় নয়—বরঞ্চ টটেম-উদ্ভূত বলিয়া সন্দেহ হয়। যেসব ঋষি-গোত্রের নাম পুরাণসমূহে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঋষি গোত্রের মধ্যে কাম্বোজ (মৎস্য, ১৯৫—১৮); সৈরন্ধ্রী, জলন্ধর (বিষ্ণু, ১৯৯।১৫—১৮) প্রভৃতি নাম আছে। আর আছে সাহিত্যিক নাম—যথা, বিনয় লক্ষণ, মৃগয়, জ্ঞান সংজ্ঞেয় সৈরন্ধ্রী, রৌপসেবকি। একটি ঋষি গোত্রের নাম হইতেছে 'উষিজ', আবার 'ঔষিজ' নামটিও ব্রাহ্মণদের গোত্র প্রবরের মধ্যে পাওয়া যায়। পুরাণে এই উষিজকে বৃহস্পতি ঋষির ভ্রাতা এবং দীর্ঘতমার ক্ষেত্রজ পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (মৎস্য ৪।৩২—৮৮)। কিন্তু বেদে উষিজদে কক্ষিকন্তের মাতা (ঋক ১।১৮।১) বলা হইয়াছে এবং 'বৃহৎদেবতা'তে তাহাকে বলি রাজা কর্ত্তৃক দীর্ঘতমাকে প্রদত্ত একটি দাসী বলা হইয়াছে এবং এই উষিজেরই গর্ভে কক্ষিবন্তের জন্ম হয় বলিয়া ইনি ঔষিজ নাম প্রাপ্ত হন। কিন্তু পুরাণে আসল কাহিনীটি

৩২। Risley—Op. cit. p XIV.

সুকাইরা অবজন দাসীপুত্রকে ঋষি করা হইয়াছে এবং কক্ষিবন্তের একটি অনার্য্য শূদ্রা জননী সৃষ্টি করা হইয়াছে (৩৩)।

এতদ্বারা আমরা এই তথ্যও অবগত হই যে, প্রাচীন আদিম জাতীয়গণ যতই অন্ত্যজ হিন্দুতে বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্যবাদীয় আচার, রীতি-নীতি গ্রহণ করিতেছে ততই তাহারা হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরে উন্নীত হইতেছে। এই বিষয়ে বঙ্গপ্রদেশই বিশেষ অগ্রগামী; এইস্থানে ব্রাহ্মণ্যবাদ সকল স্তর দ্বারাই গৃহীত হইয়াছে! সেইজন্য ব্রাহ্মণ্যপ্রথা সকলেই গ্রহণ করিতেছে। তবে ইহাও শোনা যায় যে বাঙ্গালায় এমন অসৎ শূদ্রজাতি আছেন যাঁহাদের গোত্র নাই এবং ইহাও শোনা যায় যে হালে অনেক উচ্চস্তরের সৎ শূদ্রজাতি তাহাদের পুরোহিতদের গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই সকল অনুসন্ধান-কার্য্য হইতে আমরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হই যে আজ-কালকার শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ্যগোত্র-বিহীন নয়। এই স্থলে কথা উঠে—শূদ্র কাহাকে বলে? ইতিপূর্ব্বেই এই বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে শ্রেণী-সংগ্রামের দ্বারা অনেক উচ্চজাতি নিম্নস্তরে অবনমিত হইয়াছে এবং ইহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে। কাজেই আর্ষেয় গোত্র শূদ্রদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। নাগর ব্রাহ্মণদের ও শাকদ্বীপি (শকদ্বীপি?) বা মগলদ্বীপি ব্রাহ্মণদের অনেক গোত্র আর্ষেয় যাহা স্মৃতি ও পুরাণের সহিত মিলে না, যেমন,—বৎসপাল, গোপাল, কপিস্থল, সরকারসা, গৌরীশ্রবা, ছান্দোগ্য, শঙ্খান, বৈজবাপ (৩৪) (নাগর ব্রাহ্মণ); ঘৃতকৌশিক (শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ); অথচ এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যে,

---

৩৩। দীর্ঘতমার কাহিনীর বিষয়ে ঋগ্বেদ, শৌনক লিখিত 'বৃহৎ দেবতা' এবং **Vedic Index** দ্রষ্টব্য।

৩৪। **N. N. Vasu—The Social History of Kamrupa. vol III, Pp. 118-121.**

এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অভারতীয় ছিলেন (৩৫)। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে, "নাগরস্ত সমস্তস্ত দেশান্তর গতস্ত। দেশান্তর প্রজাতস্য অজ্ঞাত পিতৃবর্গস্য সামান্তং পদমিচ্ছতি" (২০।১৮।৩—৪), অর্থাৎ দেশান্তরগত, দেশান্তর প্রজাত অন্যত্র অজ্ঞাত পিতৃবর্গ ও সামান্ত পদেচ্ছু—এই সকল নাগর ব্রাহ্মণের পরিচয় জানিবার উপায় কি? পুরাণে কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব বাহ্লিক হইতে সূর্য্য মূর্ত্তি ও তাহার উপাসক ব্রাহ্মণদের ভারতে নিয়া আসে। পূর্ব্বে ইহাদের এইদেশে মগ (ব্রাহ্মণ) বলিত (Epigraphica Indica, Vol. XIV. No. 38, p 278—279) [পুরাণসমূহে শাকদ্বীপের (Scythia ?) মগ, সুমগ প্রভৃতি চারি প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে]। আল-বেরুণী যখন ভারতে আগমন করেন তখন তিনি ইহাদিগের নাম "মগ ব্রাহ্মণ" বলিয়া শুনিয়াছেন। গয়ার পাণ্ডাদের সহিত অন্য কোন ব্রাহ্মণদের বিবাহাদি চলে না; তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্মা তাঁহাদের সৃষ্টি করিয়া গয়াক্ষেত্রের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের বিভিন্ন পদবীর মধ্যে একটি হইতেছে "সেন"। ইঁহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহ হয়—কেহ কেহ ইঁহাদিগকে বৌদ্ধযুগের পরে সৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া অনুমান করেন।

খোদিত-লিপিতে ব্রাহ্মণের 'বাজী' ও 'অশ্ব' (EP. IND. vol X, 71, No. 15) এবং 'লৌহিত্য' (EP. vol III, NO 70) গোত্রসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অনার্য্যের মন-গড়া গোত্র-সমূহ কি টটেম-জাত বলিয়া সূচিত হয় না?

এই প্রকারে দেখা যায় যে গোত্র নিয়া বর্ত্তমানের একটা জাতির বর্ণ নিরূপিত করা যায় না। কিন্তু গোত্রগুলি প্রথম হইতেই বিভিন্ন বর্ণ হইতে গৃহীত। তাছাড়া যথেষ্ট সন্দেহ হয় যে অনেক গোত্র কল্পিত ও মন-গড়া! এইজন্য পৌরোহিততন্ত্রের দাবীর কোন মূল্য নাই। প্রথমেই দেখা গেল যে

৩৫। Dr. Guha-এর মতে বাঙ্গালী কায়স্থ, নাগর ব্রাহ্মণ ও গুজরাটী বেনিয়া এবং মধ্য-এশিয়ার তাজিকদের Co-efficient of Racial Likeness এক—Census 1930—Ethnological Report দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মার মানস-পুত্রদের তালিকা ঠিক নাই, তৎপর উহা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সংযুক্ত-তালিকা। তৎপর দেখা যায় যে বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের লোকও ছিলেন এবং কোন কোন ঋষি শূদ্রানী অথবা দাসী-গর্ভজাত এবং একটি ঋষি পুরাণের মতে শূদ্রত্ব পদপ্রাপ্ত। মৎস্যপুরাণ বলিতেছে, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশীয় এই দ্বিনবতি সংখ্যক ঋষিপুত্র বিবিধ মন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা ঋষিগণের সন্তান শ্রুত ঋষি পদবাচ্য" (১৪৫।১১৫—১১৮)। স্বভাবতঃই, ইহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ইঁহাদের বংশগত গোত্র ছিল, আর সেই গোত্র তাঁহাদের সন্ততিগণ পরে বহন করে!

বেদের সূক্তকার ঋষিদের মধ্যে যখন কতিপয় বৈশ্যও ছিলেন তখন তাহারাও অন্যান্য বর্ণের ঋষিদের ন্যায় গোত্র প্রবর্ত্তক ছিলেন। কিন্তু পরে বৈশ্য শূদ্রত্বে অবনমিত হইল এবং ব্রাহ্মণ্য-বিধান এই মর্ম্মে জাহির হইল যে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত বর্ণ নাই। কাজেই বৈশ্য যখন শূদ্র বলিয়া গৃহীত হইল তখন তাহার গোত্র আসিবে কি প্রকারে? এইজন্য তাহার গোত্র তাহার পুরোহিত-প্রদত্ত—এই মত জাহির করা হইল! আবার বিজ্ঞানেশ্বর বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের গোত্র নাই! ইহার অর্থ, হিন্দুর অধঃপতনের যুগে ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামক অপর দুইটি দ্বিজ জাতি নাই, শূদ্র ত শোক তাপ করিতেই জন্মিয়াছে। বৈদিক কৃষ্টির একমাত্র প্রতীক ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র সৎজাতিগুলি বহন করিবে। এই প্রকারে অন্যান্য বর্ণের পৃথক সত্ত্বা ব্রাহ্মণেরা উড়াইয়া দিলেন। এইরূপে পৌরোহিত্যতন্ত্র সমগ্র হিন্দু-ভারতকে নিজেদের শোষণ-নীতির কবলে আনয়ন করিল।

কিন্তু গোত্রের যদি যথার্থ জাতিতাত্ত্বিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে হিন্দু পদ্ধতি অনুযায়ী একটি বংশ বা কুল (clan) প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন 'গোত্র প্রবর্ত্তক' এবং এই কুল হইতে অন্যান্য শাখা-প্রতিষ্ঠাতাদের বিভিন্ন গোত্র (কুল) সংস্থাপক বলা হয় এবং হিন্দু পদ্ধতি

অনুযায়ী তাহাদিগকে প্রবর বলা হয়। জাতিতত্ত্ব বলে, একই বংশ হইতে উদ্ভুত বিভিন্ন কুলগুলি সম্মিলিত হইয়া একটি জন বা কৌম (tribe) গঠন করে। এই কৌমটি এক বংশোদ্ভব বলিয়া নিজেদের মধ্যে বিবাহ না করিয়া অন্য কৌমের সহিত বিবাহাদি (exogamy) করে। পুরাণে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এক গোত্র ও প্রবরের লোকসমূহের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ [মৎস্য-ভৃগুদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (১৯৫-৩৬); আঙ্গিরস গোত্রীয়দের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বিধান নাই (১৬৯।১-২০) ইত্যাদি]। ইহার অর্থ, সগোত্র বিবাহ (endogamy) নিষিদ্ধ। পুরাণোক্ত এই সংবাদটি অন্য-দেশীয় এইপ্রকারের জাতিতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলের সহিত মিলে। কিন্তু কথা ওঠে, বর্ণ-বিভাগ সম্পর্কে। উপরে আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বংশ-সমুদ্ভূত। তাঁহারা সকলেই গোত্র-প্রবর্ত্তক। আবার পুরাণ বলিতেছে, পুরু বংশে (ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী) ভরদ্বাজ, বিতথ নামে সেই কুলে উৎপন্ন হইলেন......সেই বিতথ...কৌশিক ও গৃৎসপতি নামে আরও দুই পুত্র উৎপাদন করেন, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ...গৃৎসপতির তনয়গণ (অগ্নি, ২৭৮।৯-১২)। এই উক্তি দ্বারা উক্ত তিন বর্ণের লোকদের উৎপত্তি যে এক তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে বৈশ্যবর্ণোদ্ভব বর্ত্তমানকালের ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবী জাতিসমূহের গোত্র যে আর্যেয় হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। উপরে ইহাও দেখা গিয়াছে, লোকে পদ, বর্ণ বা জাতি পরিবর্ত্তন করিলেও স্বীয় 'গোত্র'-পরিবর্ত্তন করে নাই। এমন কি, 'টটেম'-গোত্রগুলি স্বরূপে অথবা বিকৃতরূপে অনেক জাতির মধ্যে এখনও চলিতেছে। নগেনবাবুর উক্তি—'নাগর পুষ্পাঞ্জলী' এবং 'নাগরোৎপত্তি' পুস্তক দুইটির মতে যেসব নাগর ব্রাহ্মণ ব্যবসায়-বৃত্তি গ্রহণ করে তাহারা 'নাগর বেনিয়া' নামে অভিহিত হয় (এই বিষয়ে ডাঃ গুহের নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্রষ্টব্য)। তাঁহার (নগেনবাবু) মতে, এই প্রকারে সপাদলক্ষ, অহিচ্ছত্র বা নাগর ব্রাহ্মণেরা বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বেনিয়া জাতিদের মধ্যে বৃত্তি

অনুযায়ী প্রবেশ করিয়াছে (৭৬)। তাঁহার মতে "এইজন্যই বাঙ্গলার কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, শঙ্খবণিক, কংসবণিক জাতিদের মধ্যে নাগর ব্রাহ্মণোচিত পদবী ও গোত্র প্রাপ্ত হওয়ায় অনুমিত হয় যে গুজরাটের ন্যায় তাহাদের মধ্যেও কিঞ্চিৎ নাগর ব্রাহ্মণের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে (৭৭)।"

এই যুক্তি ঠিক হইলে আবার দেখা যায় যে, বর্ণ বা জাতি পরিবর্ত্তন করিলে লোক গোত্র পরিবর্ত্তন করে না। তবে বৈদিক যুগ হইতে দেখা যাইতেছে যে দত্তকপুত্র গ্রহণকালে (শুনঃশেপ, গৃৎসমদের দৃষ্টান্ত) লোকের গোত্র পরিবর্ত্তিত হয়। কাজেই বর্ত্তমানের শূদ্র নামে অভিহিত জাতিসকল যে আর্য্যেয় গোত্র ধারণ করিতেছেন তাহা প্রাচীনকালে দ্বিজবর্ণগণের ও তাহাদের এক উৎপত্তি বলিয়াই সম্ভবপর হইয়াছে এবং প্রাচীন বিভিন্ন বর্ণের লোক বর্ত্তমানের নানা জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই এই সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ধরিতে হইবে।

ব্রাহ্মণ গোত্র শূদ্রের ভিতর কি প্রকারে আসিয়াছে তাহা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় ৬৫০ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ত্রিপুরা জেলায় লোকনাথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে যে সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তৎকালীন সমাজের উপর আলোকসম্পাত করে।

লোকনাথের প্রপিতামহ ভরদ্বাজ ঋষির সন্তান বলিয়া দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মাতার প্রপিতামহ ও পিতামহদের "দ্বিজবরা, দ্বিজসত্তমা" বলা হইয়াছে (Verse 6)। কিন্তু লোকনাথের পিতা "পারশব" অর্থাৎ তিনি অনুলোম বিবাহ-জাত নিকৃষ্ট শূদ্রে অবনমিত হইলেন। আর ভরদ্বাজ ঋষির বংশধর লোকনাথ স্বয়ং 'করণ' (Verse 9) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে, লোকনাথের মাতামহ "পারশব"-শ্রেণীতে অবনমিত হইয়া কি

৭৬-৭৭। N. N. Vasu—Op. cit., Vol. III, P 137-138.

পৈতৃক গোত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন? লোকনাথ কায়স্থ শ্রেণীর হইয়া কি পৈতৃক ঋষি গোত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন? (৩৮)

বর্ত্তমানের একটা জাতি (caste) পাঁচ ফুলের সাজির ন্যায়; প্রাচীন বিভিন্ন বর্ণের লোক এক পেশা অবলম্বন করিয়া বিবর্ত্তনের ধারায় একটি 'গিল্ড' গঠন করে এবং কালে তাহা বর্ত্তমান যুগে caste-এ (জাতি) পরিণত হইয়াছে। এই জন্য প্রাচীন বর্ণসমূহ হইতে বিভিন্ন গোত্রীয় লোকসমূহের বংশধরদিগকে বর্ত্তমানের এই সকল জাতি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এক-একটা জাতি এক-একটা পৃথক মূলজাতীয় (racial element বা biotype) বা জাতিতাত্ত্বিক সমষ্টি (ethnic unit) নয়; কাজে কাজেই, আজ তথাকথিত উচ্চ জাতিদের মধ্যে (ব্রিটিশ শাসকবর্গ কর্ত্তৃক কথিত 'Caste Hindus') সমগোত্র পাওয়া অসম্ভবও নয় এবং আশ্চর্য্যও নয়।

শারীরিক নরতত্ত্ব বা জাতিতত্ত্বের চাবি দিয়া অনুসন্ধান করিলে এই তথ্য সুস্পষ্ট হইবে এবং সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া অনুসন্ধান করিলে এই সত্যই প্রকাশ পাইবে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণসমূহের অথবা শূদ্রদের গোত্র নাই —এই দাবী পুরোহিততন্ত্রের নিছক ধাপ্পাবাজী মাত্র। এই গোত্র সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ এতদ্বারা ভারতীয় জাতিতত্ত্বের উপর নূতন আলোকসম্পাত করিবে। অনেক তথাকথিত শূদ্রের এখনও গোত্র নাই বলিয়া কথিত হয় এবং অনেক 'নূতন-হিন্দু' জাতি যে আর্য্যেয় গোত্র গ্রহণ করিয়াছে সেই তথ্যও উপরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কোন অনুসন্ধানকারী পরিব্রাজক লেখককে বলিয়াছেন যে, পঞ্জাবের অশিক্ষিত হিন্দু-জাঠদের গোত্র নাই। তাহারা কৌমের নামেই পরিচিত হয়। গোঁড়া হিন্দুরা ইঁহাদের হাতে জল খায় না। শিক্ষিত জাঠেরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নিজেদের গোত্র তৈয়ারী করিতেছেন!

৩৮। Tipperah Copper-plate Grant of Lokenath in Epigraphica Indica, Vol. 15, Pp. 303—306.

এই তথ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের একটা বড় অনুষ্ঠান বিজড়িত রহিয়াছে—তাহা হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের conversion policy, অর্থাৎ অন্য জাতির বা ধর্ম্মের লোকদের স্বীয় সমাজ-শরীরে গ্রহণ করিবার নীতি ।

হিন্দুর পারিবারিক জীবনে গোত্রের সহিত অন্যান্য কতকগুলি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (institution) বিজড়িত আছে। এইগুলি হইতেছে, সপিণ্ড, সকুল্য, সমানোদক, সগোত্র এবং সমান প্রবর। যাহাদের মধ্যে এইগুলি এক (common) তাহারা উক্ত সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। এই বিষয়ে পরলোকগত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী (৩৯) মহাশয় বলিয়াছেন,—'গোত্র' শব্দটি 'গো' এবং 'ত্র' (রক্ষা করা) শব্দের যোগে সৃষ্ট। ইহার অর্থ, যাহা গরুকে রক্ষা করে, অর্থাৎ গোচর ভূমি (Pasturage), 'উদক' অর্থে জল কিম্বা জলাশয়—যেমন, পুষ্করিণী বা কূপ বুঝায়। 'কুল্য' শব্দের মূল 'কুল' (ল্যাটিন্ Colo) হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। ইহার অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা; এতদ্বারা চাষের জমি বুঝায়; আর 'পিণ্ড' শব্দের অর্থ হইতেছে 'খাদ্য'।

মনু (৮।২৩৭—২৩৯) এবং যাজ্ঞবল্ক্য (২।১৬৬—১৬৭) গ্রাম পত্তন বিষয়ে যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে গ্রামের যেস্থলে বসত-বাটীগুলি অবস্থিত তাহার পার্শ্বদেশে কৃষি-জমি বাদ দিয়া এক টুকরা জমি (৪০০ কিউবিট দীর্ঘ) গোচারণের জন্য আলাদা করা থাকিবে। এই বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া নেওয়া যায় যে একটি গোষ্ঠী দ্বারা একটি নূতন গ্রাম স্থাপন করা হইত এবং ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোচারণ-ভূমি ও জলাশয় অবশ্যপ্রয়োজনীয়, আর হিন্দু আইনে উহার ভাগ করা যাইত না, তাহা হইলে 'সগোত্র'

৩৯। Golap Chandra Sarkar Sastry—A Treatise on Hindu Law, 5th Edn, 1924. p. 107-108

ও 'সমানোদক' (৪০) শব্দ দুইটির এই অর্থ করিতে পারা যায়—একটি গোষ্ঠীর সকল লোক-সমষ্টি—যাহারা গোচারণ-ভূমি এবং জলাশয়গুলি সাংসারিক ও কৃষিকর্ম্মের জন্য সাধারণভাবে অথবা যৌথভাবে (holding in common) ব্যবহার করিত। 'সকুল্য' অর্থে যাহারা যৌথভাবে জমি চাষ করে এবং 'সপিণ্ড' অর্থে যাহারা একত্রে সংসার (common mess) করে। যখন গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তখন সর্ব্বপ্রথম পৃথক সংসার স্থাপিত হইবে; কিন্তু বিষয় বা কুল্য যাহা বেশীর ভাগ জমিতে আবদ্ধ তাহা তখনও যৌথভাবে চাষ চলিবে এবং উৎপন্ন-শস্য বখরা অনুযায়ী বন্টন হইবে। ইহাও অসুবিধাজনক বিবেচিত হইলে লোকে গোষ্ঠীর জমি বিভক্ত করিবে, যদিচ 'গোত্র' অর্থাৎ গোচারণের 'জমি' এবং 'উদক', অর্থাৎ জলাশয়গুলি এক বংশজাত দূরসম্পর্কীয় (distant agnate relations) জ্ঞাতিদের মধ্যেও যৌথ থাকিবে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, বৌধায়ন (৪১) এবং ব্রহ্ম-পুরাণের 'অবিভক্ত ধনান্বেতে সপিণ্ডাঃ পরিকীর্ত্তিতা' (৪২) শ্লোকগুলি দ্বারা এই অর্থই আন্দাজ করা যায়।

উপরোক্ত এই ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রীজি বলিতেছেন যে, ইহা দ্বারা village community system-র (গ্রাম্য সমাজ-পদ্ধতি) (৪৩) সহিত ইহাদের সম্ভবতঃ সম্পর্ক বাহির করা যাইতে পারে (৪৪)। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে বেডেন-পাউএল এবং তৎপরবর্ত্তী অনুসন্ধানকারিগণ বলেন যে

৪০। "সপিণ্ডতা সমানোদক ভাবস্তু...ততপরং গোত্রমুচ্যতে" (the word 'Gotra' is declared to comprise these (i. e. Sapindas and Samanodakas)—Vrihat Manu cited in the Mitakshara, 2, 5, 6 quoted by Shastri, P. 65.

৪১। "অবিভক্ত দায়াদান্ সপিণ্ডান্...বিভক্ত দায়াদান্ সকুল্যান্ আচক্ষতে" —দায়ভাগধৃত বৌধায়ন বচনম্ Quoted by Sastri. P. 65.

৪২। Quoted by Sastri—Op. cit. p.73.

৪৩। দক্ষিণ-ভারতে, গ্রাম্য-কমিটি যাহাকে "সভা" বা 'মহাসভা' বলা হইত তাহাই ছিল। এই সভা মাত্র স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন পরিচালনা করিত। —South-Indian Inscriptions vol, III. Pt. I. p2.

৪৪। Sastri—Op. cit. P. 107.

ভারতে প্রাচীন জমি-বিলি পদ্ধতি ছিল "রায়তারী প্রথা" অনুযায়ী। অশোকের সময় হইতে বিজয়নগর রাজত্বের শেষকাল পর্য্যন্ত শিলা ও তাম্রলিপি-সমূহে জমিবিলি-ব্যবস্থা বিষয়ে অন্য প্রকারের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জমি রাজারই ছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার অর্থ, একটি গোষ্ঠী প্রথমে, একটি গ্রাম স্থাপন করিত এবং সেই গ্রামটি সেই বংশেরই সম্পত্তি হইত। উপরোক্ত লেখক—হিন্দুর প্রথমাবস্থায় যৌথভাবে গ্রাম্য সমাজ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ছিল—মেইনের এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে জমিতে ব্যক্তিগত অধিকারই ছিল, tribal communism (কৌমগত কম্যুনিজম্) প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুতঃ মরগান বর্ণিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না বরং কৃষকের পৃথগীকৃত চাষ-ভূমির কথাই পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ ১।১১০।৫২)। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় যে, যদি এক গোষ্ঠী (গোত্র) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একটা বড় কুল (clan) হয়, তাহা হইলে কৃষিকর্ম্ম বিষয়ে 'সমানোদক' (একটি লোকের তের পুরুষ অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে তের পুরুষ ব্যবধান-রূপ সম্পর্ক) সম্পর্কে clan communism-এর চিহ্ন ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। রোমের সভ্যতার প্রথমাবস্থাতে (৭৫) একটি কুল নিজের জমিতে চাষ করিয়া উৎপন্ন শস্য কুলের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিত। ভারতীয় আর্য্যদের অতি প্রাচীনকালে হয়ত সেই প্রকার কুলগত যৌথ চাষের প্রথা ছিল। কিন্তু 'সকুল্য' ও 'সপিণ্ড' ব্যাপারে family communism-এর চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই অনুমিত হয়। পৈতৃক দায় সম্বন্ধে মিতাক্ষরা আইনও family communism-এর লক্ষণ প্রকাশ করে, আর যৌথ-পরিবার সম্বন্ধে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে গোষ্ঠীগত কম্যুনিজমের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দুর সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে। এইগুলির গুণগত কর্ম্ম (function) আর নাই, আছে শুধু কাঠামোটির ভগ্নাবশেষ। এই ব্যাপারে বিস্মৃত জাতিতাত্ত্বিকঅনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থশূন্য অবস্থায় ধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া হিন্দুকে আজ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

৭৫। Mommsen; History of Rome, P, 92.

৮। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আক্রমণশীলতা

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল এই যে বেদ-প্রসূত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম অন্য মূলজাতীয় (race) লোককে স্বীয় পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ইহা জারতুষ্টিয়, ইহুদী ধর্ম্মের ন্যায় খাঁটি জাতীয় ধর্ম্ম, অর্থাৎ একটা মূলজাতির কৌমগত ধর্ম্ম। এক্ষণে উপরোক্ত দুই ধর্ম্মের ন্যায় অনুসন্ধানের দ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম, আক্রমণশীল (aggressive) ধর্ম্ম; অপরকে স্বীয় ধর্ম্ম ও সমাজশরীরের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করে। সত্য বটে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বৈদিক আর্য্য-ভাষীদের কৌমগত ধর্ম্ম। কিন্তু বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ধর্ম্মের আবরণের মধ্য হইতে এই তথ্য বাহির করা যায় যে পুরাকাল হইতেই ব্রাহ্মণেরা বিজাতীয়দের স্বীয় ধর্ম্ম ও সমাজশরীরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছিল। তাহা না হইলে দ্রাবিড় ও 'ইণ্ডো-টিবেটান'-ভাষী লোকেরা কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মান্তর্গত হয়?

অজ্ঞানতা-তিমির যত দূরীভূত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম চিরকালই ভিন্নজাতীয় লোককে হজম করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংঘ (organization) নাই, প্রচারপদ্ধতি নাই, তথাপি দিনের পর দিন অহিন্দু "হিন্দু" হইতেছে। প্রাচীনকালে যাঁহারা দক্ষিণে গিয়া তথাকার লোকদের "হিন্দু" করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্ম-রাক্ষস' বলা হইত। পুলস্ত, পুলোহ, পুলোমার এবং বিশ্বামিত্রের ৪৯ বংশধরগণ এই প্রকারের ব্রহ্ম-রাক্ষস হন। আর যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারকের কাজ করিতেছেন তাঁহাদের কি বলা হয়—তাঁহাদের কি পতিত বা 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' বলা হয়?

যাঁহারা বাঙ্গলার পশ্চিমপ্রান্তে, পূর্ব্বপ্রান্তে এবং মধ্য-ভারতের উপত্যকায়, দক্ষিণে, হিমালয় অঞ্চলে হিন্দুমিশনারীদের নীরব কর্ম্ম অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে তথাকথিত আদিম অধিবাসিগণ কি প্রকারে হিন্দু হইয়া উঠিতেছেন! ইহা দেখিয়া বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় Rev. Archer তাঁহার পুস্তকে তারস্বরে চেঁচাইয়া বলিয়াছিলেন, যেসব ধর্ম্ম ভারতের লোকদের ধর্ম্মান্তরিত (convert) করিতেছে তাহাদের পারস্পরিক সংখ্যার অনুপাতে

(ratio) হিন্দুর সংখ্যাই অধিক হইয়া পড়িতেছে—অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দু ধর্ম্মই ধর্ম্মান্তরিতের সংখ্যা অধিক পাইতেছে। যতদুর জানা যায় তাহাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও 'সন্ত' সম্প্রদায়ই এই ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

এই কার্য্যের পিছনে কোন সংঘবদ্ধ দল নাই, আছে শুধু একদলের' অর্থ-নীতিক তাড়না আর একদলের "নাম প্রচার দ্বারা জীবকে মুক্তি প্রদান করা" রূপ প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম স্মৃতি ও ব্যবস্থামূলক পুস্তকে যে সব কৌমদের অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তাহাদেরই মধ্যে গিয়া সেই সকল লোকদের পৌরহিত্য করিতেছে। কালক্রমে তাঁহাদের অহিন্দু আচার ত্যাগ করাইতেছেন, তাহাদিগের হিন্দু নাম প্রদান করিতেছেন ; তাঁহারাও হিন্দু অনুষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করিতেছেন। আর যে কৌম বা জন যত অধিক ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, তাঁহারা ততই উচ্চ-জাতীয় হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে, একদল সাঁওতাল অথবা ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্যজাতীয় কৃষক বাস করিয়া 'বুনো' জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা নিজেদের 'বাঙ্গালী' বলেন এবং লেখককে খুবই হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছেন যে তাঁহারা একজন ব্রাহ্মণও প্রাপ্ত হইয়াছেন। যশোহরের অঞ্চলেও একদল এক প্রকারের 'বুনো' জাতি আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ পাইয়াছেন। ইহারা নিজদিগকে কুর্ম্মী জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। যদি গৌড়ীয় অথবা অন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব এই প্রকার জাতির মধ্যে যান তাহা হইলে তাঁহারা ইঁহাদের গলায় মালা পরাইয়া দেন, মাথায় শিখা রাখিয়া দেওয়ান, এবং বরাহ প্রভৃতি জন্তুর মাংস ভক্ষণে নিষেধ করেন। এই প্রকার পশ্চিম-বঙ্গের সাঁওতালেরা "মাঝি" জাতিতে অভিব্যক্ত হইতেছেন। হুগলী ও হাওড়া জেলায় এই প্রকারে 'বুনো-বাগদী' জাতি উদ্ভূত হইতেছে। ছোটনাগপুরের শিক্ষিত ও ধনী বংশীয় হো (কোল) জাতীয় লোকেরা নিজ-দিগকে হিন্দু নামে অভিহিত না করিয়া ব্রাহ্মণ্য আচারাদি শনৈঃ শনৈঃ গ্রহণ করিতেছেন। সিংহভূমের এই প্রকারের একজন শিক্ষিত ও জমিদারের (মানকী)

পুত্রে লেখককে বলিয়াছেন যে তাঁহার শ্রেণীর মধ্যে সকলেই শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি ব্যাপারে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন। তবে তাঁহারা আদম-শুমারীতে কেন হিন্দু বলিয়া নিজদিগকে লেখান না—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে ইহাতে রাজনীতিক প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। আবার ইহাদের মধ্যে কালী-পূজা প্রভৃতিও প্রচলিত হইয়াছে। বাঁকুড়ার কোনও এক সাঁওতাল লেখককে সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে মানভূমের কোন ব্রাহ্মণ নারায়ণ শিলা লইয়া তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন। এই প্রকারে ক্রমশঃ বৈদিক ঋষিগণের ঘৃণার পাত্র বঙ্গ বগধ 'চের' জনপদের লোকদের শেষাংশও বেদ-প্রসূত একটা-না-একটা আর্য্যধর্ম্মের কুক্ষিগত হইতেছে!

এইরূপে দেখা যায় যে, আদিম অধিবাসীজাত মুণ্ডা বাঁকুড়া জেলায় 'মুদী' জাতি, খেড়িয়া, কোড়া বা খয়রা; বৈদিক 'বগধ' এখন 'বগ্রক্ষত্রিয়' ও কুশমেটে অধুনা 'কুশক্ষত্রিয়',-বৈদিক পুণ্ড্র (?) ও মধ্যযুগের পুঁড়ো অথবা পোদ এক্ষণে 'পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়', কাম্বোজ নামে আখ্যাত বা পাহাড়ী কোচ এখন 'ক্ষত্রিয়', তদনুরূপ খ্যান এখন 'সেন' ও কায়স্থ, আদিম জাতীয় ওঁরাও এখন 'ওরাং ক্ষত্রিয়', তদ্রূপ লায়েক এখন হয় কায়স্থ, না-হয় 'ক্ষত্রিয়'; স্থানভেদে ভূমিজ বা ভূঁইয়া বা মুসাহার নামধারী লোকেরা এখন স্থানে স্থানে ক্ষত্রিয় অথবা রাজপুত, ভূঁইয়া এখন সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহাকে কুশহস্তে মন্ত্রপাঠ করিবার সময় কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের একান্ত প্রয়োজন। (১) এই প্রকারেই টটেম-গোত্রীয় 'গো-বংশীয়' ও 'নাগ-বংশীয়' লোকেরা ক্ষত্রিয় হইয়াছেন এবং শেষোক্তেরা বিষ্ণুপুরাণোক্ত 'নব-নাগ' রাজবংশের সহিত রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। আবার পালামৌ-এর 'চেরো' জাতি এখন উপবীত গ্রহণকারী রাজপুত হইয়াছেন (২)। এই প্রকারেই নেপালের গুরুং, নায়ার প্রভৃতি জাতিগুলি এবং হিমালয় পর্ব্বতস্থিত অপরাপর পার্ব্বত্য জাতিসমূহ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মী হইয়াছেন।

কথিত আছে, নূতন কোন জাতিকে স্বীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিলে ইসলাম তাহার পূর্ব্ব সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সমূলে উৎপাটিত করে। খৃষ্টধর্ম্ম

১। সাঁওতাল পরগণার কোন এক জায়গার এই প্রকার এক ঘাটওয়ালের (জমিদার) স্থাপিত কালী মন্দিরের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত লেখককে এই কথাই বলিয়াছেন।

২। Risley—Tribes and Castes of Bengal.

গুলির সহিত একটা রফা করে এবং হিন্দুধর্ম্ম সেই গুলিকে সশরীরে স্বীয় দেহে স্থান দেয়। কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের মত এই যে, কোন ধর্ম্মই প্রাচীন সংস্কারাদিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, সেইগুলি স্বীয় আবরণের বৈশিষ্ট্য দ্বারা ঢাকিয়া রাখে মাত্র।

বৌদ্ধ পুস্তকসমূহ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—বিভিন্ন কৌমকে স্বীয় দলভুক্ত করিবার জন্য মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধবিধান গ্রহণকারী জাতির কৌমগত ধর্ম্মকে (tribal religion) 'লৌকিক-ধর্ম্ম' রূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় কুক্ষিগত করে। এই প্রকারে আদিম জাতীয় চড়কপূজা (৩), গ্রাম্য দেবদেবী পূজা মহাযান ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মকে বিতাড়িত করিয়া অথবা যেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করে নাই সেখানে গিয়া কৌমগত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে

৩। চড়কপূজা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের "আদ্যের গম্ভীরা" দ্রষ্টব্য। তিনি উক্ত পূজাকে একটি প্রাচীন উৎসব বলেন। শ্রীযুক্ত চিন্তা-হরণ চক্রবর্ত্তী—The Cult of Katarkarudra (Cadakpuja) in Journal of the Asiatic Society in Bengal, Vol. 1, 1935 No 3 দ্রষ্টব্য। তিনি বলেন, বাংলার গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন স্মৃতিকারদ্বয় এই পূজার কোন উল্লেখ করেন নাই; হয়ত ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্য-পূর্ব্ব পূজা-পদ্ধতি ও আচার চড়ক পূজার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব হালেই ইহার মধ্যে আসিয়াছে। শ্রীযুত ক্ষিতি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (J. A. S. B. Vol. 1, 1935, No 3) বলেন, শ্যাম (থাই) দেশের Swinging Festival-এর সহিত চড়ক পূজার সাদৃশ্য আছে এবং উহার উৎপত্তিও এক। অন্যপক্ষে ফণীন্দ্রনাথ বসু বলেন, শ্যামের "লেহি খিংচা" উৎসব (Swing Festival) কাহারও মতে ভারতীয় "হোলী উৎসবপ্রসূত, আবার কাহারও মতে ভারতীয় বসন্তোৎসবের রূপান্তর" (The Indian colony of Siam, Appendix 1)।

ক্রমশঃ হটাইয়া দিয়া ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠানসমূহ কায়েম করে। এই জন্য তথাকথিত অন্ত্যজ জাতিদের টটেম গোত্র পাওয়া যায় না, সেইগুলি ব্রাহ্মণ্য নামের আবরণে ঢাকা রাখা হইয়াছে (হংস ঋষি, শাণ্ডিল্য পক্ষী)। টটেমগুলির উদ্দেশ্য এই সকল লোক ভুলিয়াছেন যদ্যপি তৎপ্রসূত 'তাবু' এখনও বলবৎ আছে। অবশ্য বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে দুই চারিটি টটেমগত নাম এখনও প্রচলিত আছে যদিও লোকে উহার তাৎপর্য্যার্থ ভুলিয়া গিয়াছে [শুকপক্ষী, তেতুল নন্দন (তেঁতুলে বাগদীর গোত্র), হরিদ্রা গোত্র, গোবংশীয়, নাগবংশীয় প্রভৃতি], অতঃপর ব্রাহ্মণ্য আচার শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অসৎ-শূদ্রে উন্নীত করা হয়। তখন তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও তাহাদের গোত্র-প্রবর (কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়) প্রাপ্ত হয়, পরে তাহাদের ক্ষমতানুযায়ী আরও উন্নত হইয়া একটা উচ্চবর্ণে প্রবেশ করে।

হিন্দুর রাজশক্তির অভাবে এবং দেশে Pax Britannica থাকার দরুণ পূর্ব্বের ন্যায় এত দ্রুত পরিবর্তন আর হইতেছে না। ছোটনাগপুরের ও অন্যান্য স্থানের নূতন হিন্দুগণ আর অস্ত্র হস্তে রাজ্যস্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন না; তাহাদের হিন্দুত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সাংসারিক আচারে আবদ্ধ থাকিতেছে এবং বর্ত্তমানের রাজনীতিক কারণবশতঃ অনেক কৌম তাহাদের কৌমপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় স্বীয় নূতন অনুগামীদের (convert) ব্রাহ্মণ্য জনশ্রুতি ও ইতিহাস ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। এই জন্যই নূতন হিন্দুরা পুরাণসমূহ হইতে নিজেদের বংশ পরিচয় বাহির করেন এবং প্রাচীন আর্য্যদের জনশ্রুতিসমূহ নিজেদের বলিয়া বিশ্বাস করেন (৪)। কিন্তু ইহার ফল কি

৪। পোদজাতীয় জনৈক ভদ্রলোক ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া লেখককে বলেন—"তাহা হইলে আমরা King Porus এবং relatives!'

হইতেছে? দেখা যায়, হিন্দুর অচলায়তন সমাজ-পদ্ধতি তাহাদের উপর চাপিয়া তাহাদিগকে স্থাণুবৎ নিশ্চেষ্ট করে। নূতন হিন্দু জানে, যে জাতিতে সে জন্মিয়াছে, যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহার আছে তাহা হইতে বাহির হওয়া অধর্ম্ম। সে নিজের অবস্থাকে সনাতন ও শাশ্বত বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। এইজন্যই তথাকথিত পতিত, অস্পৃশ্য বা অন্ত্যজ জাতিগুলি নির্ব্বাক হইয়া নিজদিগের ব্যবহারিক দুঃখ সহ্য করে। সে জানে যে হিন্দু হইলেই এই সব সহ্য করিতে হইবে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে তাহার মনে কোন দ্বন্দ্বভাব (anti-thesis) উদয় হয় না। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট ক্রমাগত প্রাক্তন, কর্ম্মফল, পুনর্জন্ম, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতির মাহাত্ম্য অতীব দুর্ব্বোধ্য ভাষায় তাহাকে বলিতেছেন! অবশ্য যেখানে হালের ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করিতেছে সেখানে বিদ্রোহ ধূমায়মান হইয়া উঠিতেছে।

৯। নব হিন্দুর মর্য্যাদা

এক্ষণে দেখা যায় যে সর্ব্ব প্রকারের হিন্দুদের এখনও বর্ণাশ্রম মধ্যে আনা হয় নাই। যাহারা বর্ণাশ্রম মধ্যে নাই তাহাদেরই বোধ হয় অন্ত্যজ বলা হয়। কিন্তু যাঁহারা ইহার মধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা কি পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন? নরতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা তথাকথিত অন্ত্যজদের সহিত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ক বাহির করা প্রয়োজন। কতকগুলি অন্ত্যজ জাতি—যথা, বাউরী, ভূমিজ, ভূঁইয়া, খন্দ, রামোশী এবং স্থান বিশেষের কুর্ম্মী ও দক্ষিণের অনেক নীচ জাতীয় লোকদের সহিত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ক ধাপে ধাপে ধরা যায়। কিন্তু পতিত বা অন্ত্যজ বলিলেই আদিবাসী বুঝায় না; অথচ কতকগুলি স্মৃতিতে (যম সংহিতা, ৫২; সম্বর্ত্ত সংহিতা, ১০-১২) ভীল, কোল-দেরও পতিতের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। পতিত নানাপ্রকারের আছে—উচ্চবর্ণোদ্ভব এবং তথাকথিত আর্য্যোচিত লোকও আজ হিন্দু সমাজে

পতিত এবং আদিবাসী সম্ভূত লোক যাহাদের আকৃতিতে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব (Pre-Dravidian) মূল জাতীয় লক্ষণ আছে তাহারাও পতিত বলিয়া গণ্য। আজ-কালকার উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যেও আদিবাসীর শারীরিক লক্ষণসমূহের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শারীরিক নরতত্ত্ব (Physical Anthropology) দ্বারা আজ একটা জাতির সামাজিক মর্য্যাদা স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অন্ত্যজ ও আদিবাসীর আকৃতিগত পার্থক্য সর্ব্বত্র সমান বলিয়াও বোঝা যায় না।

কিন্তু বর্ণাশ্রম সমাজ দ্বিজ জাতিদের মধ্যে যেমন বিভেদ সৃষ্টি করে, শূদ্রের মধ্যেও তদ্রূপ করিয়া থাকে। তাহাদিগকে সৎ ও অসৎ শূদ্র নামে বিভক্ত করা হয়। অসৎ শূদ্রের নীচে অন্ত্যজের স্থান। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর সীমা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। শ্রেণী ও জাতি সমূহ শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় পদমর্য্যাদা পরিবর্ত্তিত করিতেছে। একই জাতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক পদমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেছে। এই বাঙ্গলায়ই দেখা গিয়াছে, একই জাতি এক জেলায় জলচল, আবার অন্য জেলায় জল-অচল। সমাজ গতিশীল, উহার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম প্রতিনিয়তই স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্ম্ম বিভিন্ন জাতির মর্য্যাদাসূচক নামকরণ (nomenclature) মধ্যে বাঁধা ধরা (stereotyped) গণ্ডী টানিয়া দেয় নাই। ফলে নিম্নশ্রেণীর জাতিগুলি স্বীয় গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া উচ্চস্তরে প্রবেশ করিতেছে। (৫) কিন্তু উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য অনেক জাতি আজ হিন্দু অথচ হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে! ইহাই হইতেছে হিন্দু সমাজের সমস্যা।

৫। আদিবাসীদের সহিত হিন্দু সমাজের সম্পর্ক এবং তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে Prof. Ghurye : The Aborigines—"So-called" And Their Future" দ্রষ্টব্য। তিনি বলেন, অনেক আদিবাসী হিন্দু হইয়া ক্ষত্রিয় পদ গ্রহণ করিয়াছে।

১০। হিন্দু সামাজিক-রাষ্ট্র

এই সমস্যা নিয়াই কথা উঠে—হিন্দু-রাষ্ট্র মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনীর স্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছে। এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে, হিন্দু-রাষ্ট্র যোদ্ধৃ ও ধর্ম্মভাব সমন্বিত রাষ্ট্র (Military-sacerdotal state); প্রাচীন ইউরোপীয় আর্য্যভাষীদের রাষ্ট্রও তদ্রূপ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা বলেন যে হিন্দুরাষ্ট্র কখনও দেব-রাষ্ট্রে (Theocratic state) পরিণত হয় নাই। অথচ পুরাণ ও স্মৃতি পাঠে এই তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে রাজা "বিশেষ যত্নে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন।" তাম্রলিপিসমূহে রাজাকে বর্ণাশ্রমের "আশ্রয়-স্থল" অথবা 'সর্ব্ব বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপণ প্রবৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (১) যাহারা ধর্ম্মচ্যুত, রাজা পুনরায় তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন (২) (মৎস্য, ২১৫।৬২-৬৩)। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (১।৪৬) বলে—রাজ কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জনপদসমূহ স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে তাহাদিগকে অপরাধ অনুযায়ী দণ্ড প্রদান করিয়া পুনঃ ধর্ম্মপথে আনয়ন করিবেন। হিন্দুরাষ্ট্র জনসাধারণের দ্বারা গঠিত আইনের (constitution) উপর ভিত্তি স্থাপিত, ধর্ম্মসম্পর্ক-বিরহিত হালের ন্যায় রাষ্ট্র (secular state)

১। দেব পালদেবের তাম্রশাসন (৫ম পংক্তি), গৌড়লেখমালা; ৩য় বিগ্রহ পালদেবের তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা; সর্ব্ববর্ম্মণের আশীড়গড় তাম্রশাসন (Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. 111 P221) এবং হর্ষ-বর্দ্ধনের শোণপাক তাম্রশাসন, ঐ, পুঃ ২৩১ দ্রষ্টব্য।

২। জনৈক শূদ্র তপস্যা করিতেছিল বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আনিত অভিযোগক্রমে রামচন্দ্র তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করেন বলিয়া রামায়ণে যে-কাহিনী বর্ণিত আছে তাহা উক্ত নীতি প্রসূত।

ছিল না। (৩) বা এখনও নয়—ইহার সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক ভিন্ন ও পৃথক করা যায় না। ধর্ম্ম রক্ষা করাই হইতেছে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য; ইহা বর্ণাশ্রমীয় ও বৌদ্ধ উভয়ের মত হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়। আবার "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন" করিবার কথাও মহাভারতে উল্লিখিত আছে। ইহার ফলে প্রাচীন আর্য্যদের যে সামাজিক-রাষ্ট্র (Social state) সমুদ্ভূত হইল তন্মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের পদও নির্দ্ধারিত হয়। হিন্দুরাষ্ট্র কোনকালেই শ্রেণী-বিহীন ছিল না। হিন্দু-রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বলেন, "প্রজা রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হইলেই পৃথিবীর যে-কোন অংশে বা যুগেই হউক না কেন বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়—রাষ্ট্র সমুদ্ভূত হইবে অথচ বর্ণাশ্রম থাকিবে না, একথা অচিন্তনীয়," ("As scon, therefore, as the praja is organised into a state, be it in any part of the world or in any epoch of history, a *Varnasrama* spontaneously emerges into being. It is inconceivable, in this theory, that there should be a state and yet no varnasramas." (৪) যখন হিন্দু রাষ্ট্র বর্ণাশ্রমের সহিত বিজড়িত ও উহা রক্ষা করিবার ভার রাজার উপর ন্যস্ত ছিল (৫) এবং এই রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণবর্ণ অবধ্য, আর যখন ধর্ম্মানুশাসনে বিবিধ বর্ণের মর্য্যাদা আইন ও সম্পত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকারের ছিল তখন সেই রাষ্ট্রকে secular state কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ?

৩। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "Hindu states were thoroughly secular—Political Institutions and Theories of the Hindus, P 13. লেখক এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারেন না।

৪। B. K. Sarkar—Op, cit, P 213, পুরাণাদিতে শাকদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের অস্তিত্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

৫। বাঙ্গলার সম্রাট ধর্ম্মপালদেব ব্রাহ্মণাদি বর্ণের স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠাপয়িতা (শাস্ত্রার্থ ভাজা চলতো) সুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্ঠাপয়তা স্বধর্ম্মে" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। [দেবপাল দেবের মুঙ্গের-লিপি, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪১—৪৪]

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছি-লিপিতে তাহাকে (বিগ্রহপালদেবকে) বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল [cf "চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাশ্রয়ঃ সিতযশঃ (পুঞ্জ)," ১৩শ শ্লোক—গৌড়লেখমালা ; পৃঃ ১২৬]

বর্ণাশ্রমীয় সামাজিক রাষ্ট্রে যখন বিভিন্ন শ্রেণী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বিভাগ ছিল তখন এই বিভাগের মধ্যে অধিকারী-ভেদ স্পষ্টই ধরা পড়ে। মোটামুটি দেখা যায়—দ্বিজ, সৎ-শূদ্র ও অসৎ-শূদ্র, এই তিনটি ভেদ রহিয়াছে। অন্ত্যজ ইহার বাহিরে অবস্থিত। এই সামাজিক ভেদ দ্বারা হিন্দু রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রিক অসুবিধা ভোগের বিভেদ ছিল তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। তুলনামূলক পাঠ হইতে প্রাচীন রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিকার-ভেদের সহিত সামাজিক অধিকার-ভেদও বিজড়িত ছিল। হিন্দুরাষ্ট্রে যখন 'বৈরদেয়', ব্যবহার ও দণ্ডে, বিবাহাদির নিয়মে, দ্বিজ ও শূদ্রে প্রভেদ ছিল, যখন দ্বিজের অনেক সুবিধা ভোগের অধিকার হইতে শূদ্র বঞ্চিত ছিল তখন তাহার পশ্চাতে যে রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধা-অধিকার-ভেদ ছিল না তাহা বলা চলে না; এইজন্যই কৌটিল্য শূদ্রকে 'আর্য্যপ্রাণ' বলিয়া পূর্ব্ব-বঞ্চিত অনেক অধিকার পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই আলোচনা দ্বারা ইহা বেশ বুঝা যায় যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সুখ-সুবিধা ভোগের বিবিধ ব্যবস্থার পশ্চাতে ছিল রাষ্ট্রীয় অধিকার (privilege) ভোগের পার্থক্য। কৌটিল্য যখন শূদ্রকে 'আর্য্য' বলিয়া গণ্য করিলেন তখন সে পূর্ণ-নাগরিক-অধিকার প্রাপ্ত হইল বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুর রাষ্ট্র-প্রসূত সামাজিক ক্ষেত্রে দ্বিজদের বিভাগের ন্যায় শূদ্রদেরও দুইটি বিভাগ দেখা যায়। শূদ্র চতুরাশ্রমের অন্তর্গত, কিন্তু অসৎ-শূদ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সমস্ত সুবিধা ভোগ করে না। সে জলচল নহে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সে পায় না—যদিও-বা তাহা (ব্রাহ্মণ পুরোহিত) পায় তাহা হইলেও ঐ ব্রাহ্মণ পতিত হয়। আবার অনেক অসৎ-শূদ্র অস্পৃশ্য, তাহারা ধোপা-নাপিত পায় না।

এই অনুষ্ঠানগুলিকে শুধুই ব্রাহ্মণ্যবাদের খামখেয়ালীপ্রসূত নয় বলিয়া আবিষ্কার করিতে হইবে যে ইহার পশ্চাতে কি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণ ছিল। দেখা যায়, হিন্দুর সামাজিক-রাষ্ট্রে অধিকারসমূহ স্তরে স্তরে নিম্নের দিকে কমিয়া যাইতেছে। সৎ-শূদ্র যে-সকল অধিকার ভোগ করিতেছে অসৎ-

শূদ্র তাহার অনেকগুলি হইতেই বঞ্চিত হইতেছে। রাষ্ট্র-শক্তিই আবার তাহাদিগকে অধিকার প্রদান ও সৎ-শূদ্রে পরিণত করিতে পারে (বল্লালচরিত দ্রষ্টব্য) এবং সৎ-শূদ্রকে সৃষ্টি করিয়া আরও উন্নীত করিতে পারে (রাজার দ্বারা শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করার প্রবাদ ভারতের সর্ব্বত্রই আছে)! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কতকগুলি শিল্পী-জাতিকে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায় (১০।৮৯-৯৫)। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার প্রভৃতি তিনটি জাতিকে ব্রহ্মার শাপে 'পতিত' বলা হইয়াছে। অথচ স্বর্ণকার ও 'ভিল্ল'কে প্রথমে 'সৎ-শূদ্র' বলা হইয়াছে (১০।১৫-২৩)। এখানে দেখা যায় যে পতিত হইলেই 'অযাজ্য' এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণেও বর্ণিত আছে "ইহাদিগকে যিনি যজনীয় বা যাজ্য করিবেন তিনিও পতিত হইবেন।" (১০।১৫-২৩)

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সৎ-শূদ্র কতকগুলি অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলে সে অসৎ-শূদ্রত্বে অবনমিত হয়; তাহা হইলে এইস্থলে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, হিন্দুর সামাজিক রাষ্ট্রে কতকগুলি অধিকার ভোগ নিয়াই দ্বিজত্ব, সৎ-শূদ্রত্ব, অসৎ-শূদ্রত্ব এবং অন্ত্যজের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রিক অধিকার নিয়াই অধিকারী-ভেদ উদ্ভূত হইয়াছে। এদিকে আবার বল্লালচরিত বলিতেছে, "যখন বাঙ্গলার রাজা বল্লাল সেন কৈবর্ত্তদের 'জলচল' করিলেন তখন তাহারা লোক ব্যবহার মধ্যে আসিল।" আবার ব্যাসপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া এই পুস্তকে বলা হইয়াছে, "রত্নাকর, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, লিপিকর, তাম্রকর, লৌহকার, শঙ্খকার, তন্ত্রিণ প্রভৃতি জাতি সৎ-শূদ্র" (১৯।৫—৬)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার ব্রহ্মশাপে পতিত —ইহা উপরেই দেখা গিয়াছে (আজও সামাজিকভাবে সর্ব্বত্র ইহারা পতিত)। এই পুস্তকে আরও বর্ণিত আছে, "বল্লাল সেন কুম্ভকার, কর্ম্মকারদিগকে সৎ শূদ্র করিয়া লন" (২৩।২০—২১)। রাজার নিজের নাপিতকে "ঠাকুর" করা হইল (২৩।২৪), অর্থাৎ তাহাকে অভিজাত উপাধি দেওয়া হইল। বল্লাল

কতকগুলি দাস-ব্যবসায়ী "সুদুর্মতি" অধম ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত করিলেন; "বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের কুল-বিশৃঙ্খলা দেখিয়া বীজ-মাহাত্ম্য অনুসারে (২৩।২২—২৩) তাহাদিগকে পুনঃ সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণত্বে ও ক্ষত্রিয়ত্বে সুদৃঢ় করিয়া দিলেন"। তাঁহার শেষ কীর্ত্তি সুবর্ণ বণিকদিগকে পতিত করা (২৩।১৫)! ব্যবহারিক জীবনে সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার পশ্চাতে আছে রাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করা। কিন্তু যেখানে আজ হিন্দুরাষ্ট্র (৬) নাই সেখানে সামাজিক পদ ও কর্ম্মের (functions) খোলস্‌টা (structure) আছে, কিন্তু তাহার আসল রূপটা নাই। সেইজন্য এইসব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের function-গুলি ধরিতে পারা যায় না।

এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আজকালকার অনেক পতিত ও অস্পৃশ্য জাতির প্রাচীন পরিচয় কি ছিল? পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বত্রই আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, বিজিত জাতিসমূহ বিজয়ী জাতিসমূহ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া রাষ্ট্র ও সমাজের অতি নিম্নস্তরে অবনমিত হইয়াছে। নানাপ্রকারের বিধি-নিষেধ দ্বারা তাহাদের "জলবাহী ও কাষ্ঠ কর্ত্তনকারী" জাতিতে পরিণত করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের Thetis ও Helots জাতিগুলি এই প্রকারের ছিল। প্রাচীন জার্ম্মাণীর Serf-রা এই প্রকারের পরাজিত-কৌমোদ্ভূত ছিল। আরব মুসলমানদের দ্বারা বিজিত দেশসমূহের জারতুষ্ট্রীয় ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী পুরাতন শাসকশ্রেণীর লোকেরা ঘৃণিত 'জিম্মি'রূপে অবনমিত হয় (৭)। ভারতেও প্রাচীনকালে তদ্রূপ হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। আজকালকার বাঙ্গলার 'পোদ' ও 'বাগ্‌দী' জাতি কি বৈদিক সাহিত্যের 'বগদ' এবং 'পৌণ্ড্র' জাতি? অনেকে তাহাই অনুমান করেন (৮)। আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী

৬। পঞ্জাবের পার্ব্বত্য হিন্দুরাষ্ট্রসমূহে এবং নেপালে এখনও রাজাই "জাতি" প্রদান করে বলিয়া পর্য্যবেক্ষণকারিগণ বলেন।

৭। P. K. Hitti—History of the Arabs, Pp 100—101; 343.

৮। H. P. Sastri—History of the Magadhan Literature.

গ্রীক্ লেখকদের বর্ণিত পরাক্রমশালী 'গন্গ্রি' (Gangri) (গ্রীক বহুবচনে gan-garidae ; ল্যাটিনে Gangaritis) জাতি আজ বাঙ্গলা ও মগধের কোথায় লুক্কায়িত রহিল (৯)? 'অঙ্গ' নামক জৈন-ধর্ম্মপুস্তকে বর্ণিত প্রাচীন রাঢ়ের "চোয়াড়" জাতি আজ কোথায় লুকাইল? লেখক নরতাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহা দেখিয়াছেন, যে শারীরিক আকৃতি এই সকল তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতি-সমূহের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা উচ্চ জাতিদের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই সকল প্রাচীন কৌমের মধ্য হইতে যাঁহারা শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বারা বর্ণাশ্রমের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা আজ উচ্চবর্ণের ও উচ্চজাতির লোক হইয়াছেন! আর যাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন তাঁহারাই পুরাতন নাম ও প্রাচীনকালের আর্য্যভাষীদের দ্বারা পরাজয়ের কালিমা বহন করিয়া পতিত বা অস্পৃশ্য আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন!

বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দ্বারাই অন্ত্যজ ও আদিমবাসীরা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন (১০) কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রের অভাবে আদিমবাসীরা সরাসরিভাবে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইতে পারিতেছেন না। অন্ত্যজেরা তদ্রূপ উপরে উঠিতে পারিতেছেন না। তবে যেখানে যে-সুবিধা পাওয়া যায় তাহাই গ্রহণ করিয়া অনেকেই জাতি মর্য্যাদার উন্নতি বিধান করিতেছেন। জনশ্রুতি আছে, আশী বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের জমিদারগণ মিলিত হইয়া সেখানকার একটা অনাচরণীয় জাতিকে জলচল করেন এবং বৈষ্ণব বাবাজীদের দ্বারা তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়া হিন্দু করেন। ময়মনসিংহেও এরূপ প্রবাদ আছে।

৯। আজকাল একদল বাঙ্গালী লেখক এই উল্লেখ হইতে 'গঙ্গারাঢ়ী' নামীয় একটা প্রাচীন জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শব্দের গ্রীক্ ব্যাকরণানুগত বহুবচনের রূপটির অর্থ না বুঝিয়াই তাঁহারা অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

(১০) অধ্যাপক গুরিয়ের পুস্তক দ্রষ্টব্য। মধ্য-ভারতে কবীরপন্থীরা আদিম অধিবাসীদের উন্নত হিন্দু জাতিতে পরিণত করিতেছে।

এই প্রকারে শ্রীহট্টের কাছাড়ীরা ও চেরাপুঞ্জীর খাসিয়াগণ বৈষ্ণব-হিন্দু হন। আবার অনেকস্থলে স্থানীয় জমিদার এবং নেতৃবৃন্দ বিপক্ষতাচরণ করিয়া অনেক অস্পৃশ্য জাতিকে জলচল করিতে রাজী হন না। অনেক জাতি আজ স্বীয় শক্তি বলে উন্নত হইয়া উচ্চ হইতেছেন এবং বর্ত্তমানের রাষ্ট্রিক আইন এই বিষয়ে সহায়তা করিতেছে।

১১। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ

হিন্দুর এই সামাজিক রাষ্ট্রের শ্রেণী-সমূহের মর্য্যাদার বিভিন্নতার সহিত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বিজড়িত রহিয়াছে। ইহা হইতেছে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ। স্মৃতি-সমূহের মতে উক্ত বিবাহ-জাত সন্তানের সামাজিক মর্য্যাদা দ্বারা উহার উৎপত্তি ধরা যায়: যথা—নিম্নবর্ণের পিতা এবং উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান প্রতিলোম বিবাহজাত এবং উচ্চবর্ণের পিতা ও নিম্নবর্ণের মাতার সন্তান অনুলোম বিবাহ-জাত। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় অনুলোম বিবাহ-জাত সন্তানকে 'সৎ' [মনু 'অপসদ' বলিয়াছেন; ১০।১১] এবং প্রতি-লোম-জাত সন্তানকে 'অসৎ' বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে (১।৯৫)। কিন্তু স্মৃতি-সমূহের এই সকল সংজ্ঞা সঠিক নয় বলিয়া অনুমিত হয়; কারণ ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে যম-সংহিতায় 'ভিল্লকে' পতিত বলা হইয়াছে। অন্যপক্ষে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আবার তাহাকে (ভিল্ল) সৎ-শূদ্র বলা হইয়াছে। আবার সম্বর্ত্ত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ-কন্যাজাত পুত্রকে চণ্ডাল বলিয়া গণ্য করা হয়। এরূপ পুত্র ধর্ম্মের কোন ক্রিয়া (rites) নিষ্পন্ন করিতে পারিবে না। তিন প্রকারের চণ্ডাল আছে; শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী-মাতা-জাত পুত্র তৃতীয় প্রকারের। বর্দ্ধকি (সূত্রধর), নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক,

কায়স্থ, মালাকার…মেড, চণ্ডাল, দাস, কোল ও গোখাদকগণ সর্ব্বনিম্ন জাতির লোক (১০—১২)। এই স্থলে বিভিন্ন জাতির মর্য্যাদা সম্পর্কে আর একটি ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া গেল। অন্যান্য পুস্তক-সমূহে যে সকল জাতিকে 'বৈশ্য' ও 'সৎ-শূদ্র, বলা হইয়াছে এস্থলে তাহাদিগকে চণ্ডালের সমতুল্য করা হইয়াছে। এই জন্য স্মৃতি-সমূহে জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কোন দিকেরই নিশ্চিত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া যায় না (১)। হিন্দুশাস্ত্র সমূহে বিবাহ সম্পর্কে এই মত প্রকাশ পাইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকের তদপেক্ষা নিম্নবর্ণ জাত স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ-জাত পুত্র অনুলোম। এই পুত্র স্ববর্ণজাত পুত্র অপেক্ষা অধম বটে, তথাপি সে অনেক সুবিধার অধিকারী; কিন্তু তদ্বিপরীত বিবাহ-জাত পুত্র নিম্ন-জাতীয় হইয়া থাকে এবং কোন প্রকার সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে

১। ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রস্তর ও তাম্র-ফলক-সমূহের যে পাঠোদ্ধার হইয়াছে তাহাতে জাতি-সমূহের উৎপত্তি বিষয়ে অন্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অনুশাসনগুলিতে 'কায়স্থ' একটি রাজকীয় পদ (ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুর-লিপি; Malakapuram stonepiller inscription of Rudradeva in 1183 Saka year) বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে; 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রদের' "গোত্রজ" বলা হইয়াছে (Jaina inscription in the temple of Bajnath at Kiragram—Epigrapica Indica, vol. P. 118)। আবার স্মৃতিতে উক্ত এবং আজকাল যাহাদিগকে "জাতি" বলা হয় তাহাদিগকে অনুশাসন-সমূহে 'শ্রেণী' (guild) বলা হইয়াছে (Mandasor stone-inscriptions of Kumargupta and Bandhu Varman, Corpus Inscriptionum Indicarum, vol, III; Inscription of Skandagupta 'তৈলিকশ্রেন্যা' Ibid. No 16. p. 71; 'সমস্ত মালিক শ্রেন্যা' in "the Two inscriptions on the Vaillabhatta Svamin temple; Epigrapica Indica vol. I. No 20. P. 155)।

পারে না (মনু, ১০,৬৭-৬৮)। ইহার কারণ প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ (মনু, ১০।৬৪)। (২)

এই বিবাহ-পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানে hypergamy নামে অভিহিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা হিন্দু সমাজের এক অদ্ভুত ব্যবস্থা! কিন্তু তুলনা-মূলক পাঠ দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায় যে এই প্রকারের বিবাহ পদ্ধতি প্রাচীনকালের গ্রীসেও অজ্ঞাত ছিল না। উচ্চ-শ্রেণীর লোক নিম্ন-শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিলে উহাকে epigamy বলা হইত। এই প্রকার বিবাহ দ্বারা দায়াধিকার ও ধর্ম্মাধিকার এবং কতকাংশ রাজনীতিক অধিকার আইনতঃ সঙ্কুচিত হইত। এই জন্যই নাগরিক ও অ-নাগরিক বিবাহ সম্পন্ন হইত না (৩)। এই স্থলে পূর্ণ নাগরিক-অধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সহিত অধিকার-বিহীন অ-নাগরিকের বিবাহ চলিত না; এরূপ বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে অনেককে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইত। প্রাচীন রোমের প্লেবদের পুরাতন নাগরিকদের (Patricians) সহিত বিবাহ (connubium) নিষিদ্ধ ছিল। তাহারাও ধর্ম্মের ক্রিয়া (cult) সম্পাদন এবং পুরোহিত পদগ্রহণ করিতে পারিত না। জীবনে তাহাদের কেবল কর্ত্তব্যই পালন করিতে হইত, তাহারা পূর্ণ-রোমীয় নাগরিক অধিকার (civitate) ভোগ করিতে পারিত না (৩)।

জার্ম্মাণীর ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনকালে রাজা (Princes) অভিজাত এবং স্বাধীন ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু মধ্যযুগে শ্রেণী-সমূহ বিশিষ্টভাবে আইন-সমূহ দ্বারা প্রকট হওয়ায় এই প্রকারের বিবাহ কমিয়া গিয়াছিল। আবার স্বাধীন ও অস্বাধীন (un-free) ব্যক্তিদের

২। Jones—Institutes of Hindu Law, pp 349—350

৩। G. F. Shoemann—"Griechiches Altertuemer," 4th Edi. P 105.

৩। Schwelger—"Roemische Geschichte, pp. 620—621.

বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রাচীনকালে দণ্ডনীয় ছিল (৪)। কিন্তু মধ্যযুগে ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়; উচ্চশ্রেণীর লোক নিম্নশ্রেণীর সহিত বিবাহ করিতে পারিত না। যদি স্বামী ও স্ত্রী বিভিন্ন শ্রেণীর হইত তাহা হইলে সেই বিবাহ অবৈধ বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রকারের বিবাহে যখন এক জন উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক তাহার নিম্নশ্রেণীর পুরুষকে বিবাহ করিত, তখন বিবাহিত জীবন পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর স্ব-শ্রেণীয় হইত, অর্থাৎ এই স্ত্রীলোক বিবাহিত জীবনে (স্বামীর জীবনকাল পর্য্যন্ত) শ্রেণী বা জাতি-চ্যুত হইয়া থাকিত (প্রতিলোম বিবাহের ফলের ন্যায়)। কিন্তু একজন নিম্নশ্রেণীয় স্ত্রীলোক যখন উচ্চশ্রেণীয় একজন পুরুষকে বিবাহ করিত তখন তাহার স্বামী তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া নিতে পারিত না (অনুলোম বিবাহের ফল—ব্রাহ্মণের সহিত অব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহের ন্যায়)। এই প্রকারের বিবাহের সন্তানদের দস্তুর মত দুঃখভোগ করিতে হইত (৫)। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর এক ইতিহাস হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে ফ্রাঙ্কদের রাজত্বের সময়ে অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ স্বাধীন শ্রেণীর লোকদের বিবাহ অবৈধ বলিয়া ধার্য্য হইত। একজন স্বাধীন বা মুক্ত পুরুষ একটি অভিজাত শ্রেণীর রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত (৬)।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দৃষ্ট হয় যে সমাজে শ্রেণী-বিভাগ পাকাপোক্ত হইলে, অর্থাৎ সমাজ সামন্ততন্ত্রীয় যুগে প্রবেশ করিলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে কড়াকড়ির সুদৃঢ় নিয়ম বিবর্ত্তিত হয়। উচ্চশ্রেণীসমূহ

৪। Jacob Grimm—"Deutsche Rechtsaltertuemer" vol. I. p. 607.

৫। R. Schroeder—'Lehrbuch der deutsche Rechtsgechischte,' Pp.501-502.

৬। H. Brunner—Deutsche Rechtsgeschichte, P250.

নিজেদের শ্রেণী-চৈতন্ত দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নিম্নশ্রেণীয় পুরুষদের নিকট কন্তাদানে অসম্মত হয়। তাহারা "রুটী ও বেটী" দ্বারা নিম্নস্তরের লোকের সহিত সাম্য অবলম্বন করিতে চাহে না। ইসলাম ধর্ম্মেও মুসলমান নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অ-মুসলমানকে কন্তাদান করে না। এই সকল ব্যাপারে শ্রেণী লক্ষণ (class-character) প্রকট হয়। হিন্দুদেরও সামন্ততান্ত্রিক যুগের প্রারম্ভ হইতে বিবাহাদি ব্যাপারে কড়া নিয়ম উদ্ভূত হয়। এ স্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে অন্যান্য দেশের ন্যায় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ বা শ্রেণীয় স্ত্রীলোকের সহিত নিম্নবর্ণের লোকের বিবাহ হইলে স্ত্রীলোক অধোগামী হয়, আবার নিম্নশ্রেণীয় স্ত্রীলোকের উচ্চশ্রেণীয় পুরুষের সহিত বিবাহ হইলে স্বামীর শ্রেণী বা বর্ণের মর্য্যাদা অথবা অধিকার সে প্রাপ্ত হয় না। (শূদ্রাণী ব্রাহ্মণের পত্নী হইলে ব্রাহ্মণী হয় না, বিষ্ণু, ২৬।৪-৫)। এই প্রকারের বিবাহের সন্ততিগণ মিশ্রবর্ণের বলিয়া ঘৃণিত হয়। হিন্দুর এই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ তাহার বৈচিত্র্য নয়। উহা নানাভাবে প্রাচীনকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ছিল। আজ এই প্রকারের বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে—কেবল হিমালয়ের সানুদেশাবস্থিত হিন্দুদেশ-সমূহে এখনও অসবর্ণ বিবাহ চলিতেছে।

১২। অসবর্ণ বিবাহের সন্তান

স্মৃতিসমূহ পাঠে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে দুই প্রকারের অসবর্ণ সন্তান উৎপন্ন হইত। এক্ষণে অনুলোমজাত সন্তানদের অবস্থা কি দাঁড়াইত তাহাই অনুসন্ধানের বস্তু। বৈদিক-যুগের পর হইতেই স্মৃতিসমূহ লিখিত হইতে থাকে। বৌধায়নে (খৃঃ পূঃ ৬০০—৩০০ শতক) ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিবাহের কথা এবং মিশ্রিত জাতির অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় (১।৪।৭—১২)। 'গোভিল কিন্তু ইহার বিপক্ষে ছিল (৩।২।৪২)। গৌতমে মিশ্রিত জাতির

(৪।১৪—১৭) উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতম যবন জাতিকে (গ্রীক্) ক্ষত্রিয় পিতা ও শূদ্রাণী-মাতা জাত বলিয়াছেন (৪।১৭)। ইহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে ম্যাসিডোনীয় আক্রমণ তখন ভারতে হইয়াছে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে হেলেনিষ্টিক রাজ্যও সংস্থাপিত হইয়াছে। যবনদের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতটি হিন্দু-পদ্ধতি অনুযায়ীই গঠিত হইয়াছিল; কারণ পরে অনুলোমজাত সন্তান মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এই জন্যই হয়ত মনু ও পতঞ্জলি গ্রীক ও শকদের শূদ্র বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। গৌতমে অনুলোম বিবাহে 'অনন্তর" পুত্রদের "সবর্ণ" বলা হইয়াছে (৪।৯)। কৌটিল্যেও এই সূত্রানুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়: "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রা সবর্ণা একান্তরা অসবর্ণাঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের 'অনন্তর' পুত্রেরা (ঠিক পরের বর্ণের মাতাজাত পুত্র) সবর্ণ কিন্তু 'একান্তর' পুত্রেরা (দুইবর্ণ নিম্নস্থানীয় মাতাজাত পুত্র) 'অসবর্ণ' (৬০ প্রকরণ—পুত্রবিভাগ, Bk. III, Chap. VII, p. 164)।

মানবধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এক বর্ণের পিতামাতার সন্ততিগণ 'সবর্ণ' হইবে (১০।৫)। যদি একজন দ্বিজ ঠিক তাহার নিম্নবর্ণের কন্যা বিবাহ করে তাহা হইলে সেই সন্ততিগণ পিতার সমান হইবে, কিন্তু মাতৃদোষের জন্য নিন্দনীয় হইবে (১০।৬)। পরাশর (১০০—৫০০ খৃঃ) বলেন: ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত পুত্র, যে জন্য ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে 'দাস" বলা হয় এবং সংস্কার-বঞ্চিত পুত্রকে "নাপিত" বলা হয়।

পরাশরের এই মতের মধ্যে এই তথ্যই নিহিত দেখা যায় যে ব্রাহ্মণের শূদ্রাণী-গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ্য সংস্কার-প্রাপ্ত হইত, যদিচ সে "দাস" নাম প্রাপ্ত হইত। কিন্তু গৌতম বলিতেছেন, উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের রমণীকে বিবাহ করিলে সেই বিবাহ জাতপুত্র পাঁচ কিম্বা সাত পুরুষ পর্য্যন্ত তাহার বর্ণ-শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে (মনুও এই প্রকারের কথা বলিয়াছেন,—

১০।৬৪—৬৫)। এখানে "ক্ষেত্র হইতে বীজ শ্রেষ্ঠ" রূপ এই প্রাচীন হিন্দুমতই প্রতিধ্বনিত হইতে দেখা যায়; আরও দেখা যায়, এবম্প্রকারের সন্তান পিতার বর্ণজনিত অধিকার-ভোগের দাবী রাখিত। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন স্মৃতি ঔশনস ধর্ম্মসূত্রের মত লক্ষণীয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, :"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিম্বা বৈশ্যের তৎপরবর্ত্তী বর্ণের স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হয় (ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতো ব্রাহ্মণ এব সঃ—Chap. III, folio, 3a) (১)। এই স্থলে 'অনন্তর' পুত্রকে সবর্ণ বলা হইয়াছে (এই শ্লোক ৺পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থে নাই)।

এই সকল তথ্যাদি হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে বেদের পরবর্ত্তী যুগে বর্ণ-সঙ্কর সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এই বিষয়ে বৈদিক শ্রৌতসূত্রসমূহ রচনাকালের যুগের সাহিত্যই সাক্ষ্য প্রদান করে যে ব্রাহ্মণের ঔরসে অব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইত এবং ব্রাহ্মণের কর্ম্ম সম্পাদন করিত। (লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, দশপেয় যজ্ঞ, ৯।২।৬)।

অতঃপর মনু বলিতেছেন, দ্বিজদের ছয় পুত্র, অর্থাৎ সবর্ণ পুত্রেরা এবং "অনন্তর' পুত্রেরা দ্বিজদের কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আইন ভঙ্গ করিয়া যে সব পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহারা শূদ্রের কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হয় (১০।৪১)। ইহ হইতে বুঝা যায় যে দ্বিজবর্ণসমূহের অনুলোম বিবাহ-জাত সন্তানেরা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইত; অন্য-পক্ষে প্রতিলোম বিবাহজাত পুত্রেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইত।

ইহার পরের যুগে শঙ্খ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত সন্তান মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয় (ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়ামুৎপন্নো ক্ষত্রিয় এব ভবতি)। (২) এতদ্বারা অনন্তর পুত্রদের মাতার বর্ণে অবনমিত করা হইল (এই শ্লোক ৺পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা সম্পাদিত পুস্তকে নাই)। (৩)

১। History of Dharmastastra—Quoted by Kane, p, 112,

২। Sankhya—quoted in Mitakshara on Jagnavalkya, p, 9',

৩। Quoted by Kane, p, 79,

এই বিবর্ত্তনে দেখা যায় যে, প্রথমে বর্ণসঙ্করেরা পিতার বর্ণ অথবা শ্রেণী প্রাপ্ত হইত, তৎপর তাহারা মাঝামাঝি পদের লোক (অনন্তর) বলিয়া গণ্য হইত। অবশেষে তাহাদিগকে মাতার জাতিতে ফেলা হইল। পক্ষান্তরে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তানদের 'অসৎ' ও 'ঘৃণ্য' বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত অনুলোম বিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরব দেশীয় পর্য্যটক ইবন খোরদাদ্ বে (৯১২ খৃঃ মৃত) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করে কিন্তু তদ্বিপরীত হয় না। এখানে ইহা বিশেষভাবে জিজ্ঞাস্য যে সন্ততিগণ কি পিতার জাতি প্রাপ্ত হইত না!

অধুনা অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শোনা যায় যে হিমালয়স্থিত কোন কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে উক্ত প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্যের সমূর্ত্ত প্রতীক ভার্গব পরশুরামের জন্ম বৃত্তান্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় যে স্মৃতির দাবীর সত্য হইলে পরশুরাম কোন জাতির লোক ছিলেন? পরশুরামের মাতা রেণুকা অযোধ্যার রাজকুমারী ছিলেন (মহাভারত—৩,৯, ৪৮৫৩, ১১৬, ১১০৭১—৩) তিনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, অতএব্ বর্ণসঙ্কর ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী অর্থাৎ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার এবম্প্রকারের জন্মেতিহাস সত্বেও ব্রাহ্মণ্য পুস্তক সমূহে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের Champion বলিয়া গ্রহণ করা হয় কি প্রকারে? এত দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে পুরাকালে পিতার শ্রেণী বা বর্ণ দ্বারাই লোকের সামাজিক স্থান নিরূপিত হইত।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে হিন্দুর নানা প্রকারের পেযাগত জাতিগুলিকে স্মৃতিকারেরা অসবর্ণ বিবাহের ফলস্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা কল্পিত চাতুর্ব্বর্ণ্য

সমাজ মধ্যে সমূর্ত্ত দেখিবার জন্য অনুসন্ধান করিতেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য পেষাগত জাতি বিদ্যমান দেখিতে পান। এই সব জাতির যে পেষাগত উৎপত্তি তাহা তাঁহারা ধরেন নাই বা ধরিতে পারেন নাই। তথাপি মনু বলিতেছেন, এই সব বর্ণসঙ্কর জাতিগুলি তাহাদের বৃত্তি (occupation) দ্বারা পরিচিত (১০।৪০) অর্থাৎ, চাতুর্ব্বর্ণ্য পদ্ধতিই সমাজের একমাত্র পদ্ধতি; তাহার পরিবর্ত্তে বিবিধ পেষানুসরণকারী জাতিসমূহ দেখিয়া তাঁহারা ধরিয়া নিলেন যে ইহারা চাতুর্ব্বর্ণ্য-ভাঙ্গা মিশ্রিত লোকদের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিচারসহ নহে। আবিষ্কৃত খোদিত-লিপিসমূহে অন্য তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এইগুলিকে তাহারা 'শ্রেণী' (guild) বলিতেছে।

বর্ত্তমান যুগেও পেষানুসারী জাতি সৃষ্টি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল কতকগুলি বর্ণসঙ্কর লোক নিয়া একটা জাতি (caste) অথবা সহস্র সহস্র জাতি সৃষ্টি হইতে পারে না। তবে অনেক মধ্যযুগের ও নবোদ্ভূত জাতিরা নিজেদের উৎপত্তির আভিজাত্য দাবী করিবার জন্য সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তক সমূহের এই সকল নাম হইতে নিজেদের নামকরণ করিতেছেন এবং তজ্জন্য স্মৃতি অনুযায়ী নিজেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্পও জাহির করিতেছেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, বিভিন্ন সংস্কৃত পুস্তকে একই জাতির বিভিন্ন উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

১৩। বিবাহ পদ্ধতি

বর্ণাশ্রমীয় সনাতনী বিবাহ-পদ্ধতি হইয়াছে খৃষ্টধর্ম্মের রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক অর্থডক্স সম্প্রদায়ের ন্যায় ধর্ম্মগত (sacramental marriage)। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিবাহ চিরস্থায়ী ও পরকাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাতে

স্বামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ হইতে পারে না (১)। কিন্তু বৌদ্ধদের বিবাহ আইনগত (civil marriage), অর্থাৎ ধর্ম্মগত বিবাহ নয়। স্মৃতিসমূহে নানাবিধ বিবাহ পদ্ধতির কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'ব্রাহ্ম' বিবাহই সমাজে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। হোমাগ্নি সাক্ষী করিয়া এই বিবাহ-পদ্ধতির সহিত প্রাচীন রোমানদের confarreatio বিবাহের মিল আছে। হিন্দুর এইসব বিবাহ-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিলে এখনও 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহ' (wife by capture) পদ্ধতিরই রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগের 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহে'র প্রকৃষ্ট নিদর্শন—রাষ্ট্রকুটরাজ ইন্দ্ররাজ কর্ত্তৃক চালুক্যরাজ-দুহিতাকে বিবাহস্থল হইতে যুদ্ধে কাড়িয়া নিয়া রাক্ষস বিবাহে দৃষ্ট হয়। (২) এই কাড়িয়া নিয়া বিবাহের একটি উন্নতাবস্থা হইতেছে কন্যাপক্ষের পণ বা শুল্ক গ্রহণ করা। হিন্দুর অনেক জাতির মধ্যে এখনও কন্যাপক্ষ পণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতের মুসলমান সমাজেও কন্যাপক্ষে অনেক যায়গায়—যেমন, পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অনেক স্থলে—পণ গ্রহণ করা হয়। ইহার পরের স্তর হইতেছে বরপক্ষের পণ গ্রহণ করা। ইহা তথাকথিত উচ্চ ও শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে এই পণকে ইংরেজী 'Dowry' (হিন্দি—, দহেজ) প্রভৃতি নামে ঢাকিয়া রাখা যায়।

জাতিতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ধারায় দেখা যায় যে, প্রথমে Totemistic অথবা অন্য উপায়ে সমাজবদ্ধ মানবের কৌমের বাহিরে বিবাহ-প্রথা (exogamy) ছিল ; কারণ সগোত্রে বিবাহ সেই সময় নিষিদ্ধ ছিল, তজ্জন্য অন্য কৌম বা কুলের কন্যা কাড়িয়া নিয়া বিবাহ করিত। ইহার ফলে রক্তপাত হইত। পরবর্ত্তীকালে কন্যাব পিতা কন্যাব বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ

১। Golapchandra Sarkar-Sastri—A Treatise on Hindu Law P155.

২। Vide Sanjan Plates of Amoghavarsha E. I, vol XVIII Pp, 251-252।

করিত। ইহাই হইতেছে 'পণ' বা 'শুল্ক'। এখনও অশিক্ষিত এবং তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে উক্ত প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু লেখক বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক্ষণে এই বিষয়ে একটা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। একই জাতিতে বরপক্ষে ও কন্যাপক্ষে পণ লইবার প্রথা চলিতেছে। যেখানে বর শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন সেখানে বরপক্ষ পণ দাবী করিতেছে। উচ্চজাতীয় লোকদের ভিতর শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পণের পরিমাণ অসম্ভব বাড়িয়া চলিতেছে। বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনেও উহা দূরীভূত হইতেছে না। পণ বা dowry নেওয়া একটা অর্থনৈতিক ব্যাপার, ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ নহে।

হিন্দুর বিবাহের আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলি সেই প্রাচীনকালের 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহ' প্রথার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দীভাষীদের ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারী হস্তে বিবাহ এবং বাঙ্গালার হিন্দুর 'টোপর' (helmet) ও 'জাঁতি' পুরাতন কাড়িয়া নিবার উদ্যোগের স্মরণ-চিহ্ন বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রীর মর্য্যাদা স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায় হয়। তাহার আর কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না। গৌতম বলিতেছেন, 'স্ত্রী স্বাধীনা হইবে না··· স্বামীর অমতে কার্য্য করিবে না (১৮). আবার মনু বলিতেছেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি, এমন-কি তাহাদিগকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ও বৈদিকমন্ত্র হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে (৯।১৮)। বিষ্ণুসংহিতা (২৫।১-১৭] স্ত্রীলোকের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে পিতা স্বামী ও পুত্রের বশে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অবশ্য প্রাচীন জার্ম্মাণ, ইহুদী ও অন্যান্য জাতীয় স্ত্রীলোকদেরও এই অবস্থা হইত [৩]।

অন্যদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মৃতিতে যে বিধানই থাকুক না কেন কৌটিল্যে [৪] বিবাহে অবস্থা বিশেষে বিচ্ছেদ (পরস্পরম্ দ্বেষান্ মোক্ষ)

৩। J. J. Meyer—Sexual Life in Ancient India, vol II, P523,

৪। R. Shamasastry—Kautilya's Arthasastra, Pp. 187-202.

ব্যবস্থা আছে [Bk. III. Chap. 155] ও স্ত্রীলোকের স্বামী নিরুদ্দিষ্ট হইলে পুনরায় বিবাহের বিধান আছে [Bk. III, Chap IV, 158]; বিচারকের হুকুম অনুসারে স্ত্রীলোক যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত [Bk. III, Chap, IV, 159] ; বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে [Bk III, Chap, II, 152]। আবার 'ক্ষেত্র হইতে বীজ' শ্রেষ্ঠ কিনা এই বিতর্কে কৌটিল্য বলিয়াছেন, 'পুত্র' পিতা এবং মাতা উভয় হইতে জাত [Bk. III, Chap. VII, 164] [এই সিদ্ধান্ত আজকালকার জীবতত্ত্ববিদ্দের সিদ্ধান্তের সহিত মিলে: পিতা ও মাতার দেহের সমান-সংখ্যক chromosome-র একত্র মিলনে একটি মানব প্রাণীর সৃষ্টি হয়; সুতরাং দেখা যায় যে উভয়েই সমানভাবে একটি জীব-সৃষ্টি ব্যাপারে সহায়তা করে]। বহুপরে পরাশর স্মৃতিতে (৪।২৬) উক্ত হইয়াছে 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতৌ পতৌ। পঞ্চা-স্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধিয়তে' (স্বামী যদি নিরুদ্দিষ্ট হয়, মৃত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় অথবা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে) (৪)। নারদ-স্মৃতিতেও এই শ্লোক আছে (১২।৯৭)। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও অবস্থাভেদে বিবাহিতা কন্যার পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে (১১।৬৬) এবং বিধবারও বিবাহ হইতে পারে (১১।৬৭) বলিয়া বিধান আছে। আবার অনেক শূদ্র জাতির মধ্যে আজও বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষী শূদ্রদের মধ্যে বিবাহে তালাক (divorce) ও পুনর্ব্বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাতি পঞ্চায়েতের অনুজ্ঞা নিয়া কিম্বা প্রথম স্বামীর নিকট হইতে 'ছাড় চিঠি' প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বিবাহ (সাগাই, নিকা) হয় (৫)। বাঙ্গালার তথাকথিত নিম্নজাতীয় কতিপয় অসৎ-শূদ্র জাতির মধ্যে

৪। এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

৫। G. Sastri—Op. Cit, P. 161,

এই প্রকার প্রথা আছে। তবে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ বেশী প্রবল বলিয়া উচ্চশ্রেণীর শূদ্রদের মধ্যে এই প্রথা নাই, যদিও তাহা কয়েক শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া সাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যায় (৬)। উপস্থিত নিম্নশ্রেণীর কোন কোন জাতির মধ্যে তাহা উঠিয়া গিয়াছে এবং উঠিয়া যাইতেছে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে প্রাচীন কাল হইতে একপ্রকারের বিধবা-বিবাহ হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই বিবাহের স্ত্রীকে "পুনর্ভবা" বলিত।

হিন্দুর বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাল্য-বিবাহের কথা উঠে। বাল্য-বিবাহ মুসলমান যুগে হিন্দুর প্রথা বা লোকাচার হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং অনেকেই তজ্জন্য শাস্ত্রীয় বিধান অনুসন্ধান করিতেন।

অন্যপক্ষে ভাস ও কালিদাসের নাটকসমূহে, ভবভূতির 'মালতী মাধব', কাব্যের নল-দময়ন্তী, পৌরাণিক দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও রুক্মিণী প্রভৃতির গল্পে বাল্য-বিবাহের কথা পাওয়া যায় না। আবার বাঙ্গালার বাহিরে বাল্য-বিবাহ সংশোধক পারিবারিক ব্যবস্থাও আছে। প্রাচীন পুস্তকেও এই সম্পর্কে নিষেধ-বিধি আছে (নির্ণয় সিন্ধুধৃত—আশ্বলায়ন বচন) (৭); বাঙ্গালায় ইহার অভাবেই Consent Age Bill গভর্ণমেণ্টকে পাশ করিতে হইয়াছিল।

হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশসমূহের বিবর্ত্তনের মিল আছে। জলি বলেন, গৃহ্যসূত্রোক্ত বিবাহ-ক্রিয়াগুলি দেখিলে মনে হয় যে, এইগুলি 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহ'-প্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারের বিবাহ-প্রথা অতি প্রাচীন; অন্যান্য ইণ্ডো-জার্ম্মাণ জাতিসমূহের মধ্যেও ইহার

৬। একসময়ে বাঙ্গলায় শূদ্রদের মধ্যে 'সাঙ্গা' নামে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। "কবি নারায়ণদেবের সময় ও সমাজ"—মাতৃভূমি আশ্বিন ১৩৫০ সাল—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে নারায়ণদেবের "পদ্মাপুরাণ" দ্রষ্টব্য।

৭। Quoted by Sastri. P. 113.

বিস্তার ছিল (৮)। এই প্রথা exogamy (স্বগোত্রের বাহিরে বিবাহ) প্রথার সহিত সংশ্লিষ্ট (৯)। বিবাহের ক্রিয়াকর্ম্মাদি সম্পর্কে তিনি বলেন, "সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, পাণিগ্রহণ মন্ত্র, সপ্তপদী গমন, বিবাহকালে বর-কন্যার মস্তকে লাজা বর্ষণ (১০) "বিবাহ,"(গৃহে প্রত্যাগমন) প্রভৃতি কতকাংশে ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির অতি আদিমকাল (বিভিন্ন আর্য্যভাষীদের অবিভাজ্য অবস্থা) প্রসূত এবং উহা এখনও প্রচলিত (১১) আছে। অধুনা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের উন্নততর দেশসমূহের মধ্যে free-choice marriage (তরুণ-তরুণীর স্বয়ং পছন্দ করিয়া বিবাহ) বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতেও হাল-ফ্যাসানের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে (১২)।

৮। হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির সহিত অন্যান্য প্রথার তুলনা সম্পর্কে Durgun —Mutterrecht und Raubehe; L. v. Schrader—Hochzeits Gebraueche; Schrader—Sprachvergleichung und Urgeschichte; Kluchevesky—History of Russsia, দ্রষ্টব্য।

৯। Jolly—Op. cit P. 50,

১০। আমেরিকায় নব-বিবাহিত বর ও বধূর মস্তকে মুড়ি ছড়াইয়া দেওয়া হয়। লেখকের প্রশ্নে আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক W. I. Thomas বলেন, এই প্রথা তাঁহারা ভারত হইতে পাইয়াছেন। ইংলণ্ডে confete বর্ষণ করা হয়। প্রাচীনকালে তথায় মুড়ীর অভাব ছিল বোধ হয়।

১১। Jolly—Op. cit, Pp, 53—54,

১২। বিশাল ভারত (হিন্দি) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, "কুল, গোষ্ঠী আউর রাষ্ট্রীয়তা', মে, ১৯৪২; দেশ—'পরিবার, কুল ও একজাতিত্ব' ১৯৪২, পৃঃ ৯৬, ৯৮, ১১১ ১১৪।

ইউরোপে বিবাহের বর্ত্তমান সাংসারিক পরিণতি হইতেছে 'single family' (এক পরিবার)। ইহার অর্থ, যুবক বিবাহের পর পৃথক সংসার স্থাপন করে। ভারতে এখনও এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সর্ব্বজনীন হয় নাই। পুরাতন যৌথ-পরিবার-প্রথা (Joint-family system) এখনও প্রচলিত আছে, যদিও তাহা নানাভাবেই ভাঙ্গিতেছে।

হিন্দু রমণীর বিবাহের পর স্বামীগৃহে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইত এবং তাহাকে কি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিতে হইত, তাহা বৈদিক যুগের সমাজ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের স্মৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়-বস্তু। বিষ্ণুসংহিতা (৩।৯) বলিতেছে, স্ত্রীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ক্লীব নিযুক্ত করিবে। পুনঃ রাজ অন্তঃপুরে উষ্ণীষধারী ক্লীবের বিচরণ করিবার, অর্থাৎ পাহারা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে (কাম, ৭ সা।৪১)। সংস্কৃত নাটকসমূহে 'রাজাবরোধ' ও প্রহরী দ্বারা তাহার পাহারা দেওয়ার (ভাসের 'অবিমারক' দ্রষ্টব্য) প্রথার উল্লেখ আছে। মাঘের 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যে (৫।১৭) "সবিদল্ল" নামক কঞ্চুকীজাতীয় প্রহরীদের উল্লেখ আছে। আর মুসলমানযুগে চৈতন্য-ভক্ত উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের অন্তঃপুরেও "সৌরিদল্ল" নামক খোজার কথা সাহিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় :

সৌরিদল্ল আসিলা রাজাস্থানে

*   *   *   *

খোজা কহে দেবী সব পাঠাইলা মোরে"।

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ; বাঙ্গলা, ১০ম অঙ্ক)

হিন্দুর সামন্তযুগে রাজ-অন্তঃপুরে খোজা বা অন্য প্রকারের প্রহরী থাকিত ; স্ত্রীলোকদের তথায় অবরোধের মধ্যে থাকিতে হইত। 'ক্লীব, কুব্জ, বামন ও স্ত্রীলোক,' এইসব লইয়াই যে রাজ-অন্তঃপুর হইত তাহার প্রমাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই রাজাবরোধ মধ্যে নানা প্রকারের প্রেমের ও রাজনীতির

ষড়যন্ত্রও যে সংঘটিত হইত তাহার প্রমাণ সাহিত্য এবং কৌটিল্যের পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্ব-রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী 'কন্‌ষ্টান্টিনোপাল্‌' এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঞ্চুদের রাজধানী 'পেকিং' পর্য্যন্ত প্রাচ্য সম্রাটদের হারেমের মধ্যে যেসব ব্যবস্থা ছিল এবং লীলা ও কাণ্ড সংঘটিত হইত, সামন্ততান্ত্রিকযুগের হিন্দুরাজাদের রাজাবরোধেও যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না তাহা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠেই অবগত হওয়া যায়। বঙ্কিমবাবুর রাজসিংহের হারেমের চিত্রে ভাসের 'অবিমারকে'র রাজাবরোধের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। সত্যের খাতিরে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্যান্য প্রাচ্য রাজাদের অন্তঃপুরের জীবন হইতে হিন্দুরাজাদের অন্তঃপুর জীবন পৃথক ছিল না।

এই প্রসঙ্গে কথা উঠিতে পারে যে তৎকালে হিন্দু রমণীর অবগুণ্ঠন ছিল কি না? ঋগ্বেদে ইহার কোন চিহ্ন নাই কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাটকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সামন্তযুগে 'অবগুণ্ঠন' কুলবতী রমণীর চিহ্ন ছিল (মৃচ্ছকটিক নাটক—বারনারী বসন্তসেনা রাজার নিকট হইতে অবগুণ্ঠন পাইয়া চারুদত্তের স্ত্রী হয়)।

হিন্দু-বিবাহের শেষ কথা এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষীদের বিবাহ-প্রথার মধ্যে একটা খুব বড় ব্যবধান বিদ্যমান রহিয়াছে—ইহা হইতেছে দক্ষিণের cross-cousin marriage, অর্থাৎ বর তাহার মাতুল-কন্যা অথবা পিতৃষ্বসার কন্যাকে বিবাহ করে। কিন্তু উত্তরে স্মৃতিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথায় এই প্রকারের বিবাহকে incest বলা হয়। বৌধায়ন স্মৃতিতে (প্রশ্ন ১) এইজন্য "দক্ষিণে মাতুলকন্যা বিবাহ" প্রচলিত বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং মনুও ইহা নিষেধ করিয়াছেন (১১।১৭২); শুক্রনীতিতেও এই রীতি সম্পর্কে কটাক্ষ করা হইয়াছে। অথচ শাক্যদের ভিতরে, অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহে, কবি ভাসের 'অবিমারক' নাটকে এবম্প্রকারের বিবাহের উল্লেখ আছে। আবার ঋগ্বেদেও এবম্প্রকারের বিবাহের আভাষ আছে (১৩) (যেমন, একজনের মাতুলকন্যা কিম্বা পিতৃষ্বসার কন্যা তাহার প্রাপ্য); যাহা হউক, দক্ষিণে এই

১৩। Quoted by Sastri, P 11, Sloka 9, P. 101

প্রথা ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রের মধ্যে পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে এবং তদনুযায়ী স্মৃতির ব্যবস্থাও তাহাদের মধ্যে আছে (১৪)। আবার উড়িষ্যার খোন্দজাতির মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। লেখক বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর রাজ-গোষ্ঠীর সমাজে এই যুগে এই প্রকারের একটি বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন। পশ্চিম-বঙ্গে ও ছোটনাগপুরের ক্ষত্রিয় ভূস্বামীদের মধ্যে এই প্রকারের বিবাহ-প্রথা আছে (Shastri, P. 126)।

নরতাত্ত্বিকেরা বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে cross-cousin marriage প্রচলিত আছে। তাঁহাদের মতে ইহা exogamy-প্রসূত বিবাহ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের অতি নিম্নাবস্থা। কিন্তু এই প্রথা ভারতে, বিশেষতঃ, আজ দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যে আবদ্ধ।

এক্ষণে হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির সঙ্গে বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-স্বামিত্বের প্রশ্ন উঠে। প্রথমোক্তটি ঋগ্বেদের সময় হইতে সমাজে প্রচলিত আছে (১০।৩৩।২) যদিও সাধারণতঃ হিন্দু এক-পত্নীগ্রাহী। অন্যপক্ষে, দ্বিতীয়টি তর্কের স্থল। মহাভারতের দ্রৌপদীর বিবাহের গল্প লইয়া আজ পর্য্যন্ত কত বিতর্ক চলিতেছে! বেদে ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা বলেন, এই প্রথা অনেক হিন্দুজাতির মধ্যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এবং আজও তাহা আছে। শুক্রনীতিতে মধ্যদেশের শিল্পী, কর্ম্মকার জাতিদের "গবাচিন" (polyandry) প্রথা (Ch IV, p. 97) ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এক্ষণে হিমালয়ের তিব্বতীয় জাতির পাহাড়ীদের মধ্যে (পঞ্জাব পর্ব্বত, কুমাউনের সর্ব্ববর্ণের হিন্দু) দ্রৌপদীর বিবাহের ন্যায় (১৫) এবং মালাবারের নায়ার, (১৬) তিয়া, ভেল্লালা জাতিসমূহের মধ্যে বহুস্বামিত্ব-প্রথা আছে। ভারতের

১৪। Annanta Ayer—Mysore Caste & Tribes. "ভাট-কৌস্তুভ" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৫। Jolly—Recht und Sitte, P48.

১৬। শিক্ষিত নায়ারেরা বলেন, আজকাল এই প্রথা অন্তর্হিত হইয়াছে।

বাহিরে বহুস্বামিত্ব প্রাচীন স্পার্টান্, ইণ্ডো-জার্ম্মান এবং ইসলামের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল (১৭)।

তৎপর নিয়োগ (levirate, উশনঃ, ৫।৮৯-৯০) এবং দেবরকে বিবাহ (junior levirate) প্রথা (গৌতম, ১৮) এবং তদভাবে সপিণ্ড দ্বারা পুত্রোৎপাদন প্রথা (যাজ্ঞবল্ক্য, ১।৬৮-৬৯) প্রাচীন ভারতে ছিল। ঋগ্বেদে দেবর-বিবাহের প্রথার ইঙ্গিত আছে (১০।৪০।২)। দেবরকে বিবাহ করা উড়িষ্যার শূদ্রদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায়। উত্তর-ভারতের একটি প্রবল জাতির মধ্যে দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর সহিত সংসার করার ন্যায় অবৈধভাবে দেবরদের সহিত যৌন সম্বন্ধে বাস করার প্রথা লুক্কায়িতভাবে প্রচলিত আছে বলিয়া একটি অপবাদ আছে! এইজন্য ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ঘৃণা করেন। কোন কোন স্থলে ইহা স্ত্রীলোকের অভাব হইলেই সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রকারেব বহু-স্বামিত্বেব পশ্চাতে থাকে একটি অর্থনৈতিক কারণ, যেখানে এই সব কারণ অপসৃত হইতেছে সেইস্থলে উক্ত প্রথাও অন্তর্হিত হইতেছে।

বিবাহের পর কি সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে হিন্দু নব-দম্পতি বাস করিত এবং এখনও করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে এখন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। আমেরিকান সমাজতত্ত্ববিদ্গণ দুই প্রকারের রীতির সমাজ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন : (ক) closed society (অর্গলাবদ্ধ সমাজ) ; (খ) open society (মুক্ত সমাজ)। তাঁহারা প্রাচ্য সমাজকে প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত বলেন।

১৭। "Die Frau in der Kulturgeschichte". P. 113 quoted by J. J. Meyer—op. cit. Vol I, Pp. 170-171f ; Edward Meyer —Geschichte, des Altertumes, 1. I. I, P. 26f. Quoted by J. J. Meyer, Vol. I. p119 ; Dargun—Mutterrecht und Raubehe, Ch. III, P. 45 ; Robertson Smith—Kinship and marriage in Early Arabia.

অবশ্য ইউরোপের প্রাচীন দেশগুলির সমাজও এই পদ্ধতির মধ্যে পড়ে, যদিও তাহারাও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এমতাবস্থায় আগন্তুক অথবা নূতন বন্ধু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলে একেবারে সে অন্তঃপুরে আনীত হয় না; তাহার সহিত বন্ধুত্ব বহির্বাটীতেই গণ্ডীভূত থাকে। দ্বিতীয় প্রকারটি আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের (United States) নূতন সমাজ। এই সমাজে কোন অতিথি অথবা নূতন বন্ধু গৃহস্থের বাড়ীতে আসিলে তাহাকে অন্দর মহলে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ গৃহকর্ত্তা তাঁহার স্ত্রী-পুত্রদের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। তিনি আত্মীয়ের ন্যায়ই বাড়ীর সকলের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে পারেন। এইজন্য আমেরিকার গৃহে বাহির মহল ও অন্দর মহল নাই। ইউরোপেও তাহা নাই কিন্তু কার্য্যতঃ কমবেশী আছে। ভারতের সমাজ চিরকালই প্রথমোক্ত প্রকারের। বৈদিকযুগের 'বহির্সদনম্' হইতে আজকালকার 'বৈঠকখানা' পর্য্যন্ত এই প্রথারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অতিথি বা নূতন বন্ধু পরিবারের সহিত মিশিতে পারে না। তবে হাল ফ্যাসানের ইউরোপীয় ভাবাপন্ন বাড়ীতে নূতন প্রথা অবলম্বিত হয়।

হিন্দুর সমাজ অধিকাংশ স্থলে এখনও গোষ্ঠীগত কম্যুনিজম্ (family communism) বিবর্ত্তনের স্তরে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারই শেষ চিহ্ন যৌথ-পরিবার (joint-family system) এবং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে (অপ্রতিবন্ধ দায়) গোষ্ঠীগত অধিকার। কিন্তু বাঙ্গালায় দায়াধিকার বিষয় পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতার ব্যক্তিগত অধিকার (individual right in property) প্রথা বিবর্ত্তিত হইয়াছে (১৮)। এইরূপ কথিত হয় যে, এই প্রথা আইন সম্পর্কে আরও অগ্রসর অবস্থা।

১৮। D. F. Mulla—Principles of Hindu Law, 3rd Edn. Pp.; 191-192.

১৪ দশকর্ম্মপদ্ধতি

হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবনে কতকগুলি আবশ্যকরণীয় ক্রিয়া আছে। তাহাকে 'দশকর্ম্মক্রিয়াসমূহ' বলা হয়। হিন্দুর জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, যথা: নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, গর্ভাধান সংস্কার, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ। এই ক্রিয়াগুলির সংখ্যা বিবিধ পুস্তকে বিভিন্নরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নানা আবর্ত্তনের পর উহা দশটি গৃহকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু তাহাও বর্ত্তমানে দ্বিজের পক্ষে চারিটি এবং শূদ্রের পক্ষে তিনটিতে ঠেকিয়াছে। যথা: ব্রাহ্মণের (অন্ততঃ বাঙ্গালায়) উপনয়নের সঙ্গে তাহার কর্ণভেদ এবং চূড়াকরণ ও সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু শূদ্রের বিবাহ সময়ে কর্ণভেদ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই ক্রিয়াগুলিকে 'আত্মসংস্কার' বলা হয়; কারণ নিজের সংস্কারের জন্যই ইহার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুর ইহা করণীয়, ইহা হিন্দুর সদাচারের ভিত্তি। এই সংস্কারগুলি নিয়াই বৈদিক আর্য্য-ভাষীদের সন্তানেরা অপর হইতে নিজেদের চিরদিন পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। একসময়ে বৌদ্ধেরাও ইহার অনুকরণে নিজেদের কতকগুলি সংস্কার পালন করিতেন বলিয়া কথিত হয়। আজ বর্ণাশ্রমের বাহিরের অনেক সাম্প্রদায়িক হিন্দু-মণ্ডলীও এই সংস্কারের কতকগুলি ভিন্ন প্রকারে পালন করেন। এই সংস্কারগুলি ভারতীয় আর্য্য এবং তাহার বর্ত্তমানের সন্ততি হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া দাবী করা হয়।

এই আত্ম-সংস্কারগুলি বোধহয় বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (১০।৮৫) সূর্য্যার বিবাহ কালে যেসব ঋক্‌প্রয়োগের বর্ণনা আছে, আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের বিবাহে তাহার প্রয়োগ হয়। আশ্বলায়ন তাহার গৃহসূত্রে বলিতেছেন: বিভিন্ন জনপদে এবং বিভিন্ন গ্রামে নানাপ্রকারের আচার-পদ্ধতি (customs) প্রচলিত আছে যাহা বিবাহকালে অনুসৃত হয়। তন্মধ্যে যেসব সাধারণভাবে গৃহীত হয়, তাহা আমরা বলিতেছি,

(১।৭।১-২)। এতদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, প্রাচীন বৈদিক এবং তৎপরবর্ত্তী কালের আর্য্য-ভাষী কৌমগুলির মধ্যে আত্ম-সংস্কারগুলি একপ্রকারের ছিল না, বিভিন্ন সূত্র গ্রন্থই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।। গৌতম-সূত্রে এই ক্রিয়াগুলির সংখ্যা চতুর্দ্দশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সঙ্গে 'অন্ত্যেষ্ঠীকরণ' অর্থাৎ মৃত শরীরেও একটি সংস্কারের উল্লেখ আছে। এইটি নিয়া সর্ব্বসুদ্ধ সংস্কারের সংখ্যা পঞ্চদশ হয়। আবার কাত্যায়ণসূত্রে এবং গোভিল গৃহ্যসূত্রে অন্নপ্রাশনের পূর্ব্বে নিষ্ক্রামণ নামক একটি সংস্কারের বিধান আছে; তাহা নিয়া সর্ব্বসুদ্ধ ষোড়শ সংস্কারই ভারতীয় আর্য্য-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তাহা নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের 'দশকর্ম্ম' সংস্কারে পরিণত হয়। ইহা বর্ত্তমানে বস্তুতঃ জাতিবিশেষে চারিটি এবং তিনটি সংস্কার-ক্রিয়ায় আবদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমানের বাঙ্গালার নব-ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরোহিত-তন্ত্র বলে যে এই বৈদিক ক্রিয়াগুলি কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষেই প্রযোজ্য। কিন্তু গৃহ্য-সূত্রসমূহে এই বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ নাই। তাহাতে অবশ্য শূদ্রের উপনয়নের ব্যবস্থা নাই। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সংস্কারগুলি ভারতের সর্ব্বত্রই শূদ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্য এই দাবী অজ্ঞতা-বিজড়িত শ্রেণী-স্বার্থপ্রসূত কথা মাত্র। পুরোহিতের মুখেই শ্রবণ করা যায় যে পূর্ব্বে কায়স্থাদিরও বিবাহে যথাবিধি হোম-কর্ম্ম (ব্রাহ্মণের 'কুশণ্ডিকা') করা হইত। এক্ষণে উপবীত-ধারী শূদ্রবংশীয় লোকেরা তাহার পুনঃ প্রচলন করিতেছেন। এই বিষয়ে "হিন্দু সৎকর্ম্মমালা' বলিতেছেন, "বিবাহ-সংস্কারে কোন কোন সৎ-শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ দ্বারা কর্ম্মাঙ্গ হোমও করাইয়া থাকেন" (৯ম ভাগ, পৃ, ৮১)।

অন্যপক্ষে, উদার পুরোহিতদের নিকট হইতে শ্রবণ করা যায় যে, দশকর্ম্ম সমস্ত হিন্দুর পক্ষে প্রযোজ্য, কেবল তাহাদের ক্রিয়ায় বৈদিকমন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ। পূর্ণ হোম ("কুশণ্ডিকা") সর্ব্বপ্রকারের হিন্দুর বিবাহে অবশ্য-করণীয়। যদি শূদ্র যজমান চাপিয়া ধরেন, তাহা হইলে তাঁহার পুরোহিত সেই

কর্ম্ম সম্পাদন করিতে বাধ্য একথা উদার পুরোহিতেরা স্বীকার করেন। এইস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে হোমদ্বারা বিবাহ সম্পাদিত না হইলে, হিন্দুর সেই বিবাহ সিদ্ধ নয়। হিন্দুর বৈধ-বিবাহে রোমীর বৈধ (Conferretis) বিবাহের ন্যায় অগ্নিসাক্ষী প্রয়োজন। পুরোহিততন্ত্র নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য শূদ্রের বিবাহে পূর্ণ হোম ক্রিয়া করে না। আবার দশকর্ম্মের যেগুলি শূদ্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠান (নান্দীমূখ ক্রিয়া, শালগ্রামপূজা প্রভৃতি) সম্পূর্ণভাবেই পুরোহিতদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিষয় হিন্দুর সৎকর্ম্মমালার গ্রন্থকারদের উক্তি বাস্তব তথ্য নহে।

এই সংস্কারগুলি যখন ভারতীয় আর্য্যের অনুষ্ঠিত সাধারণ আচার তখন ইহা ব্রাহ্মণের বা দ্বিজবর্ণত্রয়ের একচেটিয়া সংস্কার বলার দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা প্রতীত হয় যে, বৌদ্ধযুগ এবং তৎপরবর্ত্তী কালের তন্ত্র-যুগে এই সংস্কারগুলির অনেকাংশ অপ্রচলিত হইয়া যায়। বাঙ্গালাতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বিষয়ে প্রবাদই আছে, "পৈতা ছাড়িয়া পৈতা নেয় বৈদিক দেয় পাতি'। আবার হলায়ুধের "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক হইয়া গিয়াছিলেন। আবার বল্লালচরিতে উক্ত আছে, রাজা বল্লাল বৈদিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বংশবিশুদ্ধতার পরীক্ষার জন্য তাহাদের বংশাবলীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের পুনঃ 'ব্রাহ্মণত্ব' ও 'ক্ষত্রিয়ত্ব' প্রদান করেন। এতদ্বারাই প্রতীত হয় যে পূর্ব্বে, বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড লোপের সঙ্গে গৃহ্য-সূত্রীয় সংস্কারগুলিরও অনেকাংশে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। হয়ত, সাধারণের মধ্যে কেবল জন্ম, বিবাহ ও মৃতের শ্রাদ্ধ এই তিনটি সংস্কার প্রচলিত ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম নূতনভাবে প্রচলিত হইবার সময়ে এই নব ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরোহিত-তন্ত্র এই নূতন দাবী উপস্থিত করেন। ইহার ফলে, বাঙ্গালায় অব্রাহ্মণেরা বৈদিক সংস্কারগুলির অনেকাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

জাতি-তাত্ত্বিক ও সমাজ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই সংস্কারগুলির দান অতি মূল্যবান। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, প্রাচীন আর্য্য-ভাষী ভারতীয়দের মধ্যে এই ক্রিয়াগুলি প্রচলিত ছিল। ইহাকে আমরা কৌমগতরীতি (Tribal mores) বলিয়া অভিহিত করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুর বিবাহাদি অনুষ্ঠানের অনেক ক্রিয়া প্রাচীন অ-ভারতীয় আর্য্য-ভাষীদের সহিত কতক মিল আছে। বিবাহের সময়ে ইংলণ্ডে বর বধূর গাত্রে confete এবং আমেরিকায় Puffed rice (মুড়ি) বর্ষণ হিন্দুর লাজ-বর্ষণ প্রথার স্থান গ্রহণ করে (Homologue)। এইরূপ, পুত্র সন্তান হইলে ভোজ, বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation day (আমেরিকায় Commencement day) হিন্দুর সমাবর্ত্তনের অনুরূপ। সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রথানুযায়ী মৃত দেহের ধৌতকরণ এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করান ও ধর্ম্মক্রিয়ার সহিত মৃতশরীরের শেষগতি করা, হিন্দুর অন্ত্যেষ্ঠীকরণের অনুরূপ পুনরায়, মৃত্যুর পর, প্রাচীন কালের কৌমদের রীতি অনুযায়ী tribal feast এবং সেদিন পর্য্যন্ত স্কটলণ্ডের হাইলাণ্ডার জাতির এই উপলক্ষে clan-feast হিন্দুর শ্রাদ্ধের অনুরূপ। তৎপর, প্রাচীন জাতিদের মৃত-পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে খাদ্যপ্রদানকরা (offerings to the manes of the ancestors) হিন্দুর পিতৃ-তর্পণ ও শ্রাদ্ধে পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে আহারাদি প্রদান করার অনুরূপ। আবার হিন্দুর 'কর্ণভেদ' ক্রিয়া, ইহুদির সুন্নৎ (circumcision) এবং আফ্রিকার কতিপয় আদিম জাতির উদ্ভিন্নযৌবন বালকের গাল চিরিয়া দুইটা দাগ করিয়া দেওয়ার অনুরূপ ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয়। শেষের কথা, দ্বিজের উপনয়নের অনুরূপ ক্রিয়া অষ্ট্রেলিয়ার অনার্য্য আদিম অধিবাসীরা tooth breaking ceremony অর্থাৎ একজনের যৌবনপ্রাপ্তি হইলে পুরোহিতের দ্বারা ধর্ম্মক্রিয়ার সহিত তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দেওয়া পদ্ধতির সহিত সমক্রিয়াবোধক (analogue), এতদ্বারা সে 'যুবক' পদে উপনীত হয়। এই প্রকারে আমেরিকার Peublo Indians নামক কৌমটির যুবকাবস্থা-প্রাপ্তি সংস্কারটি হিন্দুদ্বিজের উপনয়ন সংস্কারের

অনুরূপ (১)। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় পারশীক জারতুষ্ট্রীয় ধর্ম্মাবলম্বীদের উপনয়নের অনুরূপ একটি সংস্কার আছে। তাহারাও একখণ্ড সাদা কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখেন।

এতদ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হয়,—পরের যুগের শাস্ত্রকারেরা যতই এই সব সংস্কারকে ধর্ম্মের আবরণ প্রদান করে, স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া বর্ণনা করুক গৌতম (৮।২৪-২৫) এই আত্ম-সংস্কারগুলি অতি দূর দিনের অখণ্ড ইণ্ডো-ইউরোপীয় আচারের (tribal customs) স্মৃতি আজও বহন করিয়া আমাদের ঘাড়ে অবশ্যকরণীয় ধর্ম্মাচার ও সদাচার বলিয়া চাপিয়া আছে। আসলে এইগুলি প্রাচীন কৌমগত আচার ছিল। এই কৌমগত আচার ভারতীয় আর্য্যদের কৌমাবস্থায় ছিল। তাহাদের পুরোহিতবর্গ এইগুলিকে অবশ্যকরণীয় সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়া আর্য্যত্বের চিহ্নরূপে তদুপরি ধর্ম্মের ছাপ দেয়। বর্ত্তমানে এই সংস্কারগুলির কতকাংশ পুরোহিতবর্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা তাহাদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের এবং শ্রেণী-গরিমার প্রতীক হইয়াছ।

১৬। হিন্দু আইনের ভিত্তি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখা যায় যে, মানবজাতিসমূহের কৌমাবস্থার প্রথম যুগে কতগুলি রীতি ও রেওয়াজ উদ্ভূত হয়। পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদানের জন্য কতকগুলি রীতি ও ব্যবহার সৃষ্ট হয়। এইগুলিই পরে কৌমগত রীতি ও আইন বলিয়া গণ্য হয়। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন (rule) দ্বারা জীবনের পরিচালনাকে 'রীতি' বা রেওয়াজ বলে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থনীতিক আদান-প্রদানের

১। লেখকের আমেরিকায় অবস্থানকালে সমাজতত্ত্বের একজন ভারতীয় ছাত্র বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণের সন্তান, Peublo Indianদের উপরোক্ত সংস্কারের সহিত ব্রাহ্মণ-কুমারের উপনয়ন-সংস্কারের ক্রিয়ার মিল পাঠ করে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে গেছলুম!

নিয়মকে 'ব্যবহার' বা 'আইন' বলা হয়। মানুষ যখন পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আদান-প্রদানের জন্য ঐক্য বা সমান নিয়ম গ্রহণ করে, তদ্দ্বারা একটা আদান-প্রদানের নিয়ম বা আইনও সৃষ্ট হয় (১)। ইহাই হইতেছে সাধারণ জাতিতাত্ত্বিক নিয়ম এবং এই তথ্য হইতে দেখা যায় যে, প্রচীন আর্য্যদের মধ্যে কতকগুলি রীতি ও ব্যবহার উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহাদের কৌমগত রীতিকে "লোকাচার" (custom) বলা হইত এবং এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মগত রীতিও নীতি (ধর্ম্মশাস্ত্র) ছিল। আবার এখন দৃষ্ট হয় যে রাজকীয় আইন বা রাজনীতি সম্পর্কীয় আইনও (অর্থশাস্ত্র) ছিল।

বলা হয়, হিন্দুর আইন—শ্রুতি ও স্মৃতি-এবং সনাতন লোকাচারের উপর ভিত্তি করিয়া স্থাপিত (২)। হিন্দুরা বলেন, তাঁহাদের আইন ঈশ্বর-প্রদত্ত (divine origin) (৩)। এইজন্য রাষ্ট্র এই আইনের অধীন—যেহেতু রাজা এই ঈশ্বর-প্রদত্ত আইনের অনুসরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু রাজা বিচারকর্ত্তা বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহার অনুজ্ঞা মোকদ্দমাকারীদের নিকট শিরোধার্য্য হইত। এইজন্য পরবর্ত্তী টীকাকারগণ বলেন, কোন কোন বিষয়ে রাজকীয় অনুশাসন ঈশ্বরপ্রদত্ত আইনের ন্যায় বাধ্যতামূলক, যদি ইহা শেষোক্তের আপত্তিকর না হয় (৪)। রীতি (custom) ও আচার ব্যবহার (usages) হইল আইনের ভিত্তি এবং সেইগুলিকে ভারতের অ-লিখিত আইন (unwritten laws) বলা হয়। এইগুলি বেশীর ভাগ লোকের লোকাচার বলিয়া তাহাদের দেশের সাধারণ আইন (common

পারে (৫)। ৺গোলাপ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, ইহা সত্য যে হিন্দুযুগে রীতিকে আইনতঃ গ্রাহ্য করা হইত; এইজন্যই দায়াধিকার (Law of Inheritance) বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপার স্মৃতিতে সম্পূর্ণভাবে দেশগত (territorial) ছিল না (৬)

১। Max Schmidt, "VoelkerKunde", P. 232.

২। Golap Sastri—Hindu Law. P. 14; Molla—Hindu Law, Pp. 7-8.

৩-৬। Sastri—Hindu Law—P13; 13; 13-14; 14.

শাস্ত্রীজী বলেন, জীবনের আচরণ বিষয়ে রীতিসমূহ অ-লিখিত ঈশ্বর-প্রদত্ত আইন বলিয়া বিবেচিত হয়। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "সদাচার" আইনতঃ গ্রাহ্য। কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে শিষ্টাচার" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (৭)। অবশ্য অনেক প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিতের মতে এই 'সদাচার' বা 'শিষ্টাচার' আর্য্যাবর্ত্তের রীতিতে আবদ্ধ; আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে উক্ত আচার পণ্ডিত লোকদের আচারেই সীমাবদ্ধ। যদিচ ব্যবসায়ী, শিল্পী প্রভৃতিগণ তাঁহাদের রীতি দ্বারাই বাধ্য। কিন্তু অসৎ-রীতি (immoral customs) এই আইনের বহির্ভূত। এইজন্য এই বিষয়ে বর্ত্তমানের আদালতে গোলযোগ উপস্থিত হয় (৮)।

মীমাংসা-শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের মধ্যে রীতি ও আচার-ব্যবহারের আইনের রূপ-বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, রীতি স্মৃতির নিম্নে এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে স্মৃতিই বলবৎ হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানের আদালতের দরবারে রীতিকে স্মৃতি অপেক্ষা বলবৎ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে—যেহেতু "Under the Hindu system of law clear proof of usage will outweigh the written text of the law" (হিন্দু আইনে সুস্পষ্ট রীতি লিখিত আইন পুস্তকাপেক্ষা প্রবল) (৯)।

ইংরেজ-ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালতে রীতিকে (custom) আইনের চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। ঐখানে বলা হইয়াছে—একটা বিশিষ্ট গোষ্ঠী বা বিশিষ্ট জনপদে 'রীতি' অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা আইনের মর্য্যাদা ও শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (১০)। রীতি (custom) সম্পর্কে জার্ম্মান আইনজ্ঞদেরও এই অভিমত (১১)। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, রীতির সংজ্ঞা হইতেছে, ইহা একটি নিয়ম যাহা একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী বা বিশিষ্ট লোকসমষ্টি বা বিশিষ্ট জনপদে বহুদিনের প্রচলনের দ্বারা আইনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (১২)। আবার রীতিকে (ক) স্থানীয়; (খ) শ্রেণীগত; (গ) গোষ্ঠীগত বলিয়া বিভক্ত করা হয় (১৩)।

৭। **Sastri—P. 25.**

৮-১৩। **Sastri—Pp 26-28.**

হিন্দু-আইনের উৎপত্তি ও উহার কার্য্যকারী শক্তি বিষয়ে বর্ত্তমানের আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের ও আদালতের ইহাই শেষ কথা। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। কারণ "আখিলউসের গোড়ালির পশ্চাতে ধাবমান কচ্ছপের ন্যায়" মোটা মোটা স্মৃতি পুস্তকসমূহ প্রতিনিয়ত হিন্দুর পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে।

ব্রাহ্মণ্য-পুরোহিততন্ত্র আজ পর্য্যন্ত দাবী করে যে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহই হইতেছে আইন, রাষ্ট্রের সকলে ইহা দ্বারা বাধ্য এবং পুরোহিতেরা এই আইনের হোতা। কিন্তু আজকালকার ঐতিহাসিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে "অর্থ-শাস্ত্র" নামক আর এক শ্রেণীর আইন-পুস্তক ছিল। অবশ্য ইহাও ব্রাহ্মণদের দ্বারাই লিখিত হইয়াছিল (১৪)। এইজন্য ইহার মধ্যেও শ্রেণী-লক্ষণ বিরাজ করিতেছে। এমন কি কৌটীল্য—যিনি শূদ্রদের রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে সুবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও ধর্ম্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের উপর কঠোর ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্বের দাবীও এই সকল পুস্তকে উত্থাপিত হইয়াছে।

এতদিন যাঁহারা কতকগুলি ব্রাহ্মণদের লিখিত 'ধর্ম্মশাস্ত্র' পাঠ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি ও আইনের শেষ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন, এক্ষণে কৌটীল্যের পুস্তক আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ভাবিয়া মাথা ঘামাইতেছেন যে হিন্দুর রাষ্ট্রীয় আইনটি কি ছিল? জলি বলেন, স্মৃতিসমূহ ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিজেদের ব্যবহারের জন্যই লিখিত হইয়াছিল এবং এইগুলিতে নিজেদের শ্রেণীগত দাবী স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মতে

১৪। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বৌদ্ধদের মধ্যে কেহ কেহ যে 'রাজনীতি' সম্পর্কে পুস্তক লিখিয়াছেন; গৌড়ের সম্রাট ধর্ম্মপালের জামাতা 'মন্থ রক্ষিত' তাহার প্রমাণ। তাঁহার পুস্তকগুলি তিব্বতীয় "তান্‌যুর"-এ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেইগুলি আবিষ্কৃত ও অনূদিত হইলে অধিকতর কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হইবে। এতদ্বারা প্রাচীন ভারতের রাজনীতিদের অনেক নূতন সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে।

ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের নিয়ে একটি সুবিধাভোগী শ্রেণী, আর দেশের বেশীর ভাগ লোক যাহারা শূদ্র, তাহারা সমাজের এত নিম্নস্তরে অবস্থিত যে তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং আইনগত রীতির উল্লেখই প্রয়োজনীয় বলিয়া স্মৃতিকারেরা মনে করে নাই। পুনঃ স্থানীয় রীতি এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদলের মতভেদের ফলে স্মৃতিসমূহে মতভেদ আছে। আবার জলি বলিয়াছেন ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবেনা যে, স্মৃতিগুলি ব্যক্তিগত লিখিত পুস্তক; সেইজন্য অন্যান্য দেশের আইন পুস্তকের পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে না। (১৫)।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 'ধর্ম্মশাস্ত্র' ও 'অর্থশাস্ত্র' নামে দুই শ্রেণীর আইন-পুস্তকই ছিল। ইহাদের মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রীয়-আইন বলিয়া গ্রাহ্য হইত। তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া জয়শওয়াল বলিয়াছেন, "তাহা হইলে দেশের আসল civil and criminal laws কোথায় ছিল? এই সম্পর্কে লেখকের উত্তর এই, তাহা অর্থশাস্ত্রেই নিহিত ছিল (১৬)। তৎপর তিনি বলিতেছেন, "শূদ্রযুগে রাজার আইন ধর্ম্ম-আইন হইতে পৃথক ছিল। সেইগুলি অর্থশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যাইত...ধর্ম্ম-আইন (স্মৃতি) যথার্থ হিন্দু-আইন বা তাহার ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না...কেবল সর্ব্বপ্রথম মানবধর্ম্মশাস্ত্রকে অর্থ-আইনের স্থান দখল করিতে দেখা যায় এবং ইহাকে নিজের তাবেদার করিয়া নেয়। ইহার কারণ এই যে...পুরোহিততন্ত্র দেশের রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্টিত হয়" (১৭)। এক্ষণে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রই ভারতীয় আর্য্যরাষ্ট্রের আইন (code) ছিল এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-সাহিত্য ও অর্থশাস্ত্র-গুলির প্রমাণ মানিয়া নিয়াছে (১৮)।

কিন্তু হালের পণ্ডিতদের মধ্য হইতে এইরূপের মত উত্থাপিত হইয়াছে যে ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত

১৫। Jolly—Recht und sitte, P. 45.

১৬-১৮। "Manu and Jajnavalkya", Pp. 13,17,3.

হইলে প্রথমোক্তই বলবৎ হইবে (১৯)। কিন্তু ভবিষ্যপুরাণ নিয়া অনেক গোলমাল আছে; আর ব্রাহ্মণাধিপত্যের সময়েই পুরাণসমূহ লিখিত বা পুনঃসঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়; সেইজন্য ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

এই বিষয়ে উভয় দলের মত বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্য পাওয়া যায় যে, শাস্তি সম্পর্কে রাজকীয় আইন ব্যতীত "প্রায়শ্চিত্ত" নামে আরও একটি সামাজিক আইন ছিল (২০)। এই সামাজিক বিচার ও দণ্ড রাজাদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত "পরিষদ" পরিচালনা করিত (২১)। কিন্তু এই সামাজিক দণ্ড কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে; আর "মহাপাতক" বিষয়ে পরিষদের বিচারকালে রাজাকেই দণ্ডপ্রদান করিতে হইত (২২)। এতদ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, রাজার অনুজ্ঞাই চরম আইন ছিল। তাহাতে ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, রাষ্ট্রীয়-আইন (State or Civil Law) ধর্ম্ম বা পৌরহিত্য আইন (Priestly or Canon Law) অপেক্ষা উর্দ্ধে ও বলবৎ ছিল।

আবার এই বিষয়ে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ইউরোপের মধ্যযুগীয় গির্জ্জার আদালতের (Ecclesiastical Law Court-এর) ন্যায় ব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক আদালত ছিল না। "পরিষদ" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহাতে সামাজিক সমস্যাগুলি মীমাংসিত হইত, আর ইহা রাজার ক্ষমতার বাহিরেও থাকিত না। বোধ হয়, ইহা আজকালকার জাতি-পঞ্চায়েতের ন্যায় কার্য্য করিত।

১৯। সিতিকান্ত বাচস্পতি—"The Principles governing the administration of criminal law in ancient India" (in Bengali), P136.

২০। এই সম্বন্ধে Dr. B. N. Datta—"Authoritative Source of Hindu Law" in "Studies in Indian Social Polity" দ্রষ্টব্য।

২১-২২। বাচস্পতি—১২, ১৩, ১৪।

অতঃপর শুক্রনীতি ও বৃহস্পতিতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে রাজা ও তাহার কর্মচারীদের সহযোগিতায় আদালত সংগঠিত হইত (২৩)। এক্ষণে কথা উঠে, বিচারকালে রাজা কোন্ আইন দ্বারা পরিচালিত হইত। এই বিষয়ে মতভেদ আছে। জলি বলেন, রাজা, মন্ত্রী বা কোন ধর্ম্মমন্ত্রী আইনের সম্পর্কে কোন পুস্তক লিখিলে তাহাই সেই রাষ্ট্রের আইন বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইত। এইজন্য তিনি বলেন, যেসব স্মৃতি আজকাল প্রচলিত আছে তাহা হিন্দুদের গ্রাহ্য আইন পুস্তক নহে (২৪)। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উদার পুস্তক "পরাশর সংহিতা" ব্রাহ্মণদের মতে কলিযুগে গ্রাহ্য নয়!

কিন্তু ভবিষ্যপুরাণ ও ব্রাহ্মণদের দাবীর বিপক্ষে শুক্রনীতি বলিতেছে, "রাজা শাস্ত্রে অ-লিখিত এবং জাতি, গ্রাম, সংঘ ও গোষ্ঠী মধ্যে প্রচলিত রীতিগুলি ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য সমাধান করিবে (৪-৫।৮৯—৯১)(২৫)। যেসব রীতি দেশ, জাতি, (caste) বা মূলজাতি (race) মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে সেগুলি অটুট রাখিতে হইবে, নচেৎ লোক বিক্ষুব্ধ হয়" (৪,৫,৯২-৯৩) (২৬)। দেশের বিভিন্নাংশের বিভিন্ন রীতির প্রচলন সম্পর্কে ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে, "এই লোকগুলির কার্য্যের জন্য তাহাদের প্রতি প্রায়শ্চিত্ত ও শাস্তি-বিধান হইতে পারে না...যাহাদের রীতিগুলি জনশ্রুতি বা প্রথা (tradition) দ্বারা গৃহীত এবং তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের দ্বারা জীবনে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহারা এই রীতিগুলি অনুসরণ করে বলিয়া নিন্দনীয় হইবে না" (৪, ৫, ১০১)(২৭)।

এতদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয় আচার ও আইনের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে শুক্র 'রীতি'কেই শেষ আইন অর্থাৎ এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত

২৩। Sukraniti—translated by Prof B. K. Sarkar. শুক্রনীতি অপেক্ষাকৃত হালের। ক্যানের মতে বৃহস্পতি নারদের সমসাময়িক। তাঁহারা গুপ্তযুগের লোক বলিয়া অনুমিত হয়।

২৪। Jolly—P. 27-28

২৫-২৭। Sukraniti—Pp. 187-188.

বলিয়াছেন। নারদও এই প্রকার বলিয়াছেন (২৮); কাত্যায়নও বলিয়াছেন যে, বেদের ন্যায় রীতিগত আইনকে সম্মান করিতে হইবে (২৯)। বৌধায়নও উত্তর এবং দক্ষিণের কোন কোন ব্যাপারে পৃথক রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই সকল রীতি বিষয়ে প্রত্যেক দেশের নিয়মই বলবৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে" (১।১।২—৬)। কিন্তু বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী সময়ে গৌতম বলিয়াছেন, "কোন কোন দেশের কতকগুলি রীতি বৈদিক প্রথা ও স্মৃতির বিপক্ষতাচরণ করিলে গ্রাহ্য হইবে, এই বিধান অন্যায়" (৩০)। আপস্তম্বও এই প্রকারের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বহুপরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা কুমারিলভট্টও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া এই প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৩)। কিন্তু আইন সম্পর্কিত শেষ পুস্তক শুক্রনীতির মতামত ইতিপূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই বোধগম্য হয় যে, গুপ্তযুগে ও তৎপরবর্ত্তী যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাধান্যকালে যখন বিভিন্ন কৌমগুলি আর্য্যীভূত হইতেছিল তখন তাহাদের রীতি ও আচার হিন্দু-আইনজ্ঞেরা স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যই বলিয়াছেন, "কোন দেশ বিজিত হইলে তত্রত্য আচার-ব্যবহার ও কুলস্থিতি তথৈব পরিপালন করিতে হইবে" (১, ৩৪৩)। তৎকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভিন্ন রীতি ও আচার স্বীয় সমাজশরীরে কুক্ষিগত করিতেছিল; এইজন্য "লোকাচার" বা "দেশাচার" হিন্দু-আইনে আজ পর্য্যন্ত বলবৎ। এই কারণ বশতঃ জলি বলিয়াছেন, "রীতিই হইতেছে হিন্দু-আইনের প্রথম ও প্রধান ভিত্তি।" রীতিকে বিশেষ স্থান প্রদান করায় যাঁহারা আইনের ইতিহাস নিয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভারতীয় রীতিগত আইনের (customary law) চিহ্ন (trace) এবং তাহা কি প্রকারে বাঁচিয়া আছে উহার মূল অনুসন্ধান করা।

২৮। Kane—History of Dharmasastras, P. 203.

২৯। Jolly—Hindu Law & Customs, tr. by B. K. Ghose, Pp. 3-4.

৩০। Kane—P.17 ; Jolly—Pp. 3-4.

ইহা বিশেষভাবে এই কারণেই প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণদের মত প্রকাশ করার একটা বাতিক (theorising tendency) এবং শ্রেণী-স্বার্থ তাহাদের আইন-বিষয়ক সাহিত্যকে এত অভিভূত করিয়াছে যে তাহাদের আইনের নিয়মগুলিকে সমালোচনা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না (৩১)।

এই আলোচনা হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, স্মৃতিগুলি ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-স্বার্থের পরিচায়ক পুস্তক মাত্র এবং এইগুলিতে উক্ত ব্যবস্থাসমূহ তাহাদের খেয়ালপ্রসূত ইচ্ছামাত্র। এইজন্যই এই পুস্তকগুলির মধ্যে এত বিসম্বাদী মত ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি যে আইনপুস্তক নহে তাহা বিভিন্ন রীতি ও আচার-ব্যবহার পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকা হইতেই ধরা পড়ে। যেমন, উত্তরে বৌধায়ন (প্রশ্ন—১, ২, ৩) ও বৃহস্পতি (২৯ শ্লো) মাতুল কন্যা ও পিতৃস্বসা পুত্রের বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণে ইহা আইন-সঙ্গত এবং ইহার সমর্থনে স্মৃতিও তথায় রহিয়াছে ; পুনঃ উত্তরের সাহিত্যেও এই প্রকারের বিবাহের নজীর আছে (মহাভারত—অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ এবং ভাস দ্রষ্টব্য)। মনু ব্রাহ্মণদের মৎস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন (১০।৯২). কিন্তু কূর্ম্মপুরাণে শল্ক (আইস্) যুক্ত মৎস্যদেবতা ও ব্রাহ্মণদের নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে (১৭।৩৭)। বাঙ্গলা, কাশ্মীর, বোম্বাই ও মিথিলার সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও উহা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে এইটি 'লোকাচার'রূপে গণ্য ; স্মৃতি ও পুরাণে পলাণ্ডু ও রসুন [মনু ৫।২০ ; এই গ্রন্থে 'গাজর'ভক্ষণও নিষিদ্ধ এবং কূর্ম্ম (১৭।২০) ; এই সঙ্গে "শুক্ত"ও নিষিদ্ধ হইয়াছে] ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; কিন্তু ভারতের সকল জায়গায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে (জনকতক গোঁড়া ব্যতীত) তাহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রদের উপবীত গ্রহণ নিষিদ্ধ ; কিন্তু আলবেরুণী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে শূদ্রদের শণ (linen) সুতার যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন : The Sudra is like a servant to the Brahmin ...he still desires not to be

৩১। Jolly—Op. cit. Pp. 3-4.

without a Yajnopavita, he girds himself only with the linen one. (Ch. LXIV) (৩২)। মনুতেই একস্থলে ব্রাহ্মণদের চাতুর্ব্বর্ণের-বিবাহের ব্যবস্থা আছে, আবার অন্যত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে ; একস্থলে মাংস খাওয়া নিষেধ (১০।৯২) করা হইয়াছে, আবার অন্যত্র যজ্ঞের মাংস ভোজনের বিধান আছে। পুনঃ বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অথচ মধ্যদেশের অনাচরণীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ ও তালাক প্রথা (divorce) প্রচলিত আছে এবং এই প্রথার উল্লেখ কৌটিল্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরূপে দেখা যায় যে, এই সকল ধর্ম্ম পুস্তকের অনুশাসনগুলি পুরোহিত-তন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত ইচ্ছামাত্র। ইহাতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার বড়াই মাত্র আছে। সমাজতত্ত্ববিদ্ সরোকিনের (৩৩) ভাষায় এই সব পুস্তককে Ideational অর্থাৎ তুলনামূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবিহীন বিশ্বাসগত একটা কাল্পনিক আদর্শমাত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

হিন্দুর ধর্ম্ম-আইন যে পুরোহিততন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণকল্পে খেয়ালপ্রসূত যুক্তি-বিহীন আদর্শমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট নজীর মধ্যযুগের স্মার্ত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন। প্রাচীন প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক অনেক সংস্কৃত পুস্তক ঘাঁটিয়া তাঁহার "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" লিখিত হয় এবং বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের উপর উহা প্রয়োগ করা হয় এবং তন্মধ্যে তিনি যেসব নূতন ব্যবস্থা হিন্দুর কলিযুগের ব্যবস্থা বলিয়া প্রদান করেন, তদ্বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করিয়াছিলেন যে তাহা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত বা অপ্রচলিত কিনা ? তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা তিনি কি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বর্ণ বিদ্যমান ? সেইকালে ভারতের সর্ব্বত্রই ক্ষত্রিয়বর্ণের দাবীদার জাতিসমূহ বিদ্যমান ছিল এবং অনেক রাষ্ট্রও তাহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত ; এমন কি তাঁহার পরে বাঙ্গলা প্রদেশে

৩২। Alberuni—tr. by Sachau, Vol II, P. 136 ; রাজপুতনায় টড ও ইহার প্রচলন দেখিয়াছিলেন (Rajasthan, Vol. I)

৩৩। Sorokin—Cultural & Social Dynamics.

লিখিত বিভিন্ন পুস্তকে বাঙ্গালী সমাজে "ব্রহ্মক্ষত্রী" এবং "রাজপুত্র" বা রাজপুত জাতিদের অস্তিত্বের কথা উল্লিখিত আছে। আবার পশ্চিমে বৈশ্যত্বের দাবী-দার জাতিসমূহও তৎকালে বিদ্যমান ছিল। বলা হইয়া থাকে যে, বাঙ্গলায় তৎকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সংস্কারবিহীন ছিল, কিন্তু তুলনামূলক অনুসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে অন্যত্র তৎকালে সেই প্রকারেরই আচার ছিল এবং আজও অনেকটা তদ্রূপই আছে। আজও পশ্চিম-ভারতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদের বংশধর বলিয়া দাবীদারদের অনেকেই উপবীত ধারণ করেন না, বৈশ্যদের মধ্যেও তদ্রূপ। বাঙ্গলার সাহিত্যে মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদেরও প্রয়োজনের সময়ে উপবীত ধারণ করিবার কথা উল্লেখ আছে (৩৪)! পুনঃ, রঘুনন্দনের সময়ে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণদের কতটা ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ছিল? নবদ্বীপে তখন কি শ্রুতি অনুযায়ী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিল? সিন্ধু ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণেরা মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্য আহার করেন বলিয়া শোনা যায়। সিন্ধুদেশের শূদ্রজাতিগুলিও উপবীত ধারণ করেন এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা বেনিয়াদের অনুকরণ করেন (৩৫)। আবার তিনি হিন্দুর বিধবাদের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু লেখক যতদূর

৩৪। দীনেশচন্দ্র সেন—বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ পৃঃ ৬৪। "ময়নামতীর গান ও গোরক্ষবিজয়"—ব্রাহ্মণদের গলায় উপবীত সর্ব্বদা থাকার কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না, অনেক সময়ে উহা বস্ত্রাদির ন্যায় টাঙ্গাইয়া রাখা হইত, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত ছিল,তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কোন কোন পরিবার যে উপবীত বিরহিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ সেদিনের প্রবাদবাক্যে রহিয়াছে: "পৈতা ছাড়ি পৈতা নেয় বৈদিকে দেয় পাতি।" এই উপলক্ষেই কি 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই'-রূপ প্রবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল?

৩৫। Hasting's Encyclopaedia, Vol. XI এবং ইহাতে W. Crooke's প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৭১।

অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, ইহা অন্যত্র প্রচলিত নাই। কেবল একদল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া তাঁহারা উহা আঁকড়াইয়া আছেন; কারণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা যায় যে, গোঁড়ামি বা প্রতিক্রিয়াশীলতা আভিজাত্য অহঙ্কারের লক্ষণ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু বাঙ্গলার অন্য জাতির বিধবারা মানেন না। তাঁহারা মৎস্যাদি আমিষ আহার করেন এবং নিরম্বু উপবাস করেন না। তাঁহারা রঘুনন্দনের ব্যবস্থার বাহিরের দল কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও আজকাল অনেকে মৎস্য ভক্ষণ বর্জ্জন করিতেছেন। বোধ হয়, তাঁহারা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণজাতীয় বিধবাদের অনুকরণ করেন, নচেৎ শেষোক্তদের সমাজে তাহাদিগকে নিন্দনীয় হইতে হয়। কিন্তু আসলে ইহা একটি দেশাচার মাত্র, ইহা পাপ বা দুষ্কৃতি নয়। রঘুনন্দনের Ideational খেয়াল সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুদের উপর কার্য্যকরী হয় নাই (৩৬)। ফলে এই খেয়ালগুলি হিন্দু বিধবাদের উপর দুর্ব্বিসহ ও পীড়াদায়ক হইয়া আছে (এই সঙ্গে বাঙ্গলায় রঘুনন্দনের "সতী-দাহ" ব্যবস্থারও উল্লেখ করা যায়)! এই সকল অতি উদ্ভট ব্যবস্থাগুলির ভিত্তি না আছে লোকাচারে, না আছে শ্রুতিশাস্ত্রে। এইজন্যই আজ রঘুনন্দনকে কেহ জালিয়াৎ বলিতেছেন, কেহ বা আবার মুসলমান শাসকের উৎকোচগ্রাহী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন ('হিন্দুমিশন' পত্রিকায় ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৩৬। 'বর্ণব্রাহ্মণ' সমাজভুক্ত অনেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় এবং ঘোষাল বংশীয় বিধবারা আমিষাদি খাদ্য বিষয়ে নিজেদের যজমান বিধবাদের আচার অনুকরণ করেন। যাঁহারা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং স্বকর্ণে শুনিয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতেই লেখক এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৬ হিন্দু-আইনের বিভাগ

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির মিতাক্ষরা টীকার দায়াধিকারতত্ত্ব বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানে আইনরূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু স্মৃতিসমূহ পরস্পর বিরোধী বলিয়া টীকা সৃষ্ট হইয়াছে। এইগুলিকে 'নিবন্ধ' বলা হয়। পুনঃ বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন টীকাকারদের মত গৃহীত হয়; এইজন্য হিন্দু-আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যাতার-দল (Schools of Law) সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে এই প্রকারের একটি ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে সেখানে ইহা লোকাচার" (usage) রূপে গণ্য হয় (১) সেইজন্য ইংরেজ-ভারতের আদালতে এইগুলিকে আইনরূপেই গণ্য করা হয়, কারণ হিন্দু-আইনে "লোকাচার" লিখিত-আইন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী (২)। এইরূপে দেখা যায় যে, হিন্দুর আইন মূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। "মিতাক্ষরাকে" প্রাচীনপন্থী (Orthodox school) আইন বলা হয়, আর যে 'দায়ভাগ'কে বাঙ্গলার আইন নামে অভিহিত করা হয়, তাহাকে সংস্কারদলীয় হিন্দু-আইন (Reformed School of Hindu Law) বলা হয়। "দায়াধিকার" ও যৌথ-পরিবারের যৌথ-সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে দায়-ভাগ মিতাক্ষরা হইতে পৃথক ব্যবস্থা প্রদান করে (৩)। কিন্তু যেস্থলে মিতাক্ষরার সহিত বাঙ্গলার দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব ও দায়াক্রম সংগ্রহের সংঘর্ষ নাই তথায় মিতাক্ষরাকে উচ্চতর প্রামাণিক আইন বলিয়া মানা হয় এবং যে-বিষয়ে মিতাক্ষরা কোন মত প্রকাশ করে না তথায় দায়ভাগ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

মিতাক্ষরা বানারসী, মিথিলা, মহারাষ্ট্র বা বম্বে দ্রাবিড়-স্কুল নামক ব্যাখ্যায় বিভক্ত (৪)। এস্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানেশ্বরকৃত মিতাক্ষরা

১। Mulla—Hindu Law. P 8.

২। Collector of Madura, V. Moottoo Ramalinga (1868) 12 M. I. A. 397, Pp. 435-436, Quoted in Mulla, P8.

৩। Sastri—op cit. P 22.

৪। Mulla—Hindu Law; P. 8-11.

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত হয়; মুল্লার মতে জিমূতবাহনের দায়ভাগ খৃষ্টীয় একাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হয় (৫)। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এঁড়ু মিশ্রের কারিকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলার রাজা বিষক্সেনের মন্ত্রী ও ধর্ম্মাধিকরণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। তিনি বলেন, (৬) এঁড়ু মিশ্র জিমূতবাহনকে বঙ্গে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের অন্যতম ভট্ট-নারায়ণের বংশের অধস্তন সপ্তম পুরুষের লোক বলিয়া গণনা করিয়াছেন এবং ৯৯৯ সংবতে ব্রাহ্মণদের উক্ত আগমন হয় বলিয়া এঁড়ু মিশ্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনানুসারে ৯৯৯ সম্বৎ = ৯৪২ খৃঃ, অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে ভট্টনারায়ণের উক্ত আগমন হয়, আর সপ্তম পুরুষে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষকাল হয়। কিন্তু জনশ্রুতির বিষক্সেনের নাম (বল্লালচরিতে উক্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়) বাঙ্গলার ইতিহাসে উল্লিখিত নাই; এমন কি, আইন-আকবরীতে সেন-রাজবংশের তালিকায়ও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না (৭)। এইসব কারণবশতঃ জিমূতবাহনের সঠিক তারিখ নির্দ্ধারিত হওয়া কঠিন। জলি বলেন, জিমূতবাহনের 'ধর্ম্মরত্ন' পুস্তক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হয় (৮)।

কিন্তু কেন এবং কি-প্রকারে বাঙ্গলায় 'দায়ভাগ' প্রচার হয় তাহা সমাজ-তত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। এতদ্বারা বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হইতে পারে। এইস্থলে

৫। Mulla—Hindu Law, P. 9.

৬। Sa tri—Op. cit P 37.

৭। আজকালকার ঐতিহাসিক সমালোচকেরা কারিকা ও গোষ্ঠীসম্বন্ধীয় পুঁথির প্রামাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন; সেইজন্য ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করিয়া তারিখ ও ঐতিহাসিক তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে অনিচ্ছুক।

৮। Jolly—tr. by B. K. Ghose, P 79; কানে বলেন, বুহ্লুক ভট্টে 'দায়ভাগ' পুস্তকের কোন উল্লেখ নাই (P 256-257)।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু-আইনের এই নূতন ব্যবস্থা মুসলমান আক্রমণের কম-বেশী সমসাময়িক। মুসলমান আইনের প্রভাব ইহার উপর, অন্ততঃ, দায়-ভাগের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা, তদ্বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন (শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, হিন্দুযুগের টীকাকারেরা বাস্তব আইনজ্ঞ ছিলেন, মুসলমান-যুগের টীকাকারেরা অর্থাৎ নিবন্ধকারেরা সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহাদের ন্যায়-বিচারের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি জাগতিক ও বাস্তব না হইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্কপূর্ণ ছিল। এইজন্য তাহারা পশ্চাদ্‌গমনশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা নিবন্ধ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৯)। এই শেষোক্তগুলি ব্রাহ্মণদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাল-করা উপকরণসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত (১০)।

এক্ষণে কথা, মুসলমান আইনের প্রভাব বর্ত্তমানযুগের হিন্দু-আইনে পাওয়া যায় কিনা? শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া শাসন করিয়াছিল, তথাপি ঐশ্লামীয় আইন হিন্দুর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কারণ উভয় আইনই ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত থাকায় পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট ও বিরুদ্ধ ছিল এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের ভাষা ও আইন অধ্যয়ন করে নাই। ইহা সত্য বটে যে, কায়স্থেরা শাসকদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল কিন্তু হিন্দুর আইন-চর্চ্চা ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া ছিল। এইজন্য হিন্দুর 'উইল ব্যবস্থা'র মধ্যে এই যুগের হিন্দু-আইনের কোন উল্লেখ নাই। হিন্দুর 'উইল'করণ প্রথা মুসলমান আইন হইতে নিঃসৃত হয় নাই; এই প্রথা ইংরেজশাসনের আমলে ইংরেজ আইনজীবীদের এবং ইংরেজ-শাসন আইনের (Regulations) দ্বারা সৃষ্ট (১১)। কিন্তু হিন্দুর বর্ত্তমান প্রচলিত লোকাচারসমূহ মধ্যে মুসলমান-কৃষ্টি

৯। এই প্রকারেই রঘুনন্দন ও হেমাদ্রী প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১০। Sastri—Hindu Law, P 37.

১১। Sastri—Pp. 819-8 1.

প্রতিফলিত হইয়া হিন্দুর 'লোকাচার' নিশ্চত আইনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কিনা তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন।

এক্ষণে কথা এই যে, কাহারা হিন্দুর আইন দ্বারা শাসিত? যে হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই, এই আইন তাহারই উপর প্রযোজ্য হইবে। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখগণের নিজেদের Civil Law না থাকায় হিন্দু-আইন দ্বারাই শাসিত। শিখদের বিবাহ-বিষয়ক আইন ভিন্ন। এইসব ব্যতীত নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণ, মুসলমানদের খোজা, মেমন, বোম্বাই-এর কাগাঠি, কচ্ছি-মেমন (যাহারা ইচ্ছা করিলে ১৯২১ খৃঃ Act No. XLVI আইনানুসারে মুসলমান আইন গ্রহণ করিতে পারে), অমৃতসরের ব্রাখানেরা, অমৃতসর জেলার সোধিক্ষেত্রী, পঞ্জাবের সাইগল ক্ষেত্রী, লাহোরের সারিন ক্ষেত্রী, রাওলপিণ্ডির কৌনত্রিলার ক্ষেত্রী, সিন্ধুর কচ্ছি-মেমন, আসামের কোচ, মোজাফরগড় জেলার কানগড়ের ভাটিয়া প্রভৃতিগণ দায় (inheritance), এবং উত্তরাধিকার (succession) বিষয়ে হিন্দু-আইন দ্বারাই শাসিত। এতদ্ব্যতীত 'ব্রাহ্ম'গণও হিন্দু-আইনের অন্তর্গত (১২)।

বর্ত্তমান ইংরেজশাসনের আইনানুসারে অন্য ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেহ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে অধিকারচ্যুত হইবে না। খৃষ্টান পিতার ঔরসে হিন্দু-মাতার গর্ভে অবৈধভাবে জাত পুত্রগণ হিন্দুভাবে বর্দ্ধিত হইলে হিন্দু-আইনের অধীন হইবে (১৩)।

হিন্দু-আইনের উৎপত্তি ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে এই স্বল্পপরিসর আলোচনা হইতে ইহা নিরূপিত হয় যে, হিন্দু-আইন মূলতঃ রীতি ও আচারের (custom and usage) উপর প্রতিষ্ঠিত। এতদ্বারা ইহা ধরা পড়ে যে, ধর্ম্ম-আইন (স্মৃতি)-দলের লম্বা-চওড়া দাবী কেবল পুঁথিতেই আবদ্ধ, বিচারালয়ে গ্রাহ্য নয়। ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে জাতিতাত্ত্বিক চাবিকাঠি দ্বারা আইন-বিষয়ে

১২। Sastri—Pp. 45-48.

১৩। Mulla— P5.

অনুসন্ধান করিলে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবে যে, কতকগুলি টটেমিক এবং তৎপূর্ব্ব যুগের ম্যাজিক ও ঝাড়ন (magic and witchcraft) বিশ্বাসের অন্তর্গত রীতি ও আচার কৌমগত হইয়া পরে ধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে (ইহা সকল ধর্ম্মেই হইয়াছে)। যাহা এককালের কৌমগত রীতি ও আচার ছিল তাহা ঈশ্বরের আপ্তবাক্য (Revelation) বলিয়া ধর্ম্মের অনুশাসন মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহার অনেকগুলি আজও লোক-পীড়নের যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করিতেছে : যেমন, উপরোক্ত কোন কারণবশতঃ উদ্ভিজ্জ বা পশু অথবা মৎস্য আর্য্যভাষী কৌমগুলির মধ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এই কৌমগুলি সভ্যতার উন্নততর স্তরে উন্নীত হইয়াও সেই আচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই ; আর যখন অনার্য্যভাষী কৌমেরাও আর্য্যসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের কৌমগত রীতি ও আচার সমূহও হিন্দুসমাজে আসিতে লাগিল এবং সেইগুলি 'লোকাচার' বলিয়া গ্রাহ্য হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, স্মৃতিসমূহে দেশের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন রীতি ও আচারের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং সেইগুলিকে 'লোকাচার' বা 'দেশাচার' বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্থানীয় 'লোকাচার'কে সমূলে উৎপাটন করে নাই, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা স্বীয়ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। এই প্রকারে বিভিন্ন কৌমগত বা জাতিগত রীতি ও আচার আজ বিভিন্নাকারে নানাভাবে রক্ষিত হইতেছে। দৃষ্টান্ততঃ মহেন-জো-দাড়োর ভূগর্ভে আবিষ্কৃত খোদিত-দ্রব্যসমূহ হইতে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বৃক্ষপূজা, জন্তুপূজার চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ অন্যতম। ইহা টটেম্‌বাদের নিশ্চিত প্রমাণ। কিন্তু 'আর্য্য-সংস্কৃতি' নামে যাহা ভারতে প্রচারিত হইল তন্মধ্যে বিভিন্ন বৃক্ষপূজার সঙ্গে অশ্বত্থকে পাওয়া যায়। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে অশ্বত্থ, তুলসী, আমলকী প্রভৃতি বৃক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতে দেখা যায়, আর এইসব পুস্তক অভ্রান্ত আপ্তবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। মৎস্যভক্ষণ মনুতে নিষিদ্ধ (মৎস্যাদ সর্ব্বমাংসাদ) কিন্তু বাঙ্গলায় উহার সর্ব্বসাধারণভাবে প্রচলন রহিয়াছে।

ইহা বাঙ্গলার মূলজাতিগত রীতি। এইজন্যই বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের অন্যানাস্থানের ব্রাহ্মণেরা ঘৃণা করিয়া থাকে; কারণ মনু ব্রাহ্মণকে মৎস্যভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, কারণ জাতিতাত্ত্বিক তথ্যের তুলনামূলক বিচার হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, আদিম ইণ্ডো-ইউরোপীয়ভাষী কৌমেরা মৎস্যভোজী ছিল না (১৪)। তাহারা পশুপালক ছিল—সুতরাং মৎস্যভোজী ছিল না এবং একটা ঋতুতে পশুহনন করিয়া দেবতাদিগের নামে উহা উৎসর্গ করিত। ভারতে এই উৎসবই 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' নামে পরিচিত হয় বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন (১৫)। আর্য্যদের মৎস্যভোজনে এই বিরতিই মার্শালের নিকট একটা বড় যুক্তি হইয়াছে যে, মহেন-জো-দাড়োর লোকেরা বৈদিক-আর্য্যজাতীয় ছিল না। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্ততঃ টিউটনিকভাষী জাতিগুলি 'শুক্রবার' মৎস্যভোজন করেন. ইহাই প্রথা। এই বিষয়ে জনশ্রুতি এই যে, লোকে মৎস্য ভক্ষণ করিত না বলিয়া মৎস্যবিক্রেতাদের ব্যবসা চলিত না। তাহারা কোন 'সন্ত'কে (Saint) ইহার প্রতিকার বিধানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। তিনিই এই ব্যবস্থা প্রকাশ করেন যে, অন্ততঃ 'শুক্রবারে' সকলেই মৎস্যভোজন করিবে। এই গল্পের মূলেও আর্য্যভাষীদের মৎস্যভোজনে বিরতির কথাই প্রকাশ পায়। তবে ইহাও সত্য যে, বৈদিক-ক্রিয়ার মধ্যে মৎস্য দ্বারা (যজুর্ব্বেদ, (২৪—২০) এতদ্ব্যতীত তথায় কাঁকড়া, কুলীয়পান, শিশুমার, মণ্ডুক, কুম্ভীর প্রভৃতি বলিদানের কথা আছে; ঋগ্বেদেও অনেক সূক্তে মৎস্যের উল্লেখ আছে) যজ্ঞ

১৪। O. Schrader—Reallexicon der Indogermanixshe Altertuemers Kunde, Pp. 243-244.

১৫। জাতিতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, এই প্রথা প্রাচীন Norseদের মধ্যে ছিল এবং সাইবেরিয়ার তাতারদের মধ্যে আছে (Vide W. Koeppers, Die Indogermanische Frage in Lichte der historischen Voelker Kunde—Anthropos, BK. 30, 1935)

করিবার উল্লেখ আছে। তবে হয়ত ভারতীয় আর্য্যেরা প্রথমযুগে মৎস্যভোজী ছিলেন না; সেইজন্য সেই প্রাচীন কৌমগত সংস্কার মনুতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া আজ প্রাদেশিক কটাক্ষপাতের বিষয় হইয়াছে!

এই প্রকারের কোন কারণবশতঃ শুক্ত অর্থাৎ দুগ্ধের অম্লবিকার (২।১৭৭) মনু কর্ত্তৃক পরিত্যাজ্য হইয়া আজ ধর্ম্ম মধ্যে স্থান পাইয়াছে (বাঙ্গলার হিন্দু ব্যতীত অন্যান্যদের কাছে এইজন্য ছানা অব্যবহার্য্য; এখানেও আবার ব্রাহ্মণেরা হালে ছানা গ্রহণ করিতেছেন (১৬)। সমুদ্রগমনে নিষেধও এই প্রকারের কারণ-প্রসূত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ইউরেশিয়া ভূভাগের মধ্যস্থলের কোন স্থানে ইণ্ডো-ইউরোপীয়ভাষী কৌমদের উদ্ভব হয়। সেইজন্যই তাহারা সমুদ্রগমন ব্যাপারে অনভ্যস্ত ছিল; উহারই ফলে বোধ হয়, ভারতীয় আর্য্যদের সমুদ্রাতঙ্ক ছিল (বৌধায়নে সমুদ্রগমনকারীদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে)।

এই জলাতঙ্ক কেবল ভারতীয় আর্য্যদের নহে, কোন কোন গ্রীক্ কৌম ও রোমানদের প্রথম অবস্থায় এবং পারসীকদেরও ছিল (১৭)। পারসীকেরা আজ পর্য্যন্ত সমুদ্রগমনকারী একটি শ্রেণী উদ্ভব করিতে পারে নাই। মুসলমানযুগেও তাহাদের জলাতঙ্ক সম্পর্কে কবি হাফিজের কবিতা প্রামাণিক। ইনি বাঙ্গলা বা দাক্ষিণাত্যের কোন সুলতান কর্ত্তৃক ভারতে আমন্ত্রিত হয়েন এবং পাথেয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাজে আরোহণকালে সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গমালা দর্শনে ভয়ে সুলতানকে এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৮)। কিন্তু ভারতে কলিতে সমুদ্রগমন নিষেধরূপ একটা শ্লোক অপেক্ষাকৃত হালের (১৯)

১৬। বাঙ্গলার 'ছানা' জার্ম্মাণ Pot Cheeseএর অনুকরণ মাত্র। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ওলন্দাজেরা এই দেশের কারিগরদের ইহা প্রস্তুতকরণ প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিল।

১৭। O. Schrader—Op. cit. P. 712.

১৮। Browne, "History of Persian Literature".

১৯। ৺সত্যব্রত সামশাস্ত্রীর 'পণ্ডিত' পত্রিকায় ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কত লোককে যে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং মুসলমান প্রাধান্যকালে এই রীতি ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত করিবার ফলে হিন্দু-নাবিকশ্রেণীগুলি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আজ তাঁহারা 'বদর বদর' নাম স্মরণ করিয়া সমুদ্রযাত্রা করেন। পুরোহিতেরাই যুগে যুগে প্রাচীন সংস্কার অঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সেইজন্যই ধর্ম্মশাস্ত্রে সমুদ্রগমনের বিরুদ্ধে নিষেধ শোনা যায়। কিন্তু হিন্দু প্রাচীনকালে সমুদ্রগমন করিত, গোঁড়া আর্য্যামীর দোহাই মানে নাই।

এই প্রকারে 'সতীদাহ' যাহা হয়ত একটা ইন্দো-ইউরোপীয় মূলজাতিগত (racial) প্রথা ছিল (২০) এবং কোন কোন সামন্তযুগীয় হিন্দু আভিজাতীয় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত, তাহা ধর্ম্মের অবশ্যকরণীয় বলিয়া ব্যবস্থিত হয়; ফলে কত বিধবাকে যে নিষ্ঠুরভাবে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়! আবার কৌটিল্যে এইরূপ দেখা যায়, বৎস, ষাঁড়, দুগ্ধবতী গাভী নিহত করিলে ৫০ পণ দণ্ড হইবে; কিন্তু গরু (cattle), হস্তী, মৎস্য প্রভৃতি দুষ্ট প্রকৃতির হইলে রাজার খাসজমির (Forest Reserve) বাহিরে ধরিয়া মারা যাইতে পারে (২১)। বোধ হয়, কার্য্যোপযোগী গৃহপালিত গবাদি হত্যা করা হইত না। মেগাস্থিনিস্‌ও বলেন, ভারতীয় দার্শনিকেরা (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়) মাংস খায়, কিন্তু যেসব পশু শ্রমে নিযুক্ত হয় তাহার মাংস খায় না (Fragments XL) (২২)। সম্রাট অশোক জীবহত্যা নিবারণার্থ যে অনুশাসন প্রদান করেন তন্মধ্যে অনেক পক্ষী, চতুষ্পদ জন্তু ও মৎস্য হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে

২০। এই প্রথা ইউরোপের প্রাচীন Norse এবং তাহাদের জ্ঞাতি রুশীয় Varangians শ্রেণীর মধ্যে ছিল। ইহা কেবল Viking অভিজাতদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল।

২১। Kautilya—tr. by Shama Sastri, P 123.

২২। McCrindle—Indica of Megasthenes collected by Schwanbeck 1846. P. 99.

এবং এই সঙ্গে কুক্কুটকে খাসি করাও (càponed) নিষেধ করা হইয়াছে (২৩)। বৈদিকযুগ হইতে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ও উত্তর রামচরিতে গোমেধ যজ্ঞ ও গোমাংস ভোজনের কথা উল্লেখ আছে [শতপথ ব্রাহ্মণে (৩।১।২) যাজ্ঞবল্ক্যের নরম গোমাংস ভক্ষণে প্রীতিলাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ; চরক (২৭শ অধ্যায়) এবং শুশ্রুতে (৪৬শ অধ্যায়, ৮৯ শ্লো) রোগবিশেষে গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। বৌদ্ধ দিঘনিকায় সুত্তে (Newmann's Translations, Vol. II. P. 448. No, 5) গোমাংসের কষাইদের কথা উল্লেখ আছে] কিন্তু কবে ইহা নিষিদ্ধ হইল এবং গরু দেবতায় উন্নীত হইল, তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন অনার্য্যভাষী জাতি হিন্দু হওয়ায় তাহাদের গরু-টটেমও হিন্দুর দেবতায় রূপান্তরিত হয় এবং টটেমবাদীয় বিশ্বাসানুযায়ী উহার মাংস অভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হয়। কিন্তু এবম্প্রকারের যুক্তির পশ্চাতে উপযুক্ত প্রমাণাভাব। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট হইতে এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই যাহা ভারতীয় আদিম জাতিসমূহের মধ্যে গরুকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (২৪)। পক্ষান্তরে কৌটিল্য ও মেগাস্থিনিস্ হইতে জানা যায় যে, কার্য্যোপযোগী গবাদি হত্যা নিষিদ্ধ ছিল, পরে আবার এই সম্পর্কে অশোকের কড়া হুকুম জাহির হয়। যদি 'অর্থশাস্ত্র' পুস্তক মৌর্য্যযুগের রাজকীয় Civil Law হয়, তাহা হইলে অশোকের অনুজ্ঞা তৎসহ সংযোজিত হইয়া লোকের অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহা অবশেষে একটা সংস্কার মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হয়। পরে এই সংস্কারটি অহিংস-বাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পুস্তকে ধর্ম্মের অনুশাসনরূপে প্রবিষ্ট হয়, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, প্রাচীনকাল হইতে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বা মানবের কর্ম্মের জন্য ব্যবহারযোগ্য পশুগুলি হত্যা করা রাজকীয় আইন দ্বারা

২৩। Corpus Inscriptionum Indicarum, Edited by E. Hultzsch, Vol. I. Fifth Pillar Edict—Delhi-Topra.

২৪। এই বিষয়ে Dalton, 283; I. A. 1, 348f. এবং W. Crooke-এর প্রবন্ধ in Hasting's Encyclopaedia, Vol. 5, P. 8 দ্রষ্টব্য।

নিবারিত হওয়ার প্রথা ছিল, এবং বহুপরে তাহা ধর্ম্মরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু আজ ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটা বড় খোঁটা হইয়াছে। আরব সাম্রাজ্যের মেসোপোটামিয়া ক্রমাগত মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে শুনিয়া তথাকার শাসন-কর্ত্তা আল হাল্লাজ কৃষিভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তথায় 'গোবধ' নিষিদ্ধ করিয়া দেন। (২৫)। এই প্রকারের হিন্দুর নিষেধ আইনের অনুরূপ নজীরও ইতিহাসে পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু গো-ভক্ষণ করে না, এই প্রসঙ্গেই আলবেরুণী এই সংবাদ দিয়াছেন।

এবম্প্রকারের হিন্দুর অনেক সামাজিক ও ধর্ম্মবিষয়ক আইনের উল্লেখ করা যায়, যাহা এককালে কৌমগত রীতি ও আচার ছিল এক্ষণে তাহা হিন্দুর Positive Law-রূপে দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুর আইন বিষয়ে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, নানা কৌমগত প্রথা এক্ষণে আইনরূপে সুদৃঢ় হওয়ায় তাহা আজ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াছে এবং আদালতে সেগুলি হিন্দুর আইনরূপে গ্রাহ্য হইতেছে। আজকালকার হিন্দু তাহা হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। বিভিন্ন রীতি ও আচারকে কখনও একীভূত করা হয় নাই। সমগ্র সমাজের জন্য যে এক রীতি ও আইন প্রয়োজন, যদ্বারা বিভিন্ন মূলজাতীয় লোক একত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া এক-জাতীয়তা প্রাপ্ত হইবে তাহা বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্যিক মোটা-মোটা অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (দশকর্ম্ম ব্রতাদি, পূজা-পার্ব্বণ, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি) দ্বারা সকলকে একীভূত করিয়া 'কৃষ্টিগত একজাতীয়তা' (cultural nationality) উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যেসব অর্থনীতিক ও সামাজিক রীতি এবং আচার ব্যবহারের 'একত্ব' দ্বারা সকল প্রকারের লোক এক-জাতিগত মনোবৃত্তি (national mind) প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা হিন্দু-সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এইজন্য আজ হিন্দু শতধাবিচ্ছিন্ন

২৫। Alberuni—tr. by Sachau Vol. II. Ch. I. XVIII p. 153.

বলিয়া কথিত হয়। হয়ত দীর্ঘকালস্থায়ী একটা কেন্দ্রীভূত প্রবল নিখিল-ভারত রাষ্ট্র বিবর্ত্তিত হইলে তাহা সম্ভবপর হইত; কিন্তু হিন্দু-রাষ্ট্রগুলি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; যখন মৌর্য্য ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ন্যায় রাষ্ট্র কিয়ৎকাল স্থায়ী হইয়াছিল তাহার ফলে সর্ব্ব-প্রাদেশিক হিন্দু-একত্বও প্রাচীনকালে কিছুটা দেখা গিয়াছিল এবং উহার জের এখনও চলিতেছে। কিন্তু স্থায়ী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয়তার অভাবে এবং হিন্দুধর্ম্মীয় ব্যবস্থার ফলে লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারই আজ পর্য্যন্ত বলবৎ হইয়া আছে। আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও তৎপ্রসূত সমাজ তাহার কৌমগত নরতাত্ত্বিক ভিত্তিতেই অবস্থিত আছে, তাহার উর্দ্ধে এখনও বিবর্ত্তিত হয় নাই। এইজন্যই প্রাচীন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজ হিন্দুর একত্ববোধের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাচীন ইরানীভাষীরা নানা উপভাষা ও আচার-ব্যবহারে বিভক্ত ছিল, কিন্তু জারতুষ্ট্রের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার এবং হাকামিনি সম্রাটদের শাসন ও সেইসব সংস্কার সর্ব্বজনীন করিয়া একটা অখণ্ড ইরানীভাষাভাষী-জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করে; ম্যাসিডোনিয়ানদের দ্বারা সেই সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলেও পারসীকদের একত্ববোধ বিলুপ্ত হয় নাই। তাই সাসানীদের অধীনে পারস্য আবার স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলে পারস্যের সম্রাট প্রাচীনকালের ন্যায় পুনরায় 'সাহ্-ইন-সাহ্-ইরান' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে সক্ষম হয়। সেই প্রাচীনকালের সৃষ্ট ইরানী-অখণ্ডতার জের আজও চলিতেছে। অন্যদিকে বারটি কৌমে বিভক্ত ক্ষুদ্র ইহুদীজাতি একত্ব সম্পাদন করিয়া এক ইহুদিতে (Judea) সম্মিলিত-রাষ্ট্র সংগঠন করিয়া এবং কৌমগত বারটি জাবে (Javeh) দেবতার বিসর্জ্জন দিয়া এক সর্ব্বশক্তিমান 'জিহোভা' ভগবান সৃষ্টি করে। এই প্রকারে ইহুদী-একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত হইয়া যে-ছাপ সেই জাতির মনে অঙ্কিত করিয়া দেয় তাহা আজও মুছিয়া যায় নাই। আবার চীনের সম্রাট হুয়াং-টি চিন্ ও কন্‌ফুসীয় আইন চীনের বিভিন্নজাতিকে এক করিয়াছে। পক্ষান্তরে, গ্রীস অখণ্ড একজাতীয়তা বিবর্ত্তন করিতে পারে নাই; তাহার ধর্ম্ম ও রীতি-আচারসমূহে সেই অবস্থাই প্রতি-

বিখ্যাত ছিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিদেশী ম্যাসিডোনিয়া ও পরে রোমের অধীনে আসিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু যে রোমের কোন এক ঐতিহাসিক গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "রোম-সাম্রাজ্য প্রথমে অতি ক্ষুদ্র ছিল, এবং শেষে এত বিরাট সাম্রাজ্যে বিস্তৃত হয় যে ইতিপূর্ব্বে পৃথিবী কখনও তাহা দেখে নাই" (২৬), সেই রোম নানাজাতি ও সভ্যতার নানাস্তরে অবস্থিত লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও আইন এবং রাজনীতিক অধিকারও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। কেবল কঠোর রোমীয়-শাসন তাহাদের একচ্ছত্রশাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যেক জাতি নিজের রীতি ও ব্যবহার দ্বারাই শাসিত হইত—ইহাকে তাহার Jus Gentium (কৌম বা জাতিগত আইন) বলা হইত। কিন্তু জাতিগুলিকে একীভূত করিবার জন্য সম্রাট জুস্টিনিয়ান্ একটি নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া সকলকে সমান রোমীয় অধিকার প্রদান করেন ; এতদ্বারা সকলশ্রেণীর নাগরিক এক রোমান আইন দ্বারা পরিচালিত ও শাসিত হইত—ইহাই বিখ্যাত Code Justinian। কথিত আছে, বিভিন্ন শাসিত জাতিদের Jus Gentium তুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। এই রোমীয় আইন আজ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় আইনসমূহে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই প্রকারে এক রাজনীতিক অধিকার ও আইন দ্বারা ক্ষুদ্র রোম প্রথমে ইতালীতে পরিণত হয় ; অবশেষে তিনটি মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত আকার ধারণ করে। আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, রোমীয় জাতি মৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু রোম তাহার আইনের ভিতর দিয়া আজ পর্য্যন্ত জীবিত আছে।

কিন্তু ভারতবর্ষে দেখা যায়, বৈদিককৃষ্টি-প্রসূত যেসব ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে তাহার কোনটিই বিভিন্নজাতীয় ভারতবাসীদের মধ্যে একজাতীয়তাবোধ আনয়ন অথবা জাগ্রত করিতে পারে নাই। প্রত্যেক জাতি বা জনপদের Jus Gentium

---

২৬। Cornelius Nepos, "History of Rome."

পৃথক হইয়া আছে। এতদ্ব্যতীত কুলগত রীতি এবং আচারও আইনের স্থান গ্রহণ করিয়া আছে (২৭)। এতদ্বারাই হিন্দু তাহার শতেক গুণ সত্ত্বেও আজ শতধাবিচ্ছিন্ন এবং এই অবস্থা চিরকালই স্বদেশপ্রেমিক নেতাদের একটা গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া আছে।

এই সকল কারণবশতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Anthropological Religion বলিয়াও অভিহিত করেন (২৮)। এই ধর্ম্মপদ্ধতি-নিঃসৃত সমাজনীতি আজও হিন্দুসাধারণকে শাসন করিতেছে এবং এইজন্যই ভারত এতদিন সভ্যতার নূতনতর স্তরে উঠিতে পারে নাই।

১৭। হিন্দু-কৃষ্টির উৎপত্তি

আজকাল ইউরোপীয় পুস্তক পাঠ করিয়া একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক "আর্য্য-জাতি", "আর্য্যকৃষ্টি", "দ্রাবিড় জাতি", দ্রাবিড় কৃষ্টি" প্রভৃতি বুলি আওড়াইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহার পর, গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্যায় উত্তর-ইউরোপ হইতে 'নর্ডিক' জাতি বা সাইবেরিয়া হইতে 'প্রটো-নর্ডিক' জাতিকে বৈদিক সমাজে আনয়ন করিয়া তাঁহারা হিন্দু-সভ্যতার মূলজাতিগত (Racial) বিভিন্ন স্তরভেদ নির্দ্দেশ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, হিন্দুর মধ্যে কে 'আর্য্য', কে 'অ-নার্য্য', 'দ্রাবিড়' বা 'মঙ্গোল' তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার সামাজিক মর্য্যাদা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান। ফলে অন্তঃসলিলারূপে একটা প্রাদেশিক মনোমালিন্যও সৃষ্টি হইয়াছে! এই প্রকারের পল্লবগ্রাহী অবৈজ্ঞানিক মত প্রচারের ফলে অনভিজ্ঞ লোকের মধ্যে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।

২৭। G. Sastri—Op. cit. p. 28.

২৮। এই সম্পর্কে MaxMueller, 'Anthropological Religion এবং August Comte,—"Sociologie" দ্রষ্টব্য।

নৃতত্ত্ব বা নর-বিজ্ঞান "আর্য্য"-নামীয় কোন মূলজাতির সন্ধান জানে না। ভাষাতত্ত্ববিদগণ মানবের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একটির নামকরণ করিয়াছেন "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" ভাষা। স্বজাতি-প্রেমিক জার্ম্মান পণ্ডিতেরা ইহাকে "ইণ্ডো-জার্ম্মান" ভাষা নামে অভিহিত করেন। ম্যাক্সমূলার (১) এই ভাষাকে "আর্য্য" ভাষা নাম দিয়াছেন; কারণ সংস্কৃত, ইরানীয় প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার সহিত ইউরোপের অনেকগুলি ভাষা এক মূল-জাত। কিন্তু ভাষা ও মূলজাতি এক সংজ্ঞাবাচক নহে। একটা জাতির তাহার ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যজাতীয় ভাষা গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। এইজন্য "ইণ্ডো-ইউরোপীয়" বা "আর্য্য"-ভাষী জাতিসমূহ বলিলে "আর্য্য" মূলজাতি (race) বুঝায় না।

নানা মূলজাতীয় শারীরিক লক্ষণযুক্ত লোকসমূহের একত্র সংগঠন দ্বারা একটি জাতিতাত্ত্বিক লোক-সমষ্টি (Ethnic unit) গঠিত হয়। এই লোকসমষ্টি আবার একটা ভাষা বা উপভাষা ও ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচার-ব্যবহারের পার্থক্য দ্বারা এবম্প্রকারের অন্য লোকসমষ্টি হইতে বৈচিত্র্য লাভ করিতে পারে। মূল-ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা 'আর্য্য'-ভাষী জাতি অতি প্রাচীনকালে এবম্প্রকারেরই একটা জাতিতাত্ত্বিক লোকসমষ্টি ছিল। ইহাদের মধ্যে বৈদিক আর্য্যভাষী জাতিটি একটি উপজাতি ছিল। তাঁহারাও আবার বিভিন্ন কৌমে (tribe) বিভক্ত ছিল, এবং তাহাদের উপাস্য দেবতাও হয়ত পৃথক ছিল। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাহারা এক-কৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া এক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, বৈদিকযুগের পর প্রত্যেক স্থানের বা কৌমের বিভিন্ন রীতিনীতির সমন্বয় করিয়া গৃহ্যসূত্রসমূহে সাধারণভাবেই সর্ব্বসাধারণের জন্য আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। গৃহ্যসূত্র-নির্দ্দিষ্ট "দশকর্ম্ম" প্রভৃতি আচার আজ পর্য্যন্ত হিন্দুদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব

১। MaxMueller—"Biographies of Words and the Home of the Aryas" Pp, 120, 245.

প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহার মূল বৈদিকযুগেই নিহিত। উপনিষদেই ব্রাহ্মণের 'আচমন' প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত সমাজ-পরিচালনাকল্পে গৃহসূত্রোক্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজও বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তবে কালের অগ্রগতির সহিত ইহাদের অনেকগুলি নানাকারণে হয় রূপান্তরিত হইয়াছে, না-হয় আর প্রতিপালিত হয় না। পুরাণ-সমূহে বিভিন্ন ব্রতের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে; সেইগুলির মধ্যে অনেকগুলি আজও প্রতিপালিত হয়; এমন কি, পুরাণোক্ত আহার প্রণালীর অনুজ্ঞা আজও অনেকস্থলে প্রতিপালিত হইতেছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে হিন্দু ও মুসলমানেরা প্রথমে মিষ্টান্ন, পরে পকৌড়ি (নোস্তা) প্রভৃতি আহার করেন। এই প্রথা বিষ্ণু-পুরাণোক্ত (৩।৮৪) অনুজ্ঞার সহিত মিলে। কিন্তু পূর্ব্ব-ভারতে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" অনুজ্ঞানুসারেই আহার হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও অন্যান্যদের দ্বারা সম্পাদিত বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের যে সংবাদ সংস্কৃত নাটকসমূহে পাওয়া যায় সেইসবের অনেকগুলিই আজ প্রচলিত আছে।

এইস্থলে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) এবং সভ্যতার (civilisation) স্বরূপ নিরূপণ করিতে হইবে। ইংরেজ ও আমেরিকান পণ্ডিতেরা ল্যাটিন ভাষা-প্রসূত Culture ও Civilization শব্দ দুইটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন (২)। কিন্তু জার্ম্মান পণ্ডিতেরা বলেন, কৃষ্টি হইতেছে মানবের আত্মা (spirit) প্রসূত। মানুষ নিজের কর্ম্মের জন্য যে সমস্ত দ্রব্য বুদ্ধিবৃত্তি বা মস্তিষ্ক শক্তি দ্বারা উদ্ভব করে উহা তাহার culture-এর ('Kultur') পরিচায়ক বলা হয়, এবং সেই সব দ্রব্যকে সাধারণের কর্ম্মে প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের উন্নতি বিধান হইলে সেই অবস্থাকে মানবের civilization বলা হয়। এইজন্য cultural goods এবং civilizing processes অনুষ্ঠান সমাজে বিরাজ করিয়া থাকে। মানব তাহার উদ্ভাবনী ও চিন্তাশক্তি দ্বারা cultural goods সৃষ্টি করে এবং তদ্দ্বারা

২। Lester F. Ward: "Applied sociology".

সর্ব্বসাধারণের উন্নতি বিধানিকে civilizing processes বলা হয়। এই civilizing processes যে-জাতির মধ্যে যত প্রয়োগ হইতেছে, সেই জাতিকে তত civilization-সম্পন্ন, অর্থাৎ সুসভ্য বলা হয়। সভ্যতা (civilization) অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) মানবের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে। এই তর্কের ধারা ধরিয়া জার্ম্মান পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বিগত পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমরের পর "culture-man" এবং "civilization-man" মধ্যে পার্থক্য দেখেন (৩)। কৃষ্টি ও সভ্যতা এই শব্দ দুইটির জার্ম্মাণ ব্যাখ্যানুযায়ী স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য বা তাহার বর্ত্তমান বংশধর হিন্দু-কৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি, সে একজন 'culture-man'. ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, হিন্দুর উদ্ভূত কৃষ্টির অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের (cultural goods) সর্ব্বজনীন প্রয়োগ হয় নাই; সেইজন্য আজ সুসভ্য দেশসমূহের মাপকাঠিতে ভারতের আপামর সুসভ্য না হইতে পারে—প্রত্যেক ভারতবাসী civilization-man না হইতে পারে, কিন্তু ভারত যে 'culture-man'-বিশিষ্ট এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দু নিজের "spirit-force" (আধ্যাত্মিক শক্তি) দ্বারা কৃষ্টিগত নূতন cultural goods উদ্ভাবন করিতেছে তাহা পক্ষপাতশূন্য পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন না বা করেন না। তাঁহারা হিন্দুদের 'kultuivoelk' (cultural People) বলিয়া স্বীকার করেন।

হিন্দুর সমাজ ও তাহার বর্ত্তমান কৃষ্টির (culture) কাঠামোটা প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা সম্ভূত। মানবসমাজ গতিশীল (dynamic); সুতরাং বৈদিক আচার-ব্যবহারসমূহ হয়ত বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী সময়ে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তথাপি তাহা 'অ-নার্য্য' অর্থাৎ আর্য্য-ভাষীদের বাহিরের বস্তু নয়। খোদিতলিপিসমূহে দেখা যায় যে, "ভাকাটাকা" রাজত্বের আরম্ভ

৩। Oswald Spengler—The Downfall of the Occident. P. 353.

হইতে গুপ্তযুগের মধ্যে নানা পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের ব্রাহ্মণ্য পূজা-পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মহাকাব্যগুলির নায়ক-নায়িকারা অনেকে বর্ত্তমানকালে পূজিত হইতেছে। ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এইসব পূজা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে এই সকল নূতন নূতন পূজা-পদ্ধতি সৃষ্ট হয় এবং নানা সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্রাদিরও নূতন সঙ্কলন হয়। বর্ত্তমানকালের ব্রাহ্মণ্য সন্ধ্যা-উপাসনাতে বৈদিক-মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এবং তৎসহ নূতন মন্ত্র রচিত ও সংযোজিত হইয়াছে। এইরূপে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান ব্যাপারেও বৈদিক এবং নূতন মন্ত্র পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত পূজাদিতেও এবম্প্রকার দৃষ্ট হয়। কোন নূতন পূজা-পদ্ধতির উদ্ভব হইলে ব্রাহ্মণেরা তদুপযোগী নূতন মন্ত্রাদি রচনা করেন। এই ধারা (Process) আজও চলিতেছে; সর্ব্বত্রই বৈদিক মন্ত্র ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। নূতন কালোপযোগী নূতন পূজা ও সামাজিক পদ্ধতি সৃষ্ট হইলে তাহা "অ-নার্য্য", অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্য-কৃষ্টির বহির্ভূত বলা যাইতে পারে না।

ইহা সত্য বটে যে, বিদেশের সহিত লেন-দেনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা বৈদেশিক কৃষ্টি হইতে বস্তুতান্ত্রিক অনেক জিনিষ (cultural goods) গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তদ্দ্বারা ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম্ম নূতন কলেবর ধারণ করে নাই। সামাজিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানসমূহ বৈদেশিক প্রভাব বিমুক্ত। তবে খৃষ্টীয় মিশনারীগণ যে কথা তুলিয়াছেন যে বৈষ্ণবধর্ম্মে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা এখনও বিতর্কের বিষয় হইয়া আছে; বরং একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই বলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মে ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এই সংস্কারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা, তখন হিন্দু-সভ্যতা উন্নতি-শিখরের অবতরণের দিকে আসিয়াছে।

হিন্দু-কৃষ্টির সহিত বৈদেশিক কৃষ্টির আদান-প্রদান হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু বৈদেশিক কৃষ্টি বা ভারতের আদিমজাতীয় লোকদের সভ্যতা

হিন্দু সমাজ-পদ্ধতি ও তাহার ধর্ম্মকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, ইহা অবৈজ্ঞানিক কথা। হরপ্রসাদশাস্ত্রী প্রমুখ বলেন, তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিদেশাগত (৪)। তিনি বলেন, ইহা মধ্য-এশিয়ার শকগণের মগ-পুরোহিতদের সহিত ভারতে আসে। কিন্তু মগ-পুরোহিতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বরং 'মাগী-ধর্ম্ম' (Magi) বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় ধর্ম্মের মতের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল (৫)। প্রাচীন ধর্ম্মসমূহের তুলনামূলক পাঠ হইতে তন্ত্রের চিহ্ন অন্য কোন ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। ইহা সত্য বটে যে, "লিঙ্গ-পূজা" (Phallic worship) পশ্চিম-এশিয়ায় প্রচলিত ছিল (৬))। আবার "সিন্ধু-সভ্যতা"র মধ্যেও উহার চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হয় (৭) এবং বেদেও "শিশ্ন-দেবা" উপাসকদের যজ্ঞস্থলে থাকিবার পক্ষে নিষেধ আছে। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মে লিঙ্গোপাসনার কতটা স্থান আছে তাহা বিচারের বিষয়। বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্রে উহার একান্ত অভাব। অতএব তান্ত্রিকধর্ম্মের কোন অংশ যে বিদেশাগত তাহা বলা যায় না। বরঞ্চ ইহা খুবই দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্রের 'পঞ্চমকার সাধনা', শক্তি (ডাকিনী), আম-

---

৪। Introduction to N. N. Vasu's "The Modern Buddhism and its followers in Orissa," P. 10.

৫। Dr. Dhalla—"Zoroastrian Civilization" এবং "Zoroastrian Religion" দ্রষ্টব্য।

৬। Frazer—"Adonis."

৭। Prof. A. B Keith বলেন, "Phallic Worship"-এর উৎপত্তি হয়ত এই স্থান হইতে হইয়াছে। তিনি বলেন, সিন্ধু-সভ্যতা "is largely Indian in character and nature."—The Aryans and the Indus Valley Civilization in "ভারতীয় অনুশীলনী"।

শ্মশানে নরমাংস ভক্ষণ (৮) ও তাহার টুকরা বা অংশ প্রভৃতি ভূতদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাপার ভারতের বাহিরের কোন ধর্ম্মে আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তন্ত্রের "চীনাচার" (৯) চীনের প্রভাবের পরিচায়ক। কিন্তু লামা তারানাথের (১০) পুস্তক হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক তিব্বত ও চীনদেশে গিয়াছিলেন এবং তিব্বতে ও চীনে তন্ত্র ভারত হইতেই আমদানী হইয়াছিল। বরং একদল লেখক বলেন যে, তন্ত্রের 'গুপ্তমন্ত্র' (Occultism) ও স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার বেদের 'ব্রাহ্মণ' সমূহ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, 'বীজ' ও 'মন্ত্র'গুলির পূর্ব্বাভাস ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১১)। আবার তান্ত্রিকেরা বলেন, তান্ত্রিকধর্ম্ম অথর্ব্ববেদপ্রসূত। উইণ্টারনিজ (Winternitz) বলেন, তন্ত্রের অনেক আসল অনুষ্ঠান (Essentials) অথর্ব্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে পাওয়া যায় (১২)। পণ্ডিতেরা বলেন, শৈব উপনিষদগুলি বেদের শাখা-বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট (১৩)। বেদে ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উচ্চবর্ণসমূহের উচ্চশ্রেণীদেব ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন (১৪)। ইহা ছাড়া অন্যান্য ধর্ম্মসমূহ

৮। 'নরমাংসভক্ষণ' মানবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। Letourneav ("anthropophagie" দ্রষ্টব্য)। এবম্প্রকারের কর্ম্মকে একটা abnormal mind-এর কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে কোন ধর্ম্মের অঙ্গ বলা যায় না।

৯। হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী—"হিন্দী সাহিত্যকী ভূমিকা", পৃঃ ৯।

১০। B. N. Datta : Mystic Tales of Lama Taranatha.

১১। B L. Mukherjee in Woodroffe's "Shakti and Shaktas", P. 411 f; also Winternitz, Vol, I. P, 602.

১২। Winternitz — History of Sanskrit Literature, translated by Ketkar, Vol. I. Pp. 605, 606.

১৩। Weber—"History of Sanskrit Literature".

১৪। Bloomfield—Religion of the Vedas, Pp. 76-77.

পাশাপাশি থাকিত—যথা, শিশ্নদেবোপাসকেরা, ভাগবতের দল, অন্যান্য অহিংসবাদীদের দল, বেদে অবিশ্বাসীর দল ইত্যাদি। ঋগ্বেদেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে একদল যজ্ঞাদি ও বৈদিক দেবসমূহে বিশ্বাস করিত না (৮।১০০৩; '। ১৭৪।৮; ১।১৭৬।৪)। যদি সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা একজাতিরই কৃষ্টির অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে বৈদিকধর্ম্ম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের সন্ধান সেই কালের ভারতে পাওয়া যায়। অন্ততঃ লেখকের (১৫) অনুমান এই যে, সিন্ধু-সভ্যতার "শবদাহ" প্রথা (urn-burial) বৈদিক আচারের অন্তর্গত; তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শবদাহের এবং অস্থিকে সমাহিত করার বিশদ বর্ণনা আছে। গৃহ্যসূত্রে অস্থিসঞ্চয় করিয়া কলসীতে (urn) পুরিয়া মাটিতে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে, এবং পুরাণেও (অগ্নি-পুরাণ—১০।১৮, বিষ্ণুপুরাণ—৩।১১।১৪) অস্থি-সঞ্চয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে। মার্শাল অনুমান করেন যে, সিন্ধু-সভ্যতা বেদে প্রতিফলিত হয় এবং আজও সিন্ধু-সভ্যতার পশুপতিদেব (শিব) ও ধ্যানীযোগী, টটেম্-পূজা ভারতে বিদ্যমান। কাজেই ইহা আর্য্যভাষীদের সভ্যতার বাহিরে কি অন্তর্গত, তাহা আজও বিতর্কের বিষয়।

সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব নর-করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আজকালকার অনেক ভারতীয় লোকের করোটির সহিত মিলে। অন্ততঃ সেই প্রাচীন জাতি বা জাতিসমূহের বংশধরেরা আজও ভারতে আছেন। ইহার মধ্যে একটি জাতি হইতেছে, ভূমধ্যসাগরীয় জাতি (Mediterranean Race); নরতাত্ত্বিকদের মতে বর্ত্তমান ভারতের বেশীর ভাগ লোক এই মূলজাতীয় লোক (১৬)। তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যেরা কি ভিন্ন মূলজাতীয়

১৫। B. N. Datta—Vedic Funeral Custom and Indus Valley Culture in 'Man in India', Vol. 16. No. 4, Vol. 17 No. 1-2; Introduction to "Indus Valley culture' Vol. I by Swami Sankarananda.

১৬। Von Eickstedt—"RassenKunde und Rassen-Geschichte der Menschheit".

লোক ছিল? আনাউ (Anau) হইতে ২০০০ খৃঃ পূঃ যুগের যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে নরকরোটিগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১৭)। পারস্যের লোকদের উক্ত মূলজাতীয় লোক বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে (১৮); আবার সার্জ্জি প্রাচীন হিন্দুকুশের ভারতীয় কৌমদের এই মূলজাতীয় বলিয়াছেন (১৯)। এমতাবস্থায় জিজ্ঞাসিত হইতে পারে, ভারতীয় বৈদিক আর্য্যদের কোন্ মূলজাতীয় বলা যাইতে পারে? মার্শাল বলিতেছেন, পঞ্জাব কোনকালেই অমিশ্রিত জাতির আবাসস্থল ছিল না, হারাপ্পায় আবিষ্কৃত নরকরোটিগুলি দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। মার্শাল স্বয়ংই স্বীকার করিতেছেন যে, বৈদিক আর্য্যদের উৎপত্তি বিষয়ে বহু বিতর্ক আছে—"তাহারা কি ব্লণ্ড নর্ডিক, না 'ব্রুনেট্ মেডিটেরানীয়' অথবা গোল মাথা বিশিষ্ট আল্‌পিন্ বা এই সকলেরই একত্র সংমিশ্রণ (যদিও ইহা হয়ত অসম্ভব) (২০)।"

কিন্তু হালে সিন্ধু-উপত্যকায় যে সব নর-করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি পরীক্ষা করিয়া ডাঃ গুহ বলেন, ইহার মধ্যে "লম্বা মাথা" ও 'লম্বা নাক'-বিশিষ্ট করোটিও পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, প্রাচীন বৈদিক জাতিগুলির

১৭। Pumpelly's "Exploration in Turkestan" (Carnegie Publication, No. 73).

১৮। Daniloff—"Characteristics of the Persians" (in Russian).

১৯। G. Sergi—"Gli. Ari. in Europe".

২০। Marshall—Mahenjo-daro and the Indus Valley Civilization, Vol. I. Pp. 88-110.

ইহা অসম্ভবই বা কেন? সার্জ্জি ও টেলর বলেন, আর্য্যেরা গোল [মা]থা বিশিষ্ট ছিল! ফ্রান্সের ব্রোকার দলও তাহাই বলেন। এই উক্তি [দ্বা]রা মার্শালের Nordicism-এর প্রতি Pan-Germanic bias ধরা পড়ে!

একটা Constituent ইহাতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উপরে উক্ত হইয়াছে, অধিকাংশ নরতাত্ত্বিকের অভিমত এই যে আশপাশের আর্য্যভাষীরা ভূমধ্যসাগরীয়; তাহা হইলে আর্য্যভাষী বৈদিকেরা যে মূলতঃ ভূমধ্যসাগরীয় নয় তাহাও অস্বীকার করা যায় না। হয়ত বৈদিকযুগের পূর্ব্বে ও পরে তাহারা মিশ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূলজাতিগত যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন এবং নরকরোটির বিভিন্নতাও যতই থাকুক না কেন, বৈদিকযুগে তাহারা একটি বিশিষ্ট Ethnic unit. এই সমষ্টির কৃষ্টি ভারতে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাই বিচার্য্য।

ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, আর্য্যভাষীদের বেদ-প্রসূত যে সমস্ত ধর্ম্ম উদ্ভূত বা বিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা আর্য্যকৃষ্টিসম্ভূত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের বৃক্ষ, স্তম্ভ ও কালীপূজাসমূহ আদিম-অধিবাসীদের নিকট হইতে নেওয়া বা গৃহীত; কেহ কেহ আবার এমনও বলিতে চাহেন যে, কালীপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্ম্ম-সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-করা। কিন্তু এস্থলে সর্বপ্রথম বিচার্য্য "আদিম অধিবাসী" কাহাকে বলে? সাধারণ লোকে ইহার অর্থে "দ্রাবিড় জাতি'কে (Dravidian race) বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু নরতাত্ত্বিকেরা আজ 'দ্রাবিড় জাতি' বলিয়া কোন মূল-জাতিকে জানেন না। 'দ্রাবিড় জাতি' বিশপ কল্ডওয়েলের সৃষ্টি (২১)। তিনি 'দ্রাবিড়' ভাষা হইতে দ্রাবিড় জাতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু বর্ত্তমানের নরতাত্ত্বিকেরা বলেন, ইহারা ভূমধ্যসাগরীয় মূলজাতির অন্তর্গত, পূর্ব্বোক্ত নামটি ভ্রমাত্মক ও ভুল (২২)। যখন বৈজ্ঞানিকদের মতে উত্তর-ভারতের লোকেরা ভূমধ্যসাগরীয়

২১। Caldwell—A Comparative Grammar of the Dravidian and South Indian Languages.

২২। Eickstedt—"Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit; Dr. Guha—Ethnological Report on Census of 1931; Haddon—Races of Man, P. 107-111. ইনি দ্রাবিড় ও মেডিটেরাণীয় জাতির মধ্যে অনেক মিলের কথা বলেন।

জাতি এবং দক্ষিণের লোকেরাও তাহাই, তাহা হইলে মূলজাতীয় ও কৃষ্টির পার্থক্য কোথায় রহিল? অবশ্য ভাষার পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু সেই ভাষাটি কোন জাতির ভাষা? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোকদের সাধারণতঃ 'দ্রাবিড়' বলা হয়, কিন্তু অনেকস্থলে তাহারা অন্যান্য মূলজাতিসমূহের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং অনেকের মধ্যে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতির (Pre-Dravidian) লক্ষণ প্রকাশ পায় (২৩)।

বর্ত্তমানের নরতাত্ত্বিকেরা দ্রাবিড়ভাষীদের বিশ্লেষণ করিয়া দ্রাবিড়-পূর্ব্ব একটি জাতির সন্ধান পাইয়াছেন; তাহাদিগকে "আদিম অধিবাসী" বলা হয়। ইহারা সিংহলের আদিবাসী ভেদ্দাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত; সেইজন্য দ্রাবিড়-পূর্ব্বদের Veddoid (ভেদ্দাদের ন্যায়) বলা হয় (২৪)। এই "ভেদ্দার-ন্যায়" জাতি গঙ্গা-উপত্যকা পর্য্যন্ত বাস করে; অবশ্য বিভিন্ন স্থলে তাহার "আর্য্যভাষী' হইয়াছে। ইহাদের ভাষা হইতেছে—দ্রাবিড় ভাষা, এবং 'কোলারীয়' জাতি তথাকথিত 'মন-খেমর' ভাষা বলে কিন্তু ফন্ হেভেসির মতে, তাহারা Finno-Vigric বিভাগীয় তাতার-জাতীয় ভাষা বলে। তাহা হইলে দ্রাবিড়জাতির পরিবর্ত্তে 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' একটা জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার্য্য—আর্য্যগণ ও তাঁহাদের 'হিন্দু" বংশধরেরা কতটা এই 'দ্রাবিড়-পূর্ব্ব' জাতির কাছে ধর্ম্ম ও কৃষ্টির জন্য ঋণী!

জাতিতাত্ত্বিকেরা বলেন, এই জাতি সভ্যতার বিশিষ্ট উচ্চ স্তরে আজও উঠিতে পারে নাই। দক্ষিণের জঙ্গলসমূহে এই মূলজাতির যেসব অংশ বাস করে তাহারা সভ্যতার অতি নিম্ন স্তরে আজও অবস্থিত (২৫)। ইহা ছাড়া মধ্য-ভারতের কোলারীয় জাতি (ইহারা নিজেদের আজ 'হো'—Ho জাতি বলেন) 'মুণ্ডারি' ভাষা বলেন; কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এই ভাষার

২৩। Haddon—Races of Man, Pp. 20-21.

২৪। Eickstedt এবং Sarasins; Haddon—op. cit. Pp. 107-111.

পরিচয় বিষয়ে সন্দেহ আছে (২৬)। এই ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং তাহারা দ্রাবিড়-পূর্ব্ব মূলজাতির অন্তর্গত। ওরাওঁগণও (Oraons) তদ্রূপ এবং তাহারা কানাড়ী ভাষার সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন দ্রাবিড় ভাষা বলে; সাঁওতাল পরগণার মালে ও মালপাহাড়ীরাও ওরাওঁ জাতীয় লোক কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা বলিয়া থাকেন (২৭)।

জাতিতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই আদিমজাতীয় কৌমগুলি অবশ্য প্রস্তরযুগের সভ্যতা হইতে বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নিজেদের চেষ্টায় কতটা কৃষ্টির উচ্চতর স্তরে উত্থিত হইয়াছে তাহাই বিচার্য্য। তাহাদের ভাষায়, আচারে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দু-সভ্যতারই ছাপ পড়িতেছে। তাঁহারা হিন্দুদের অনেক অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান আজও গ্রহণ করিতেছে। ছোটনাগপুরের 'হো' জাতি (কোলারীয়) নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় না, অথচ হিন্দু আচারও অনুষ্ঠান নকল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকেরা বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া থাকে। অনেকস্থলে কালীপূজা করিয়া থাকে, হিন্দুর পার্ব্বণ প্রভৃতি অনুসরণ করে। স্মৃতিসমূহে এই সকল জাতিদের (ভীল, কোল) "অন্ত্যজ", অর্থাৎ হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল আদিম জাতীয় লোকদের নিকট হইতে প্রাচীন আর্য্যগণ বা তাহাদের পরবর্ত্তীকালের বংশধরেরা কৃষ্টির অনেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে বলা, অবৈজ্ঞানিক কথামাত্র। ইহাদের মধ্যেই যাহারা হিন্দু-কৃষ্টি এবং বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত আচারাদি গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ চাতুর্ব্বর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা 'অন্ত্যজ'

২৬। W. Von Hevesy—Zur verwandtschaft der Munda-Sprachen in Orientalischen Literatur Zeitun, May—1936, Pp. 273-288.

২৫,২৭। Haddon—op. cit. Pp. 107-111.

তৎপর 'অস্পৃশ্য', তৎপর 'অসৎ-শূদ্র', তৎপর 'সৎ-শূদ্র'—ইহার পর ক্ষমতানুসারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন।

এইজন্য দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বা আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে হিন্দুরা ধর্ম্ম বা কৃষ্টির অনেক মালমসলা গ্রহণ করিয়াছে বলা দায়িত্বহীনতা ও পল্লবগ্রাহিতার পরিচায়ক মাত্র। ইহাও প্রকৃত সত্য যে, অনেক অনার্য্য ভাষার শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং আর্য্যদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্য-ভাষিগণ তাহাদের মধ্যে হজম হইয়া যাওয়ায় ইহা ঘটিয়াছে। তবে হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরের অনেক আচার ও অনুষ্ঠান আছে যাহা শ্রুতি বা স্মৃতির অন্তর্গত নহে। তুক্-তাক্, ঝাড়ন, বশীকরণ, জন্তু ও বৃক্ষ পূজা, আঁকার ভয় বাঁকার ভয় প্রভৃতি অনেক কুসংস্কার কোথা হইতে আসিল?

যাঁহারা বৈদিক আর্য্যদের ও তাহাদের পরবর্ত্তী যুগের বংশধরদের ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাল-ফ্যাসানের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের ন্যায় ছিল বলিয়া মনে ধারণা করেন তাঁহাদের কাছেই এই প্রশ্ন উঠিবে। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলিও Pre-animalism (জন্তুপূজার পূর্ব্বের স্তরের ধর্ম্ম), animalism (জন্তুপূজা), Totemism (বৃক্ষ, জন্তু, জল প্রভৃতিকে পূর্ব্বপুরুষরূপে পূজা), Magic and witchcraft (ইন্দ্রজাল ও ওঝাগিরি) প্রভৃতি নানাস্তরের ধর্ম্মভাবের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্যই বেদেই সেমিটিক্ জাতীয় একেশ্বরবাদের (monotheism) পরিবর্ত্তে tribal chief-দের দেবত্বে আরোপ (২৮),

---

২৮। যাস্ক, দুর্গাচার্য্য, মহীধর ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব দ্রষ্টব্য। ভীষ্ম বৈদিক দেবতাদের বড় বড় রাজা বলিয়াছেন; যাস্ক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিষয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন; দুর্গাচার্য্য বলেন যে সকল দেবতারই সেই উৎপত্তি। মহীধরও তাঁহার ভাষ্যে সেই কথাই বলিয়াছেন। এই সঙ্গে সুশ্রুত-সংহিতাও দ্রষ্টব্য। তথায় দেবতাদের ধন্বন্তরী আরোগ্য লাভ করাইয়া 'অমর' করিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বায়ুমণ্ডল হইতে কল্পিত (২৯) ও রূপক (৩০) দেবতা প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়। আর অথর্ববেদে (৩১)ম্যাজিক, রোজা (witchcraft) ও তুক্‌তাক্‌, ঝাড়ন, বশীকরণ প্রভৃতির মন্ত্রাদি পাওয়া যায়, বেদে বৃক্ষপূজার সংবাদ পাওয়া যায়, ঋকবেদের দশম মণ্ডলে মন্ত্রতন্ত্র ও তুকতাকের কথা আছে; তাহার বাহিরে, টটেম্‌বাদের অনেক সংবাদও পাওয়া যায়। কাজেই বৈদিক-সাহিত্যে বর্ত্তমানের আচার ও অনুষ্ঠানের অনেক জিনিষ বীজরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালীন কুসংস্কারগুলি বৈদিকসাহিত্যে বিশেষভাবে নাই ও স্মৃতিতে একেবারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী-কালের নাটক প্রভৃতিতে অনেক কুসংস্কারের খবর জানা যায়। লেখক প্রতীচ্য ভ্রমণকালে দেখিয়াছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মেয়েলী কুসংস্কারের সহিত এদেশের বেশ মিল রহিয়াছে।

অবশ্য হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের এমন অনেকগুলি অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে (শীতলা পূজা, গ্রাম্য দেবতা, ভূত, ব্যাঘ্রদেবতা প্রভৃতি পূজা) যাহার উল্লেখ বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এগুলি "লৌকিক ধর্ম্ম" (tribal religion) হইতে উদ্ভূত। বিভিন্নস্থানীয় কৌমগুলি যখন আর্য্য-সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ করে তখন তাহাদের বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানগুলিও আর্য্যসমাজে আসে, কিন্তু এইগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুমোদিত নহে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম tribal religionকে "গ্রাম্য" বা "লৌকিক" ধর্ম্মরূপে হজম করে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ঐগুলিকে অকস্মাৎ উৎখাত না করিয়া শনৈঃ শনৈঃ দূরীভূত করিয়া তদুপরি হিন্দুর অনুষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে (৩২)।

২৯-৩০ যাস্ক দ্রষ্টব্য।

৩১। Bloomfield—op. cit. Pp. 76-77.

৩২। সুন্দরবনের দক্ষিণ রায় এবং অন্য যায়গার বাঘড়া রায় পূজা animalism ধর্ম্মের পরিচায়ক। ইহা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। আবার

কিন্তু এই সকল 'বিশ্বাস' আর্য্যকৃষ্টি, হিন্দুর স্মৃতি বা পুরাণের অন্তর্গত নহে। এগুলির অস্তিত্বের দ্বারা হিন্দু-কৃষ্টি, মধ্যে আদিমজাতীয় প্রভাব প্রমাণ করা যায় না। লিঙ্গপূজা (Phallic Worship) অসভ্য আদিমজাতি-সমূহের মধ্যে নাই (৩৩); সেইজন্য শক্তিপূজার ও শিবপূজার প্রতীক লিঙ্গ ও যোনী-পূজার নিদর্শন তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন, অশোকের সময় হইতেই ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পকলা বৈদেশিক প্রভাবাধীন হইতে থাকে (৩৪)। কিন্তু ভারতীয়েরা বিদেশ হইতে স্থাপত্যকার্য্যের বিভিন্ন 'টেকনিক্' (technique) গ্রহণ করিলেও নিজেরা একটা স্বতন্ত্র 'চারুকলা' (Fine Arts) পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থপতি-শিল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয়, অর্থাৎ 'Hindu system of Architecture' অন্যতম। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সনাতনী ও বৌদ্ধ এবং জৈনেরা একই শিল্পকলাপদ্ধতির উদ্ভব করেন। তবে বৌদ্ধ-শিল্পে জাতক প্রভৃতির গল্পের প্রতিচ্ছবি প্রদত্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শিল্পে পৌরাণিক দেবদেবীর.

ওলাবিবি ও সুন্দরবনের বনবিবির পূজা মুসলমান পুরোহিতের একচেটিয়া। ইহাও হিন্দুর পূজা নহে। জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিতই লেখককে বলেন, চড়কপূজা সংক্রান্ত পাটপূজা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। ইহার কোন স্মৃতি বা পূজা-পদ্ধতি নাই। তবে বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্তিকে আজ যেমন ব্রাহ্মণেরা 'বিষ্ণুমন্ত্রে'ই পূজা করেন, তদ্রূপ পাটপূজা 'শিবমন্ত্র' দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আসলে চড়ক ও গাজন হিন্দু ও বৌদ্ধের অনুষ্ঠান নহে। এই বিষয়ে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধদ্বয়ও দ্রষ্টব্য।

৩৩। Hopkins—Epic Mythology, No. I, p. 222.

৩৪। A. Gruenwedel, "Buddhist Art in India", tr. by A. C. Gibson.

চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে (৩৫)। এই পদ্ধতিতে মুসলমান যুগে ইসলামধর্ম্মীয় প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। হ্যাভেলের মতে (৩৬), হিন্দু-বৌদ্ধ স্থপতি-পদ্ধতিই ইসলামের উপযোগী করিয়া তাজমহল প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। তাজমহলে হিন্দু-বৌদ্ধ "পঞ্চরত্ন" নির্ম্মাণপ্রথা "পঞ্চ-মিনার"-এ পরিণত হইয়াছে। ভারতীয় মসজিদের গম্বুজ অন্য কোন মুসলমান দেশে দৃষ্ট হয় না। আহমদাবাদের মুসলমান স্থপতিকার্য্য জৈন আর্টের নিকট ঋণী। রামপুরের রাণা কুম্ভের মন্দিরের সহিত উপরোক্ত সহরের রাজকীয় মসজিদের বিশিষ্ট সাদৃশ্য আছে। সার্কি (জৌনপুরের সুলতানাৎ) শিল্পের কোন কোন কারুকার্য্যর সহিত হিন্দু ও জৈন শিল্পের সাদৃশ্য আছে। জৌনপুরের অটলাদেবী মসজিদে হিন্দু ও মুসলমান স্থপতি-প্রথা বিজড়িত হইয়া আছে। বাঙ্গালার মুসলমান-স্থপতিকার্য্যে হিন্দু-মন্দিরের স্থাপত্যের অনুকরণ করা হইয়াছে। ছোট সোনা বা খোজার মসজিদের অভ্যন্তরে প্রস্তরে খোদিত পদ্মফুল আছে, রাজগরেও তদ্রূপ। আসলে যাহাকে Indo-saracenic art বলা হয় তাহাতে ভারতীয় প্রভাব প্রকাশ পায় (৩৭)।

ইহার পর আসে দর্শনাদির কথা। হিন্দু-দর্শনাদিতে কেহ কেহ গ্রীক প্রভাব দেখিতে চাহেন, কিন্তু উহা সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। অতি-প্রাচীনকালেই গ্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস্ ভারতীয় 'সাংখ্য'শাস্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন। গার্বে বলেন, সাংখ্যদর্শন গ্রীক্ দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল (Sankhya Philosophie. 113ff)

৩৫। হিন্দু-শিল্পকলা সম্বন্ধে M. N. Dutta, "Dissertation on Painting"; "History of Architecture" দ্রষ্টব্য।

৩৬। Havell, "History of Indian Architecture."

৩৭। Burgess—Imperial Gazetteer II, P. 185, 188, 193; Archeological Survey of Western India, pt. II, pp. 11-12.

ভিন্‌টারনিজ (৩৮) বলেন, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে হিরাক্লিটাস, এম্‌পোডক্লেস, আনাক্সগোরাস, ডিমক্রিটাস্‌ এবং এপিকুরের দর্শনসমূহের উপর উক্ত প্রভাব সম্ভবপর, যদিও বিভিন্নস্থানে সমানভাবে উদ্ভব (Parallel development) অসম্ভব নহে (৩৯)। পক্ষান্তরে তিনি, গার্বে ও L. V. Schroeder (Pythagoras und die Inder 1884) নিঃসন্দেহ যে, পিথাগোরস্‌কে 'সাংখ্য' প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। পুনঃ প্লেটোও ভারতীয় প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া কথিত হয় (৪০)। এই প্রকারে পরবর্ত্তীযুগে Gnostic ও Neo-Platonic মতদ্বয়ের উপর ভারতীয় প্রভাব নিশ্চিতরূপেই ধরিতে হইবে। আবার তিনি বলিতেছেন, পরের যুগের ভারতীয় 'ন্যায়শাস্ত্রে" (Logic) আরিষ্টটলীয় Syllogism পদ্ধতি এবং ভারতীয় 'atomic theory'র উপর গ্রীক্‌প্রভাব স্বীকার্য্য। কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতীয় 'ন্যায়' 'inductive' আর আরিষ্টটলীয় 'ন্যায়' 'deductive'; উভয়েরই বিচার-প্রণালী পৃথক এবং 'পরমাণুবাদ' যে গ্রীস হইতে গৃহীত তাহার কোন প্রমাণ ভিন্‌টারনিজ্‌ দেন নাই। Eleates দলের (Xenophanes, Parmenides)

৩৮। Winternitz, Geschichte der indische Literatur, Bd.111 P. 478.

৩৯। আজকালকার জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ "Parrallelism in History" অপেক্ষা "Diffusion of Culture" মতের উপরই অধিক জোর দিতেছেন। এই বিতর্ক সম্পর্কে Elliot Smith-এর "Diffusion of Culture' নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

৪০। Willoughby বলেন, প্লেটো Oriental thought দ্বারা প্রভাবান্বিত। Burgess এবং Mahaffy বলেন, Indian thought প্লেটোর 'Ideal Republic' নামক পুস্তকে সমাজে তিন প্রকারের মানুষ—হিন্দুর সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, মতের সহিত একার্থবোধক।

মতের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য খুবই চক্ষে ধরা পড়ে। এই বিষয়েও তিনি বলিতেছেন, ইহা ধার নহে, পৃথকভাবে উদ্ভূত হইয়াছে।

কিন্তু কোন প্রাচীন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, সক্রেটিসের সহিত জনৈক ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎকার ঘটে; ম্যাক্সমূলার বলেন, এই বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত (৪১)। পুনঃ Aristoxenus ও Eusebius বলিয়াছেন, খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে এথেন্সে ভারতীয়েরা বর্ত্তমান ছিলেন এবং সক্রেটিসের সহিত তাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বাদিরও আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন (Vide "Rawlinson", quoted in Amrita Bazar Patrika, dated 22-11-36, P. 17)। গ্রীক লেখকেরা বলেন, আলেকজাণ্ডার তাঁহার শিক্ষাগুরুকে ব্রাহ্মণদের (Brachmans) জ্ঞান শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন (৪২)। ইহা হইতে পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় জ্ঞানের ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভূমধ্যসাগরীয় জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। কাজেই হিন্দুর দর্শন যে বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করার ফলস্বরূপ তাহা বলা যায় না, তবে ভাবের বিনিময় হওয়াও অসম্ভব নহে।

ইহার পর আসে ফলিতবিজ্ঞানের কথা। জ্যোতিষ (astronomy) বিষয়ে অনুসন্ধানকারিগণ বলেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা যবনাচার্য্যদের এই বিষয়ে পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং রোমক সিদ্ধান্ত ও পৌলক সিদ্ধান্তের বিষয়ও উল্লেখ আছে। কিন্তু তাঁহারা যে আলেকজাণ্ড্রিয়ার পণ্ডিতদের নিকট হইতে উক্ত বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। তাঁহারা গ্রীক্ জ্যোতিষের খবর রাখিতেন, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কয়েকটি বিদেশীয় শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; হয়ত বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বিদেশের কাছে ঋণী ছিলেন, কিন্তু আর্য্য চিন্তাধারার মধ্যে তাহা

৪১। MaxMueller, "Theosophy or Psychological Religion", P 83-84)।

৪২। J. P. Mahaffy, "Greek Life and Thought" P. 48.

জীর্ণীভূত হইয়া যায়। অন্যদিকে শোনা যায় যে, হিন্দু-জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রতীকগুলির (Zodiac signs) সহিত প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়ার সম্বন্ধ আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

পুনঃ অঙ্কশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার "শূন্য" (Zero) পদ্ধতি ভারতেই প্রথম উদ্ভূত হইয়াছে। আরবেরা হিন্দুদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করেন এবং ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৫৪ খৃঃ) ইহা Stipel কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রচারিত হয়। Spengler বলেন, "Zero, which probably contains a suggestion of the Indian idea of extension...introduced in Europe by Stipel in 1554" (৪৩)।

সঙ্গীতের কথা। গানের সপ্তগ্রাম" হিন্দুদের দ্বারাই সৃষ্ট। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সম্রাট খসরু নৌসেরবানের অভিষেককালে একদল ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞকে ঐ দেশে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদেরই দ্বারা পারস্যে ভারতীয় সুরের "সপ্তগ্রাম" প্রচারিত হয়। এই সঙ্গীতজ্ঞদের বংশধরগণ এখনও পারস্যে বসবাস করিতেছে—তাঁহাদিগকে "লুরী" বা "লুল্লী" বলা হয় (৪৪) এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি পারস্যে সুবিদিত (৪৫)। পারসীকেরা কিন্তু

৪৩। Oswald Spengler, "The Decline of the West", p. 178. আজকালকার ইংরেজ লেখকেরা ইহা চাপিয়া যাইতে চাহেন। Thather and Sewel নামক আমেরিকান ঐতিহাসিকদ্বয় বলেন, আরবেরা ইহা কোথা হইতে পাইয়াছে আমরা তাহা জানি না; আমরা আরবদের নিকট ইহা পাইয়াছি (Medieval History of Europe দ্রষ্টব্য) কিন্তু জার্ম্মাণ প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদগণ বলেন, ইহা হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত।

৪৪ বিখ্যাত ফার্শী সাহিত্যিক মীর্জ্জা মহম্মদ খাঁ লেখককে উক্ত সংবাদ দেন।

৪৫। গান গাওয়া'-(to sing) ক্রিয়াপদের ফার্সী প্রতিশব্দ হইতেছে, Suridan বা Suraidan; ইহা কি সংস্কৃত হইতে গৃহীত?

'সপ্তগ্রামে'র নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "ডো, রে, মি, ফা, ল, লা, ডো" নামকরণ করে; পরে আরবেরা উহা গ্রহণ করে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীয় সঙ্গীতজ্ঞ Guido D'arizzo ইহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের ভিত্তি করেন (৪৬)। হিন্দুর সঙ্গীতের স্বর পিথাগোরীয় সঙ্গীত-পদ্ধতি হইতে আলাদা; পিথাগোরীয় স্বর গ্রীক্ খৃষ্টান গির্জ্জায় গীত ও অনুসৃত হইত বা এখনও হয়—বাকী পাশ্চাত্যদেশের সর্ব্বত্র হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত 'সপ্তগ্রাম' স্বরেরই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

ভৈষগ-বিজ্ঞানের কথা। প্রাচীন হিন্দুরা যে গ্রীক, আরব, পারস্য অথবা ইজিপ্তের নিকট এই বিষয়ে ঋণী, তাহা কেহই বলেন না। ইহা তাঁহাদেরই গবেষণা বা অনুসন্ধানের ফল। এই বিজ্ঞানের অনেক বিষয়েই তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন (৪৭)। আরবেরা এই বিষয়ে হিন্দুদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী এই কথা সর্ব্ববাদীসম্মত (৪৮)।

প্রাচীনকালে ভারতীয়েরা রসায়নের চর্চ্চা করিয়াছিলেন (৪৯)। কিন্তু এই বিদ্যা আলকেমীর (Alchemy) সহিত বিজড়িত ছিল। বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যগণের 'অষ্টসিদ্ধি' লাভের মধ্যে 'তরবারি সিদ্ধি', 'চক্ষুতে ঔষধ দিয়া আরোগ্য করা সিদ্ধি,' 'অমৃত (nectar) সিদ্ধি', 'বৃক্ষপত্রে ভর করিয়া আকাশে উড়িয়া যাওয়া সিদ্ধি,' পিত্তলকে 'সোণা করা' (gold tincture) প্রভৃতির সংবাদের মধ্যে "পারাসিদ্ধির" সংবাদ পাওয়া যায় (৫০)। লামা তারা-

৪৬। Encyclopaedia Brittanica.

৪৭। Hoernle—Hindu Anatomy এবং তৎকৃত অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য।

৪৮। Broeckelmann এবং E. Browne দ্রষ্টব্য।

৪৯। P. C. Roy—History of Hindu Chemistry.

৫০। B. N. Datta—Mystic Tales of Lama Taranatha.

নাথ বলেন, সিদ্ধ নাগার্জ্জুনের 'অষ্টসিদ্ধি' লাভের মধ্যে এইটি অন্যতম। আজকালকার কেমিষ্টদের মতে সেই প্রাচীনযুগে নাগার্জ্জুনের Mercury Sulphide প্রস্তুতকরণপ্রণালী আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। তারানাথ বলিয়াছেন, এই সিদ্ধগণ জনসাধারণের হিতার্থে এইগুলি ব্যবহার করিতেন। অনেক সিদ্ধপুরুষ চক্ষুরোগের ঔষধে সিদ্ধিলাভান্তে চীনদেশে গমন করেন এবং তথায় বহুলোকের চক্ষুঃপীড়া নিরাময় করেন।

এই প্রকারে দেখা যায়, 'আলকেমী' ঔষধ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ হয়। কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগীয় 'আলকেমী' ও ভারতীয় সিদ্ধিলাভ-রূপ 'আলকেমী'র এক উৎপত্তির দাবী কেহ করেন না। ইউরোপীয় "আলকেমী" ভারতীয়টির অপেক্ষা আরও পরবর্ত্তীকালের, আর ভারতীয় আলকেমী', ধর্ম্মসাধনার অন্তর্গত ছিল। গ্রুনভেডেল বলেন, উভয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে; এবং বৌদ্ধ-সিদ্ধগণের কোন কোন গল্প আরব্যোপন্যাস ও ইউরোপীয় witchcraft-এর গল্পে প্রতিবিম্বিত দেখা যায় (৫১)। বরং ইহাই সম্ভবপর যে, ভারতীয় অন্যান্য বিদ্যার সহিত এই বিদ্যা আরবদের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্যে প্রচারিত হয়।

প্রাচীন ভারতের কোন্ যুগে লিখন-পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয় তাহা আজ পর্য্যন্তও বিতর্কের বিষয়। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে অক্ষর অঙ্কিত আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত উহার পাঠোদ্ধারে কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। Langdon বলেন (৫২), এই লিপি হইতে ঐতিহাসিক যুগের ব্রাহ্মী-

---

৫১। Ibid. Gruenwedel's Introduction to Edelsteinmine দ্রষ্টব্য।

৫২। Langdon—Mahenjo-daro and Indus-Valley Civilization, Vol. II: Pp, 423-424.

লিপির বর্ণমালা উদ্ভূত হইয়াছে। হাণ্টার মনে করেন (৫৩), ইহার সহিত আদি এলামবাসীর (Proto-Elamite) লিপির লিখন-প্রণালীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আবার ফন্ হ্যাভেসী (৫৪) এই লিপির সহিত পলিনেসিয়ার অন্তঃপাতী ইষ্টার দ্বীপের কাষ্ঠ-খোদিত বিলুপ্ত লিপির সহিত অনেক সাদৃশ্যও দেখিতে পান। ইনি বলেন, উভয় লিপির উৎপত্তি এক, ইহার মধ্যে দ্বীপের লিপি প্রাচীনতর রূপ রক্ষা করিয়াছে। হ্যাভেসী এই দ্বীপের লিপির সহিত দক্ষিণ-পারস্যের আদি-এলামের লিপির সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তিনি আবার মার্শালের সহিত এই বিষয়ে এক মত যে, সিন্ধু-সভ্যতার লিপিকে অন্যদেশ হইতে ধার-করা মনে করা আদৌ সঙ্গত হইবে না। অবশ্য এই সকল লিপির মধ্যে কতকটা পারস্পরিক মিল ও নৈকট্য রহিয়াছে। ইহা সম্ভব যে, এই লিপিগুলির ভিত্তির মূলনীতি (underlying principles) এক, এবং নূতন প্রস্তর-যুগের সমসাময়িককালে (Neolithic times) একস্থান হইতেই তাহাদের উৎপত্তি (common origin) হইয়াছে। কিন্তু এই লিপিগুলি প্রত্যেক জাতি ও তাহার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন (৫৫)।

ঐতিহাসিক যুগের কথা। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বৈদিকযুগে অক্ষর-লিখন প্রণালী উদ্ভূত হয় নাই; তৎকালে লোকে স্মৃতি ও শ্রুতির সাহায্যে লিখন-কার্য্য সমাধা করিত। কিন্তু ৺শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণের

৫৩। G. R. Hunter—The Script of Harappa and Mahenja-daro in Journal of Royal Asiatic Society, 1932.

৫৪। Von Hevesy—"Oster inselschrift und Induschrift" in 'Orientalische Literatur Zeitung', Nov. 1934, Pp 665-674.

৫৫। Marshall, op, cit, Vol I p 41,

রোম অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠকালে বলেন, বৈদিকযুগে লিখন-প্রণালী অবিদিত ছিল না; ইহার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের অভিযান সময়ে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) ভারতীয়েরা লিখন-প্রণালী জানিত কিনা তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ ও বাদানুবাদ আছে। ম্যাক্ ক্রিন্‌ডল্ বলেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়ে ভারতীয়দের নিকট 'লিপি' অজ্ঞাত ছিল (৫৬); কিন্তু ক্যানিংহাম্ বলিয়াছেন (৫৭), অশোকের শিলালিপিগুলি দুইটি পৃথক প্রণালীর অক্ষরে লিখিত। একটি প্রণালীতে দক্ষিণ দিক হইতে বামে লিখিত হয়; এই লিপি অশোকের সাহাবাজগাড়ী (আফগান-সীমান্ত প্রদেশ) অনুশাসন এবং আরিয়ানা (Ariana, আফগানীস্থানের অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্ত্তমান হেরাট্ প্রদেশ) ও ইণ্ডো-সিথিয় রাজাদের মুদ্রায়অঙ্কিত দৃষ্ট হয়। অপর প্রণালীটি বামদিক হইতে ডানদিকে লিখিত হইয়াছে। এই অক্ষর-প্রণালী যে সকল প্যাণ্টলিয়ন ও আগাথ-কলেস্ নামক হেলেনিষ্টিক্ রাজগণ সিন্ধুনদের পরপারে রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের মুদ্রায় মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর অশোকের অবশিষ্ট শিলালিপিগুলিতেও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন সময়ে প্রথমোক্ত লিপি উদ্ভূত হয় অথবা কোথা হইতে এদেশে আমদানী হয় তদ্বিষয়ে কেহ সঠিক কিছুই বলিতে পারেন না। টমাস্ বলেন, ইহা স্বদেশজাত নহে; ইহার ভিত্তি ফিনিশীয় লিপিপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত (৫৮)। খৃঃ পূঃ ৭ম শতকের 'আরামেইক' (Aramaic)

৫৬। Mc. Crindle—Megasthenes, p, 69

৫৭। Cunningham—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. p. 49, 187.

৫৮। Thomas—Numismatic Chronicles, New series, III. p 29,

ভাষায় লিখিত একটি প্রস্তর-লিপি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে, এই লিপি হইতেই পৃথিবীর সমস্ত লিপি উদ্ভূত হইয়াছে। স্বভাবতঃই ভারতীয় বর্ণমালাও তাহা হইতে বিবর্ত্তিত বলিয়া এই দল মনে করেন। কিন্তু উভয় দলেরই মত মূলতঃ এই বিষয়ে এক যে, সেমিটিক জাতীয় লিপি-পদ্ধতি হইতেই ভারতীয়েরা বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। হয়ত উত্তরের (এই অংশ আজ ভারতের বাহিরে) এই সেমিটিক সম্পর্কিত লিপি (যাহাকে "খরোষ্ঠ লিপি" বলা হয় তাহা) উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে লিপির উৎপত্তি কি?

এই বিষয়ে ক্যানিংহাম্ আরও বলেন, প্রথমোক্ত বর্ণমালাটি অশোকের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষ কালের, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৫১ সনের অধিক কালের হইবে না; এবং দ্বিতীয়টি প্রায় সেই তারিখ অথবা প্রায় খৃঃ পূঃ ২৪০ সনের হইবে। কিন্তু দেখা যায় যে, এই অক্ষর-প্রণালীটি সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, সর্ব্বপ্রকারের ধ্বনি উক্ত অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত হয়; তাহা হইলে ইহা বহুপূর্ব্ব হইতেই ব্যবহৃত হইতেছিল বলিয়া অবশ্য মানিতে হইবে। ইহার তারিখ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকের শেষে তিনি নির্দ্ধারণ করেন (৫৯)। ভারতীয় লিপি সম্পর্কে টমাস্ বলেন, ইহা স্বাধীনভাবেই উদ্ভাবন করা হয় (independently devised) এবং এই লিখন-প্রণালী স্থানীয়ভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে (locally matured scheme of writing)। এই অভিমতের সহিত একমত হইয়া ক্যানিংহাম বলিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় "পালি" অক্ষর (দ্বিতীয়-প্রণালীকে তিনি উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন) ভারতীয়দের দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই সৃষ্ট হয় (was a perfectly invention of the people of India) (৬০)।

৫৯। Cunningham—Op, cit, p, 50.

৬০। Cunningham—Op. cit. p. 52.

এতদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, বর্ত্তমানের ভারতীয় লিপি-সমূহের ভিত্তির বর্ণমালাটি (alphabet) ভারতীয়দের দ্বারাই উদ্ভূত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিতে পারা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের সময় লিখন-প্রণালী ভারতীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল—এই মতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরেই ভারতীয়েরা লিখিতে শিখিল, তাহা হইলে কোথা হইতে তাহারা সেই বর্ণমালা প্রাপ্ত হয়? ব্রাহ্মী অথবা অশোক-লিপি গ্রীক্‌দের নিকট হইতে গৃহীত নয়; বাবিলনীয় পারসীক-কীলকলিপি (cuneiform characters) হইতে বা আরামেইক-ফিনিশীয় অক্ষর প্রণালী হইতে এই লিপি ধার করা নয়। ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতলিপি পুরামাত্রায় বৈজ্ঞানিক এবং ধ্বনি বা উচ্চারণ (phonetics) বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অতএব এই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে, অর্থাৎ পরিপূর্ণতা বিবর্ত্তিত হইতে নিশ্চয়ই অনেক সময় লাগিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতীয়েরা লিখন-প্রণালী জানিত না, আর তাহার পৌত্রের সময়ে হঠাৎ নিজেদের মাথা হইতে জগতের একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত (most perfect) বর্ণমালা সৃষ্টি করিল, ইহা অযৌক্তিক কথা। ভারতীয় অক্ষর পদ্ধতি ভারতের আর্য্যভাষীদের মস্তিষ্ক-প্রসূত—ইহা আর্য্য অথবা হিন্দু-কৃষ্টি প্রসূত। এইস্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য, কানিংহাম্‌ তাঁহার ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে বলিয়াছেন (৬১) যে হারাপ্পায় প্রাপ্ত কতকগুলি শীলমোহর তাঁহার হস্তগত হয়। ঐগুলির কোন কোন অক্ষরের সহিত ব্রাহ্মী-লিপির সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মনে করেন (৬২)। হালের ল্যাঙ্‌ডেন্‌-এর মত এই যে মহেঞ্জো-দাড়োর চিত্রাক্ষর হইতে ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভব; তিনি "ব্রাহ্মী-লিপির কতিপয় বর্ণের মূল সিন্ধু-লিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উভয় লিপির সমান আকৃতি-বিশিষ্ট

৬১। Cunningham—Archeological Report, published in 1875 A. D. Vol ,5. P,168,

চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন” (৬৩)। তিনি আবার বলিয়াছেন, “সুমেরীয় বা আদি-এলামীয় লিপির সঙ্গে সিন্ধুলিপির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই” (৬৪)। পুনঃ স্বামী শঙ্করানন্দ বলেন, এই লিপি ভারতীয়। ঋগ্বেদে ইহার চাবী প্রাপ্ত হওয়া যায় (৬৫)। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সিন্ধুলিপি সম্বন্ধে সর্ব্বজন-গৃহীত কোন সিদ্ধান্তে এখনও কেহ উপনীত হইতে পারেন নাই। সিন্ধুসভ্যতার ভাগ্যে আর যাহাই থাকুক না কেন, ভারতের বর্ত্তমান বর্ণমালা যে ভারতীয় আর্য্যদের মস্তিষ্ক-প্রসূত, এবং ইহা তাঁহাদেরই কৃষ্টির একটি দান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অশোকের সময়ে লিপি-মালা সম্পর্কে উল্‌নার বলেন এই সম্পর্কে সকলেই একমত যে, এই লিপি অশোকের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে উন্নতিলাভ করিয়াছিল” (৬৬)।

এই প্রকারে দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু-কৃষ্টি আর্য্য-মস্তিষ্ক হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। স্পেঙ্‌লারের ভাষায় Arya-cultureman দ্বারাই ইহা বিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানের ইউরোপীয় অথবা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুরা বিদেশীয়দের কাছে কৃষ্টি বিষয়ে হাতেখড়ি দেন নাই। অবশ্য **Diffusion of culture** দ্বারা বিভিন্নদেশের সহিত তাঁহাদের কৃষ্টির আদান-প্রদান হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বৈদেশিকের নিকট ঋণী; কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাদের inventive এবং creative genius অস্বীকৃত হয়

৬২-৬৩। কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামী—ঐ ১১৯, ১২৪।

৬৪। **Langdon—Mahenjo-daro and Indus Valley Civilization, Vol . II. p. 423 424**

৬৫। **Swami Sankarananda: "Rig-Vedic Culture of the Pre-Historic Indus." vol II.**

৬৬। **A. C. Woolner—Asoka Text and Glossary, Pt, I, P. XVIII.**

হয় না। এই বিষয়ে ডক্টর ভাণ্ডারকার যথার্থই বলিয়াছেন, হিন্দু-সভ্যতা যাহা ভারত ও সিংহলের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে "আর্য্য" : (The Hindu civilization that we see everywhere in India or Ceylon is essentially Aryan) (৬৭)।

[তিন]

মুসলমান সমাজ-বিজ্ঞান

১। ভারত ও ইসলাম।

আজ ভারতবর্ষ আর কেবলমাত্র বৈদিক-আর্য্যধর্ম্মাবলম্বীর দেশ নহে ; ভারত আর পুরাণ ও স্মৃতি কল্পিত জম্বুদ্বীপের চাতুর্ব্বর্ণাশ্রমীয় রাষ্ট্র নহে। একদিকে দুর্লঙ্ঘ্যহিমবন্ত, আর অন্য সব দিকে, সমুদ্র-মেখলাবেষ্টিত হইয়া যুক্তি-বিহীন কাল্পনিক আদর্শে নিমগ্ন দেশ আর ভারত নহে। আজ ভারতের এক-তৃতীয়াংশ অহিন্দুর দেশ ; ইহার সহিত বেদ ও পুরাণের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহার আনুগত্য ভারতের বাহিরে এবং অনুপ্রেরণাও বাহির হইতেই আসে। সেইজন্য অ-হিন্দু ভারতের সমাজতত্ত্বের বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৬৭। D. R. Bhandarkar's Lectures on the "Ancient History on the period from 650-325 B.C."

এই অ-হিন্দু ভারতের মধ্যে আরবের ইসলাম-ধর্ম্মীয় লোকের সংখ্যা হিন্দুর পরই সংখ্যা-গরিষ্ঠ; তাঁহারাই ভারতীয়দের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া কথিত হইতেছে। এইজন্য তাঁহাদের সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন আরবের সহিত ভারতের সম্পর্ক জানা প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট আরবদেশ অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু বিদেশ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই [পৌরাণিক শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতির গল্পগুলি বড়ই কল্পিত (বিষ্ণুপুরাণ, ১।২২।৫-৭) বাবেরু জাতকের গল্প হইতেও কোন সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না]; কাজেই আমরা এই সম্পর্কে বিদেশীয়দের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাধ্য। এইরূপ কথিত আছে, প্রাচীনকালের ভারত, মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্যিক-মধ্যবর্ত্তিতা আরবদের হাত দিয়াই হইত (১)। এখনকার অনুসন্ধানকারীদের

১। ভারতের সহিত ইসলাম-পূর্ব্ব আরবের সম্পর্কের পরিচায়ক তিনখানি প্রস্তর-ফলক পশ্চিম-ভারতের 'ভুজ' (Bhuj) নামক জায়গার গোরস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি হিব্রুভাষায় লিখিত জনৈক ইহুদীর কবরের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ১২৫ খৃঃ বলিয়া অনুমিত হয়। অপর দুইখানি দক্ষিণ-আরবের হিমইয়ারীয় (Himyaritic) ভাষায় এবং অক্ষরে লিখিত। এইগুলি আরবের সাবাইয় (Sabaean) প্রস্তরলিপির অন্তর্গত। আরবের সভ্যতা সর্ব্ব-প্রথম সাবাইয়-যুগে দক্ষিণে বিবর্ত্তিত হয় (Hitti—History of the Arabs, PP, 30-66)। বোম্বাই মিউজিয়ামে এই ধরণের আর একখানি প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে। এই লিপি একটি নরমূর্ত্তির গাত্রে খোদিত হইয়াছে; মূর্ত্তিটির মস্তকে একটি টুপি এবং কোমর হইতে জানু পর্য্যন্ত loin-cloth দ্বারা আচ্ছাদিত, আর বাকী সব অংশ অনাচ্ছাদিত। এই মূর্ত্তিটি 'waddab' নামক এক দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়। হিটি বলেন, দক্ষিণ-আরব-

বিবরণ এই যে প্রাচীন ভারতীয়েরা যেমন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তদ্রূপ আরবেও ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল (২)।

ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব নেতাদের লোলুপ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর পতিত হয়। কোরাণে যে ভারত অজ্ঞাত ছিল তাহা মনে হয় না। ইহুদী জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় যে নোওয়ার এক পুত্র হামের সন্তান "হাস্দ" ভারতে বসবাস করিতে আসে। কোরাণেও উক্ত জনশ্রুতি আছে বলিয়া শোনা যায়। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' পুস্তকে এই ইসলামীয়

দের চন্দ্র-দেবতার নাম ছিল Wadd (পৃঃ ৬০)। এতদ্বারা নির্দ্ধারিত হয় হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতে আরবেরা কার্য্যোপলক্ষে ভারতে আগমন করিতেন। ব্যবসায় নিশ্চয়ই এই কার্য্যের উপলক্ষ ছিল। এই বিষয়ে Epigraphia Indica, Vol XIX ; 1927-28, No, 54 ; "Three Semitic Inscriptions from Bhuj", Pp,300-330 দ্রষ্টব্য।

২। Margoliouth—The Rise and Development of Mahommedanism ; Von Luschan—Rassen, Sprachen und Voelker ; De Iacy O' Leary—Arabia before Mohammed দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় হিন্দু-স্থাপত্যের ভগ্নস্তূপ এবং ভারতীয় কুঁজ-বিশিষ্ট গরুর (Bos Indicus) নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান পণ্ডিত Dr. Friedrich জার্ম্মানীর নরতাত্ত্বিক সোসাইটির এক বক্তৃতায় বলেন, বাণ্টু-নিগ্রো জাতির ভাষার মধ্যে অনেক ইণ্ডো-ইউরোপীয় শব্দ (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি) রহিয়াছে। তিনি লেখককে বলেন যে, প্রাচীন জার্ম্মাণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকায় তিনি এমন একটি কৌম (২০০০ সংখ্যক) দেখিয়াছেন যাহারা রক্তে খাঁটি ভারতীয়; কিন্তু তাহারা স্বীয় ভাষা বিস্মৃত হওয়ায় নিজেদের উৎপত্তির কথাও ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রবাদটি উল্লিখিত আছে। এইরূপ বলা হইয়াছে যে বাবা আদম স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মর্ত্ত্যে সারণ দ্বীপে (সুবর্ণ দ্বীপ ?) অবতরণপূর্ব্বক বাসস্থল নির্ম্মাণ করেন (আমীর খস্রোর ফার্শী কবিতা দ্রষ্টব্য)। এই জন্যই সিংহলের Adam's Peak আজ পর্য্যন্তও মুসলমানদের নিকট একটি তীর্থস্থল হইয়া রহিয়াছে (৩)।

ইসলামীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উম্মিয়াদ খলিফাদের শাসনকালে মহম্মদ-বিন্-কাশেমের সিন্ধু আক্রমণ হয়। কথিত অছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহের সহিত সেই সময় উষ্ট্র পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া ভারতীয় পুস্তকসমূহও আরব রাষ্ট্রে প্রেরিত হয়। তৎপর বোগদাদে আব্বাশীয় খলিফাদের শাসন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের তথায় সমাগম হয় এবং সংস্কৃত পুস্তকসমূহও আরবী ভাষায় অনূদিত হইতে থাকে। কেহ কেহ আবার ইহাও বলেন যে বারমেকী নামক আরব সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বংশীয় লোকদের দ্বারাই এই যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করে। এই বারমক বা বারমকীয় বংশের ইতিহাস অতি রহস্যজনক। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবীয়েরা এক পারসিককে বালখ সহর হইতে ধরিয়া আনিয়া খলিফার নিকট হাজির করে। সে তাহার পরিচয় প্রদানকালে বলে যে, সে একজন বারমাক এবং বলখের "নউ-বিহার মন্দিরে"র পুরোহিতের পুত্র (৪)। এই 'নউ-বিহার' শব্দের উৎপত্তি লইয়া প্রাচীন আরব ভাষাতত্ত্ববিদেরা নানা গবেষণা করিয়াও উহার কোন কূলকিনারা করিতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদগণ স্থির করেন যে এই শব্দ সংস্কৃত 'নব-বিহার' শব্দ হইতে উৎপন্ন! এককালে যাহা জারতুষ্ট্রীয়দের অগ্নিপূজার মন্দির ছিল তাহা পরে

৩। এই তীর্থস্থল সম্পর্কে Ibn Battutah's Travels দ্রষ্টব্য।

৪। Christomatie Persan—Les Bermecide ; Kern—Geschichte des Buddhismus in Indien, Pp 445, 543.

বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয় এবং মুসলমান যুগে তাহা আবার মসজিদে পরিণত হয়। ইহার নিদর্শন ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্য্যটকেরা দেখিতে পান। অধ্যাপক সাখাউ অনুমান করেন যে, হয়ত 'বারমকী' শব্দ সংস্কৃত "পরামক" বা 'পরমক' শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ বিহারের অধ্যক্ষ। হিট্টি বলেন, আব্বাশীয় খলিফ আল-মানসুরের প্রধান উজির খালিদ-ইবন্ বারমক-এর পিতা বল্‌খের বৌদ্ধ মন্দিরে 'বারমক' (Barmak), অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত ছিলেন (৫)। বারমেকীদের বংশের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের জন্য ইহাদের একজন কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহারা জাতিতে পারসিক ছিলেন এবং হয়ত এককালে হিন্দু-ঘেঁসা লোক ছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব-সময়ে অনেক সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় তর্জ্জমা করা হয় এবং অনেক হিন্দু বোগদাদের রাজসভায় স্থান পায়। খলিফার দরবারে হিন্দু পাণ্ডিত্যের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিল এই বংশ (এই বিষয়ে সাখাউয়ের আলবেরুণী, পৃঃ XXXI দ্রষ্টব্য) (৬)। (আরবদের সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণের ফলে একদিকে যেমন সংস্কৃত পুস্তকসমূহ, হিন্দু বৈদ্য (৭) প্রভৃতি আরবের রাজসভায় আনীত হয় আর একদিকে তদ্রূপ অনেক ভারতীয় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া

৫। P. K. Hitti—History of the Arabs, p. 294; Ibn-al-Faqih, Pp. 322-24; Tabari, Vol. II, p. 1181; Ya-qut, Vol. IV. p 818

৬। John A. Subhan—Sufism, Its Saints and Shrines, p. 133.

৭। হারুণ-উল্-রসিদ-এর হিন্দু-বৈদ্যের নাম ছিল "মাঙ্কা"; Brockelmann—Geschischte des Arabischen Literatur, Vol. I. p. 23 দ্রষ্টব্য।

আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে খুব খ্যাতনামা হন। লেখক বিভিন্ন প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদের পুস্তক হইতে এবম্প্রকারের সাত জন ভারতীয়ের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কারম্যাথীয় নামক সম্প্রদায় সিরিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কারম্যাথীয় নামক সম্প্রদায়ের সিরিয়া (সাম) শাসনকালে যিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন তিনি কোন এক ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্যক্তি। তিনি একজন খুব বড় আরব-কবি ছিলেন। ইঁহার নাম ছিল ইবন্ কুসাগিন বা কুসগিম মাহমুদ বিন্ অল্-হোসেন বিন্ সাহাক। ইঁহার পিতামহ সিন্ধুদেশ হইতে তথায় আগমন করেন। ইনি ৯১১ খৃঃ মারা যান (৮)। অপর একজন বড় পণ্ডিতের নাম বিন-জিহাদ বিন অল্ আরাবি। ইনি ৭৬৭ খৃঃ কুফা নগরে জনৈক সিন্ধুদেশীয় গোলামের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। হাশেমী আব্বাস ইহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ইনি অল্-মফদ্দলের দত্তকপুত্র ও শিষ্য ছিলেন। ইনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিকও ছিলেন। তিনি যখন শিক্ষাদান করিতে থাকেন তখন তিনি অনেক ছাত্র পাইয়াছিলেন। তিনি সামারাতে ৮৪৪ খৃঃ মারা যান। তাঁহার রচিত পুস্তকসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (৯)। আরও একজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল যদিচ ইহা অমীমাংসিত ও তর্কের বিষয়। ইনি খ্যাতনামা শাস্ত্রবিৎ আবু হানিফা; তিনি ৮৯৫ খৃঃ মারা যান। তাঁহার পিতামহ ছিলেন খোরসান হইতে আনীত জনৈক গোলাম—নাম ছিল ওয়ানন্দ (Wanand)। এইজন্য Brockelmann তাঁহাকে পারসিক বংশীয় বলিয়া ধরিয়াছেন (১০)।

৮। Goige's Carmathes, p. 151-152 এবং Brockelmann—Geschischte des Arabischen Litera tur, Vol, 1, p. 85.

৯। Brockelmann—op. cit. Vol. I, Pp, 116-117 ; Browne—History of Persian Literature, p, 278.

১০। Brockelmann—op. cit. Vol. I, p. 123.

মিঃ ব্রাউনও তাঁহাকে পারসিক বলেন। কিন্তু তাঁহার পিতামহের নামটি সবিশেষ লক্ষণীয়; আনন্দ নামটি জারতুষ্ট্রীয় না হইয়া ভারতীয় হইতে পারে।

যে কয়েকজন ইসলামীয় শাস্ত্র ও আইন ব্যাখ্যাতা উদ্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আবু হানিফা অন্যতম। ভারতের বেশীর ভাগ মুসলমান তাঁহার মত মানিয়া চলেন।

জনৈক ভারতীয় মওলানা লেখককে বলিয়াছেন, আবু হানিফা জাঠবংশীয় ছিলেন। আরবগণ আফগানীস্থান আক্রমণকালে তাঁহার পিতামহকে ধরিয়া লইয়া যায়। আরবীভাষায় তাঁহাকে Zot বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, এক সময়ে জাঠেরা আফগানীস্থান শাসন করিতেন, তজ্জন্য তথায় জাঠ জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। মওলানা সাহেবের সংবাদ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়; কারণ পূর্ব্বোক্ত 'আনন্দ' নামটি হিন্দু নামেরই পরিচায়ক বলিয়া অনুমান হয়। এক সময় পূর্ব্ব-পারস্য হইতে উত্তর-ভারতের একাংশ পর্য্যন্ত 'খোরসান' নামে অভিহিত হইত এবং পারস্যের কারমান প্রদেশ পর্য্যন্ত জাঠদের বাসস্থান ছিল (১১)। কাজেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এ-বিষয়ে ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে সঠিক অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষণে লক্ষণীয় যে ইস্‌লাম-জাত সুফীধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে দুইটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে : (১) বৈদান্তিক ও (২) জৈন। অবশেষে, সুফীদের যোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুর যৌগিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও মিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরলোকগত মওলভী ওয়াহেদ হোসেন বলিয়াছেন, এই মিল ধার করা নয়। তাঁহার অভিমত এই যে ইহা Parallelism in History-র নিয়মানুসারেই উদ্ভূত। কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের মতে ইহা Diffusion of Culture-এর ধারানুসারে হিন্দুর নিকট হইতে ধার করা। পারস্যে সুফী-ধর্ম্মের প্রথম উদ্ভবের সময় বায়জিদ বোস্তামী

১১। Masudi—French Translation Vol. III. p. 254.

ভারতের সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া আবু আলি নামক জনৈক ভারতীয়ের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ আবু আলির নিকট হইতেই বোস্তামী হঠযোগের প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষা করিয়া সেগুলি পারস্যে প্রচার করেন। পরে সুফী জুনইদের শিষ্য মনসুর আল-হাল্লাজ নামক জনৈক সুফী ভারতে আগমন করেন। খলিফা যখন কাফের বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য অনুজ্ঞা প্রদান করেন তখন তাঁহার বিচারকালে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে তিনি Rope-trick দেখিবার জন্যই ভারতে আসেন। তিনি বলিতেন যে তিনি শরীর ঘরজোড়া করিয়া ফুলাইতে পারিতেন, শূন্যে উঠিতে পারিতেন, পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতেন ইত্যাদি (১২)। 'দম-মাদার' নামক সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দম' (প্রাণায়াম্) প্রক্রিয়া অভ্যাস করা হয়। নানাপ্রকারের গবেষণার পর নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারীদের মত এই যে, সুফীধর্ম্মে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাবের চিহ্ন স্পষ্ট ধরা পড়ে (১৩) এবং সকল প্রকারের মুসলমানদের "তসবীহ্" (জপমালা) বৌদ্ধ-

---

১২। Browne—A Literary History of Persia, Pt. 1, p. 431.

১৩। সুফীধর্ম্ম ও ভারতবর্ষের সহিত উহার সম্বন্ধ লইয়া বিভিন্ন ভাষায় নানা পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর এখানে মাত্র কয়েকজনের মত বিবৃত করা হইল।

(i) The Legacy of Islam—Edited by Sir T. Arnold, **1931.**—তিনি বলেন, বায়াজিদ্ বিস্তামী সম্ভবতঃ ভারতীয় অদ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া 'ফানা' (passing away of the self) এবং 'বাকা' (united life in God) মত উদ্ভূত করেন (পৃঃ ২১৫)।

(ii) Encyclopaedia of Religion and Ethics—Vol. 8-এ বর্ণিত হইয়াছে যে আবুল আলি আলমারি নামক বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত ও কবি ৯৭৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোগদাদে এক প্রকারের ভারতীয়

ধর্ম্মগত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যাহা জৈনধর্ম্ম বলিয়াই অনুমিত হয়। তিনি খাওয়ার জন্য পশু হনন করা অথবা তাহাদের কষ্ট দেওয়া অন্যায় ও দূষণীয় মনে করিতেন।

(iii) John A. Subhan—Sufism, Its Saints and Shrines, 1938.—ইনি বলেন, সুফীধর্ম্মে পারসিক, ভারতীয়, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) প্রভৃতির প্রভাব আছে।

তিনি বলেন, বায়জিদ্ বিস্তামী জনৈক জারতুষ্ট্রীয়ের পৌত্র এবং সিন্ধুদেশের আবু আলী তাঁহার সুফীধর্ম্মের গুরু ছিলেন। তিনিই প্রথমে 'ফানা' (নির্ব্বাণ) মত প্রচার করেন। এই সুফী মতে 'ধিকর' (Dhikr) এক প্রকারের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া বিশেষ। (পৃঃ ১৭—২০)।

(iv) আবদুল কাদের—"বাঙ্গালার পল্লীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম" বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৫ সন।—তিনি বলেন, বস্তামির শিষ্য যাদার তৈফুর হয় গুরুর অথবা ভারতীয় কোন সাধকের নিকট হইতে স্বয়ং এই 'দম'-এর সাধনা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনুমান করেন আবু আলী ভারতীয় শ্বাস-সাধনা জানিতেন। (পৃঃ ৫৪৩)

(v) Jethwal Passram Gulraj—Sind and Its Sufis, 1924. ইনি বলেন যে বড় বড় সুফীদের বংশধর ও শিষ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, এক সময়ে সিন্ধু প্রদেশ আত্মবিদ্যা, যাহাকে সুফীরা 'তসয়ুফ' (Tasauuf or Theosophy) বলেন, তাহার একটা বড় গুপ্তবিদ্যার কেন্দ্র (great occult centre) ছিল। ইনি কুতুবসাহ নামক শতবর্ষীয় জনৈক পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ করেন। তিনি বলেন যে সিন্ধুর কোহিস্থান জেলায় পর্বত শিখরে যোগীরা আসিতেন এবং বিদ্যার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন। তিনি নিজে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সিন্ধুর জনৈক বড় সুফী সাহ লতিফ (১৬৮০—১৬৯০ খৃঃ) বোধ হয় এই

স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে 'নানি', যেখানে নাগারা(যোগীরা) বাস করেন, বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কুতুবসাহ বলিতেন, এই স্থানে ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের কোন পার্থক্য নাই। (পৃঃ ১২৭—১২৮)

(vi) Moulvi Wahed Hossain—University Extension Lectures on Sufism.—Calcutta University—ইনি বলেন, সুফী অতীন্দ্রিয়বাদের সাধনার সহিত যোগদর্শনের অনেক মিল আছে। সুফীদের 'সপ্ত জগত' (plane)-এর সহিত যোগশাস্ত্রের সপ্তলোকের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয় মতের 'লোক' (plane) বর্ণনায় পার্থক্য আছে যদিচ কতকগুলির মধ্যে সৌসাদৃশ্যও রহিয়াছে। পুনঃ সুফীদের "Six principles of psychic regions" যোগশাস্ত্রের "ষটচক্রে"র সহিত কতকটা মিলে। ইঁহার মতে উভয়ের দার্শনিক চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত। তৎপর সুফীমতের 'ইস্ক' ও 'মহবত' ধারণাতে বৈষ্ণব 'প্রেম' ও 'ভক্তির' প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর সুফীমতের 'ভিসাল' (union) ও 'হিজা' (separation) এবং বৈষ্ণবদের 'মিলন' ও 'বিরহ' প্রায় একই। তাঁহার মতে, সুফী ও বৈষ্ণবদের প্রেম-সঙ্গীতের ভাবের একত্ব কেবল বৈষ্ণব কবিদের উপর সুফীমতের প্রভাব বিস্তারে সম্ভব হইয়াছে (Pp. 27-47).

(vii) Von Kraemer—Islamische Striefnge : ইনি কনষ্টান্টিনোপোলস্-এর Dancing Dervish সম্প্রদায়ের একটি দলের গুপ্ত ধর্ম্মপুস্তক পাইয়া উহার অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহা "বেদান্তসার" পুস্তকের সহিত মিলে! এই সম্প্রদায় জেলালুদ্দিন রুমী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ইহাদিগকে Melvi Sects বলা হয়। উপরোক্ত দরবেশ দল উর্দ্ধে বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে এবং দশা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের নৃত্যের সহিত এই নৃত্যের সৌসাদৃশ্য আছে। কনষ্টান্টিনোপলে বৈষ্ণবদের সহিত এই নৃত্যের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া লেখক আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহার ধারণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা

দের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে (১৪)। আরবদের হিন্দুদের "বুদ্-পরস্তি" (বুদ্ধ-পূজক) আখ্যা প্রদান দ্বারাই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তাহাদের সহিত বৌদ্ধদের ভারতের বাহিরেই পরিচয় হইয়াছিল।

দরবেশদের নিকট এই বিষয়ে ঋণী। রুমীর দল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্বেই স্থাপিত।

(viii) Nicholson—The Mystics of Islam.—এই পুস্তকে তিনিও বলেন 'ফনাহ্' মতটি ভারত হইতে গৃহীত বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। তাঁহার ধারণা, বায়জিদ্ বিস্তামী তদীয় গুরু সিন্ধুদেশের আবু আলীর নিকট হইতে এই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আরও বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব সুফীদের সাধনার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতীয় সন্ন্যাসীদের "যোগাভ্যাস" অন্যতম।

(ix) Goldzieber Vorlesungen—ইনি Von Kraemer-এর অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া বলেন, সুফীদের 'ধিকর' শ্বাস-প্রক্রিয়াগুলি ভারতীয় মূল-উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে (পৃঃ ১৭৬—১৭৭)।

(x) P. K. Hiti—History of the Arabs, 2nd Edn, 1940—ইনি বলেন, ইসলামীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সুফীধর্ম্ম খৃষ্টধর্ম্ম, নব-প্ল্যাটনিক মত, গ্নস্টিকবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অনেক তথ্য ও উপকরণ গ্রহণ করেন। আঘানী নামক আরব পুস্তক বৌদ্ধ-জীবনের একটি সুন্দর সুস্পষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন (Aghani Vol, III, p, 24) এবং আল জাহিজের বর্ণিত 'জিন্দিক' (Zindiq, সন্ন্যাসিগণ হয় ভারতীয় সাধু, না হয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী অথবা তাহাদের অনুকরণকারী দল ছিল (Gold zieheren Vorlesungen Ueber den Islam. p. 160) পৃঃ ৪৩৫।

(১৪) হিটি বলেন, জপমালা হিন্দুদের দ্বারাই উদ্ভূত; কিন্তু মনে হয় ইহা মুসলমানেরা সাক্ষাৎভাবে পূর্ব্ব-খৃষ্টীয় চার্চ্চ হইতে গ্রহণ করেন (পৃঃ ৪৩৮)।

২। ভারতীয়-মুসলমান সমাজতত্ত্ব

অতীতের এই চিত্রপট স্মরণ রাখিয়া ভারতীয়-ইস্‌লামের সামাজিক অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ভারতীয়-মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দুর মনে এই ধারণা আছে যে, এই সমাজ সম্পূর্ণ বিজাতীয় ও বৈদেশিক। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক মুসলমান নেতাও তদ্রূপ বলায় উক্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে আজ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ও আকার ধারণ করিয়াছে। পারস্যে ইসলাম পারসীক রূপ ধারণ করিয়াছে; প্রাচীন পারস্যের (জারতুষ্ট্রীয়) ছাপ তাহাতে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তদ্রূপ উত্তর-আফ্রিকার ইসলাম; সেখানে মারাবিট্‌দের (ফরাসী—Marabouts) ভক্তি এবং আজ্ঞা পালন করায় ধর্ম্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। যবদ্বীপে ইস্‌লামী সমাজ প্রাচীন হিন্দু কৃষ্টির প্রভাব হইতে আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। পশ্চিম-এশিয়ার তুর্কিদের মধ্যে নৈষ্ঠিক সুন্নীমত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের পুরাতন কৌমগত অনেক রীতি-নীতি আঁকড়াইয়া ছিল বা আছে। কামালের তুর্কীরা প্রাচীন কৌমগত নাম প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছে। আফগানীস্থানের লোকদের মধ্যে আইনে ও রীতিতে প্রাচীন সংস্কারের চিহ্ন ধরা পড়ে। এক্ষণে কথা এই, ভারতের অবস্থা কি?

ঐতিহাসিকেরা বলেন, সিন্ধু প্রদেশে স্বল্পকাল স্থায়ী আরব-শাসনের যে ধ্বংসাবশিষ্ট উপনিবেশ মনসুরা সহরে ছিল তাহার মধ্যে ভারতীয় আচার-ব্যবহারের প্রভাব সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইত।

তুর্কীদের দ্বারা ভারত-বিজয়ের বহুপূর্ব্বেই ইবন্ হকল (Ibn Haukal) ও ইস্তাখ্রি (Istakhri) নামক আরব ও পারসিক পর্য্যটকেরা মনসুরা সহরের মুসলমানদের বিষয়ে বলিয়াছেন, এই দেশের রাজারা 'হিন্দ' এর রাজাদের ন্যায় ইজার ও জামা পরিধান করেন ("The dress of the sovereigns of the

country resembled in the trousers and tunics that were worn by the kings of Hind)। ইবন্ হকল আরও বলিতেছেন যে, কোন কোন স্থানের মুসলমানেরা "কাফেরদের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং দাড়ী রাখে ("wear the same dresses and let their beards grow in the same fashion as the infidels")। এতদ্বারাই বোধগম্য হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশীয় মুসলমান হইতে বিভিন্নকৃত ভারতীয়-মুসলমান সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল (১৫)।

এতদ্বারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, প্রথম মুসলমান বিজেতৃদলের বংশধরেরা বাহ্যিক বেশভূষায় অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায়ই রূপ ধারণ করিয়াছিল। মোগল-পূর্ব্ব যুগের বিজেতৃবর্গের বংশধরগণ যে মধ্য-এশিয়া ও আফগানীস্থানের পোষাক পরিধান করিত তাহার প্রমাণ কি? গৌড়ের সুলতানদের আমলে ইউরোপীয় পর্য্যটক বার্ব্বোসা বাঙ্গলা পর্য্যটনকালে বলিয়াছেন, এই স্থানের মুসলমান অভিজাতেরা ধুতি পরিধান করেন, এবং তদুপরি একটা লম্বা 'পিরান' পরেন। তৎপর মুঘলযুগে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে সম্রাট আকবর হিন্দু ও মুসলমানদের একচ্ছত্রাধীন করিয়া এক ধর্ম্ম ও এক আচার-ব্যবহার দ্বারা একজাতীয়তা গঠনে প্রয়াসী হয়েন। তিনি ভারতীয় খানা, ভারতীয় পোষাক, ভারতীয় রাজসভার আদব-কায়দা, বিভিন্ন দেশের খানাপিনা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দার সহিত মিলাইয়া সর্ব্ব বিষয়েই এক নূতন ফ্যাসন প্রচলন করেন (আবুল ফজলের 'আকবরনামা' দ্রষ্টব্য)। ফলে মোগল রাজসভায় এক নূতন ধরণের রীতিনীতির উদ্ভব হয়; এবং ইহারই ফলে একটা মিশ্রিত ভাষাও উদ্ভূত হয় যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বলিতে থাকে (এই বিষয়ে অধ্যাপক আজাদের "আবে হায়াৎ" দ্রষ্টব্য)। এই মিশ্রিত

১৫। H. C. Roy—Dynastic History of Northern India, Vol. I, pp. 19-20; Elliot—Vol. II. p. 39.

ভাষারও ভিত্তি হইতেছে দিল্লী ও তাহার আশেপাশের সৌরসেনী-প্রাকৃত ভাষা প্রসূত হিন্দী; ইহাকে আজকাল 'খড়িবোলী' বলা হয় (আজাদ বলেন 'ব্রজভাষা' আর সাকসেনা বলেন 'খড়িবোলী' ও 'ব্রজভাষা' উভয়ই ভিত্তি)। বর্ত্তমানে এই মিশ্রিত ভাষার নাম হইতেছে "উর্দ্দু"; কিন্তু পূর্ব্বে ইহাকে হিন্দি বলা হইত (১৬)। এই ভাষার প্রাধান্যের সময় ফারসী আর রাজভাষা অথবা মুসলমান অভিজাতদের মাতৃভাষা রহিল না। সাকসেনা সত্যই বলিয়াছেন যে উর্দ্দু দ্বারা ফার্সী বিতাড়ন ব্যাপারটিতে বিজিত কর্ত্তৃক বিজেতাকে পরাজিত করবার অনুষ্ঠান বলিয়াই প্রতীত হয় (১৭); যেমন আঙ্গলো-স্যাক্সন ও ফরাসী-মিশ্রিত ইংরাজী, ফরাসী ভাষাকে ইংলণ্ডের রাজসভা ও অভিজাতদের মধ্য হইতে বিতাড়ন করে।

আজাদ বলেন, ইরাণ ও তুর্কীস্থানীদের ভারতীয় বংশধরগণ হিন্দুদের সহিত ভারতকে মাতৃভূমি এবং তাহার ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা ফারসী ছাড়িয়া এই উর্দ্দুতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন ('আবে হায়াৎ' পৃঃ ২৯)

এই প্রকারে দেখা যায় যে কেন্দ্রাধীন মুঘল-শাসনের ফলে এক ঐতিহাসিক ও এক কৃষ্টির প্রভাবে ভারত আবার একজাতীয়তা গঠনের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু ধর্ম্মান্ধতার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তথাকথিত মুঘল-শাসনকে "জাতীয়" করিবার শেষ প্রচেষ্টা করেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় (১৮)। কিন্তু বিদেশীয় ইরানীয় ও তুরানী অভিজাতদের চক্রান্তে

১৬। পদ্মসিংহ শর্ম্মা—হিন্দী, উর্দ্দু ঔর হিন্দুস্থানী, পৃঃ ১৫।

১৭। Rambabu Saxena—History of Urdu Literature, p. 6.

১৮। এই বিষয়ে Rapson এবং J. N. Sarkar—History of Aurangzeb দ্রষ্টব্য।

উহা সম্ভবপর হয় নাই (ইহাদেব পক্ষে ঐতিহাসিক কাফিখাঁর ওকালতী দ্রষ্টব্য)। হিন্দুর পুনরুত্থান হয় এবং হিন্দু রাজশক্তি পুনরায় বেশীর ভাগ ভারতকে করায়ত্ত করে। তথাপি, এই তথাকথিত মুঘলযুগ-প্রসূত কৃষ্টি হিন্দুদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

এই যুগেব হিন্দু-মুসলমান একতাব শেষ চিহ্ন উর্দ্দু সাহিত্যের প্রথমাবস্থার কবিদেব লেখার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। মুসলমান কবি ফুগাঁ বলিয়াছেন—

"আয় সেখ, আগর কুফ্‌সে ইসলাম জুদা হৈ।
পস চাহিয়ে তসবিহ্ মেঁ জুন্নার ন হোতা।'

আর একজন বলিতেছেন:

বুদ্‌পরস্তিকো তোই সেলাম নেঁহী কহতে হৈঁ।
মুতরিদ কেয়া হায় 'মির' এইসি মুসলমানীকা!"

কবি আকবর পর্য্যন্ত অনেক মুসলমান কবিই উর্দ্দুতে জাতীয়তা ভাবপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন এবং হিন্দু ও মুসলমান যে একই দেশের লোক তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এমন কি, বিখ্যাত কবি হালী মুসলমানদের স্মরণ করাইয়া বলিয়াছেন,—

"রামকে হামরাহ চড়ী বন মেঁ তু।
পাণ্ডবোঁ কো সাত ফিরী বন মেঁ তু॥
*　　*　　*
তু আগব চাহতে হো মুল্ককী খৈর।
ন কিসী হমওতনকো সমঝো গৈব।''

কৃষ্টিব অন্যান্যাংশেও উভয় জাতির মিলনের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুসলমানযুগের স্থপতি-কার্য্যের পরাকাষ্ঠা হইতেছে—তাজমহল। হ্যাভেলের মতে (১৯) ইহা হিন্দু-বৌদ্ধ আর্টেরই বংশগত সন্তান, কেবল ইসলামধর্ম্মানুযায়ী

১৯। Havel—History of Indian Architecture.

প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধন করা হইয়াছে। মুসলমান দেশসমূহের বিভিন্ন প্রকারের স্থপতি-কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে অনুসন্ধানকালে ভারতীয়-মুসলমান আর্ট সম্পর্কে হিটি বলিয়াছেন: "Indian, bearing clear marks of Hindu style" (২০)। এমন কি বাহিরেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে (২১)। এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমানযুগে ভারতবর্ষ কারুকর্য্য, সৌখিন দ্রব্য, খাদ্যাদির বিবিধ ফলমূল, অনেক রাজনীতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য দ্রব্য বিদেশে হইতে গ্রহণ করিয়াছে (২২)। হিটি বলেন, কমলা-লেবু, ইক্ষু, ভারত হইতে আরবদেশে মুসলমান যুগে প্রচলিত করা হয় (পৃঃ ৩৫১)। এই যুগের বিদেশাগত দ্রব্যসমূহ ভারতে বিশেষভাবে নিজের (acculturated) হইয়া গিয়াছে; এইজন্য আজ বুঝা খুব সহজ নয় যে কোনটি প্রাচীন আর কোনটি মুসলমান যুগে আনীত! আজ ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভিন্ন ও পৃথক বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় এবং তাহাদের পৃথক ও স্বতন্ত্রীকরণকে ভবিষ্যতে মানবতার বিরুদ্ধ-কার্য্য বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

৩। মুসলমান সমাজে 'লোকাচার'

ভারতে সংগঠিত এই প্রকারের ইসলামীয় সমাজে, লোকাচার (custom) বিশেষভাবে বলবৎ হইয়া আছে। অনেক স্থলে আইন বিষয়ে শরিয়ৎ (ধর্ম্ম-আইন) প্রয়োগ হয় না, জাতিগত আচার বা রেওয়াজ-রীতিই প্রয়োগ

২০। Hitti—op. cit. p.260.

২১। হিটি বলেন, খলিফ al-Mutawakhil (৮৪৭-৮৬১খৃঃ) সামারা নগরে যে প্রকাণ্ড মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাহাতে ভারতীয় স্থাপতিকার্য্যের চিহ্ন প্রকাশ পায় পৃঃ ৪১৭।

২২। James Mill—History of India পুস্তকে প্রদত্ত তালিকা দ্রষ্টব্য।

হয়। এই জন্য লোকাচার এবং তৎপ্রসূত আইন আদালতে গ্রাহ্য হয় (১)। এই বিষয়ে আদালতের অভিমত এই যে একটি বিশিষ্ট মুসলমান জাতি তাহার জাতির আচারাদি (rules) মানিয়া চলিতেই বাধ্য ("The courts have held that Muslims of a particular caste must be bound by the rules of that caste.")

এই প্রকারে লোকাচার বা দেশাচার হিন্দু-সমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজের অনেক জায়গায় ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও এই সকল লোক প্রাচীন লোকাচার-বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

৪। উভয় ধর্ম্মের ভাব-বিনিময়

এক্ষণে অনুসন্ধানের বিষয়, উভয় সমাজের ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে কি নূতন বিবর্ত্তন হইয়াছে। একথা সত্য যে তুর্কি-মুসলমান আক্রমণের পর হিন্দু-সমাজ তাহার পুরাতন খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকে নাই। হিন্দু সমাজে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; বাহিরের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ কমঠাবস্থা সঞ্জাত সংরক্ষণশীলতার ফলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই-যুগে ব্রাহ্মণদের রচিত 'নিবন্ধ'গুলিই উক্ত পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বিজ্ঞানেশ্বর ও রঘুনন্দন প্রভৃতির নিবন্ধাদিই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কমঠ-বৃত্তির ফলে একদিকে যেমন হিন্দুর গোঁড়ামি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি একটা উদার মতের আন্দোলন সর্ব্বত্র উদ্ভূত হয়। ভারতে ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা উদয় হইয়া হিন্দু ও মুসলমানদের একত্রিত করিবার জন্য প্রযত্ন করেন: উত্তর-ভারতে এই প্রকারের আন্দোলনগুলিকে "সন্তমত" বলা হয়। এক্ষণে দেখা যায় যে এই আন্দোলনগুলি হিন্দু ও মুসলমান

১। S. Roy, 'Customs and Customary Law in British India, pp. 379-80.

উভয়েরই গোঁড়ামি ও ধর্ম্মান্ধতার নিন্দা করে এবং তাঁহাদের ধর্ম্মভাবকে এক নূতন খাতে প্রবাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। ইহারা উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একতা ও মৈত্রীভাব আনয়ন মানসে সবিশেষ তৎপর। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সুফীগণ হিন্দীভাষায় ধর্ম্মভাবাত্মক পদ্মাদি দ্বারা তাঁহাদের মত প্রচার করিতে থাকেন। কাশ্মীরে মহিলা সাধু লালা বাক্যাণির (১৪শ খৃঃ) উপদেশসমূহের মধ্যে উভয়ধর্ম্মের ভাবধারাই বিদ্যমান (১)। জয়েসীর 'পদ্মাবৎ' কাব্য ঐরূপ আরেকটি প্রমাণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, সুফীমত দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই হিন্দুর সংস্কার আন্দোলন প্রবুদ্ধ হয়। কোন মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, ইসলাম সুফী আর্য্যভাবধারার মধ্য দিয়া প্রচারিত হওয়ার ফলেই ভারত উহা এত সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় (২)। ইসলাম বা ইসলামীয় সুফীধর্ম্ম হিন্দু-সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যে "সন্ত" আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান এরূপ অজস্র ধর্ম্মসম্প্রদায় (৩) সমুদ্ভূত হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামীয় ভাব, আচার-ব্যবহার নানাভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার কতকগুলি সম্প্রদায়ে হিন্দু ও মুসলমান ভক্ত আছেন।

১। Op. cit—p. 401.

Lala Vakyani—Grierson and Burneth in Royal Asiatic Society Monographs, *XVII*, 1920.

২। আবদুল কাদের—বিচিত্রা, 'বাঙ্গলার পল্লীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম'।

৩। M. Titus, "Indian Islam" Pp. 174-175; ইনি ১৬টি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ভারতে ইহার সংখ্যা আরও অনেক বেশী।

এরূপ অনেক সম্প্রদায় আছে যেগুলি হিন্দুর দ্বারা স্থাপিত অথচ উহার মধ্যে অনেক মুসলমান ভক্তও আছেন, আবার ঐরূপ মুসলমান প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে হিন্দু ভক্ত আছেন। বাঙ্গালার নদীয়া জেলার 'সাহেবধনী' সম্প্রদায় ইহার প্রমাণ (৪)। পুনঃ মুসলমান ফকিরের হিন্দু শিষ্য এবং হিন্দু সাধুর মুসলমান মুরিদ (শিষ্য) আছে (৫)। আবার অনেক মুসলমান ফকির গেরুয়া আলখাল্লা পরিধান করেন এবং কেহ কেহ গাত্রে ছাই'ও মাখেন (৬)। পুনরায় বাঙ্গালায় 'সত্যপীর' বা 'সত্যনারায়ণ' পূজাতে উভয় ধর্ম্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার ভাবটিই ধরা পড়ে। সত্যনারায়ণ ব্রতকথায় আছে: "অতঃপর বন্দিব রহিম রামরূপ।—কোরাণ কেতাব আর কালিমা সংহতি। স্থবির্থাঁ পীরের পায় প্রচুর প্রণতি। জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দস্তগীর, দেবদেব জগতের নাথ। পূর্ব্বে হয়ে দশমূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি, সত্যপীর হইলে ইদানী।" মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার সহিত শরিয়ৎ বিধানের অমিল থাকিতে পারে, কিন্তু বাস্তব ধর্ম্মসাধনক্ষেত্রে উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের সুফী কবি নাজির বলিয়াছেন, "জুন্নার গলে আউর বগল বীচ্‌মে কোর্‌আন্‌। আশিক হ্যায় জলান্দার না হিন্দু না মুসলমান॥"

ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে পীর, ফকির ও তাঁহাদের কবরকে সম্মান বা পূজা করা বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। অশিক্ষিতদের নিকট ইহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য, যদিও নৈষ্ঠক মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞের নিকট ইহা

৪। কুমুদবিহারী মল্লিক, "নদীয়া কাহিনী", পৃঃ ২৪০।

৫। বাঙ্গালার যশোহর জেলার ৺কেশবানন্দ স্বামী লেখক ও অন্যান্য বন্ধুদের বলিয়াছিলেন যে ঐ জেলায় তাঁহার ২,০০০ মুসলমান মন্ত্রশিষ্য ছিল।

৬। এই অনুষ্ঠানটি একটু সন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে; M. Titus—op, cit. Pp. 166-167

খুবই হেয়! অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপগুলির স্থানে এই পীর পূজা চলিতেছে! কাশ্মীরের জীয়ারৎ-গুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই প্রকারের স্থান (৭)! প্রত্নতত্ত্ববিদ পি, মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, বিহার প্রদেশে অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় পীরস্থান দেখিলে মনশ্চক্ষে তাহা একটি বোধিসত্ত্বের স্তূপ বলিয়াহ নিরীক্ষণ করিতে হইবে। বিহারে সাঁওতাল পরগণায় লেখক এই কথারই প্রমাণ পাইয়াছেন। একই অশ্বত্থবৃক্ষতলে মুসলমানের পীরস্থল আছে, সেখানে হিন্দুও গিয়া পূজা দেয় এবং সাঁওতালও আসিয়া তাহার 'বোং' দেবতার পূজা করে।

ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইরাণের অন্তর্গত 'সীস্তান' (প্রাচীন শকস্তান) হইতে পূর্ব্ব-ভারতের চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ ভূখণ্ডে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধগণ ভ্রমণ করিয়া লোকদের অলৌকিক ক্রিয়াদি দেখাইতেন, 'আল-কেমী'র সাহায্যে পিতলকে সোনা করিতে পারিতেন বলিয়া দাবী করিতেন, 'অমৃত' (Elixir of life) লাভ করিতেন, নানাপ্রকারের তান্ত্রিক তুকতাক দেখাইতেন, লোকদের ঔষধ বিতরণ করিতেন, আকাশপথে একস্থান হইতে অন্য একস্থানে যাইতেন ইত্যাদি (৮)। ভক্তেরা বলিতেন, ইঁহারা অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া এইসব কর্ম্ম করিতে পারগ হইতেন এবং সিদ্ধির ক্ষমতাবলে অনেকের কাল পূর্ণ হইলে আকাশে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ সশরীরে স্বর্গে যাইতেন। ইঁহাদের একটা মস্ত বড় কেন্দ্র ছিল "উদ্যান' বা "ওড়িয়ান" (বর্ত্তমান কাবুল ও সোয়াট্ উপত্যকা)। কিন্তু এই বিস্তৃত ভূখণ্ডে ইসলামের প্রচার ও বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্দ্ধানের পর পীরদের আবির্ভূত হইতে দেখা যায় এবং মুসলমান ফকিরদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি করিতে দেখা যায়। তাঁহাদিগকেও কিমিতি-বা কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রাসায়নিক বিদ্যার

৭। M. Titus—Op. cit. P. 252.

৮। B. N. Dutta—"Mystic Tales of Lama Taranatha".

প্রয়োগে পিত্তলকে সোনায় পরিণত করিয়া ভক্তদের বিমুগ্ধ করিতে দেখা যায়; আর ব্রাহ্মণ্য যোগী সাধু মহাপুরুষগণ বরাবরই 'কিমিয়াবিদ্যায়' পারদর্শিতা তাঁহাদের সাধনার উচ্চাবস্থার লক্ষণ বা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন!

এই পারস্পরিক ভাববিনিময় সম্পর্কে টাইটাস, বলেন, এই ব্যাপারে ইসলাম হিন্দুধর্ম্মের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার হিন্দুধর্ম্ম ইসলামের উপর করিয়াছে (৯)। সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান দ্বারা বিভিন্নস্থান হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে পুরাতন নবরূপে পুনরাগমন করিয়া থাকে। গ্রীস ও রোমের Paganism, গ্রীক্ Orthodox Church এবং রোমান Catholic Church-এ পুনরাবির্ভূত হইয়াছে (১০)। ভারতেও তদ্রূপ। বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন বিশ্বাস ও প্রথা-সমূহ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র কিন্তু লোকের মনস্তত্ত্ব পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

৪। মুসলমান জাতিতত্ত্ব

মুসলমান সমাজের সভ্যদের ও অন্যান্য ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই। তথাপি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভিতর পার্থক্যের কথা কেন বলা হয়? ইহার একটি কারণ এই মনে হয় যে, অতীতযুগের কতকগুলি বাহ্যিক জাতিতাত্ত্বিক ব্যবস্থাকে ধর্ম্মক্ষেত্রে স্থান দিয়া কৃত্রিম বিভিন্নতার সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত আপাতঃ-পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মরক্কো হইতে মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থান পর্য্যন্ত যেসব মুসলমান জাতি

৯। M. Titus—Op. cit P. 175.

১০। Sayce 'Hibbert Lectures' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

আছে সেই সকল জাতীয় লোকেদের অনেকের সহিতই লেখকের বন্ধুত্ব ও মেশামেশি হইয়াছে; এই আলাপের ফলে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভারতীয় মুসলমানদের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার ও মনস্তত্ত্ব তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র, বরঞ্চ হিন্দুদের সহিতই ভারতীয় মুসলমানদের মিল ও সাদৃশ্যের নৈকট্য রহিয়াছে এবং অন্যদেশীয় মুসলমানেরাও ভারতীয় মুসলমান-দের অপরাপর সকল ভারতীয়দের সহিত একজাতীয় বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সকলেই "হিন্দী" বা "হিন্দলী"।

কিন্তু যেসব আপাতঃ পার্থক্য ও প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহা প্রাচীন জাতি-তাত্ত্বিক ব্যবস্থা-প্রসূত। মস্তকে শিখা ধারণ করা বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণদের গোত্র-পরিচায়ক ছিল। গোত্রানুসারে ১ হইতে ৫টি পর্য্যন্ত শিখা রাখা একটি কূলের লক্ষণ ছিল, কিন্তু আজ 'টিকি' হিন্দুত্বের পরিচায়ক হইয়াছে! প্রাচীনকালে বিভিন্ন কৌম বাহ্যিক বেশভূষা ও পৃথক দেবতাদের দ্বারা পরস্পর বিভিন্নীকৃত হইত। দৃষ্টান্ততঃ, গ্রীকেরা মস্তকমুণ্ডন করিত, শকেরা মাথার অর্দ্ধেক কামাইত (১), পারদেরা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত মাথায় চুল রাখিত, পারসিকেরা লম্বা দাঁড়ি রাখিত, কার্থেজিয়ানগণ লম্বা চুল রাখিত, আর মেগা-স্থিনিসের মতে প্রাচীন ভারতীয়েরা মাথায় লম্বা চুল রাখিত। প্রাচীন ঈজিপ্তের সভ্যতার (২) যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় সর্ব্বপ্রথম যে-এশিয়াবাসীদের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় প্রস্তরে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চাঁচা গোঁপ ও দাঁড়িযুক্ত মুখ খোদিত রহিয়াছে; দেখিলেই ইহা একটি 'সেমিটিক' জাতীয় লোক বলিয়া প্রতীত হয়। অতঃপর ফ্যারোর

১। E. W. Hopkins—"Origin and Evolution of Religion," Pp. 124-125.

২। Moret "From Tribes to Empire"; Hitti, 'History of the Arabs,' p. 33.

সৈন্যদল যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে ফিনিশীয়ায় আগমন করে তখন তাহাদের গোঁপ কামান ও দাঁড়িযুক্ত মুখ দেখিয়াছিল। ইহা ফিনিশীয়দের জাতিতাত্ত্বিক লক্ষণ বলিতে হইবে। পুনঃ প্রাচীন সকল সেমিটিক জাতি শূকরের মাংস ভক্ষণ করিত না। হয়ত এই সকল অনুষ্ঠানের পশ্চাতে জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন টটেমিষ্টিক বা অন্য কারণ নিহিত ছিল যাহা আজ ধরিতে পারা অসম্ভব। কিন্তু এইসব সেমিটিক জাতিতত্ত্বগত অনুষ্ঠান আজ মুসলমানধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিভিন্ন জাতির জাতিতাত্ত্বিক আচার-ব্যবহার আজ ভারতে ধর্ম্মের বিশিষ্ট অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা মনোমালিন্যও সৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানেরা বলেন "ধুতিপরা হিন্দু",—কিন্তু "ইজার" ত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নহে। দক্ষিণ-আরবের লোকেরা দক্ষিণ-এশিয়ার লোকের ন্যায় lion-cloth (কোমরে জড়ান হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড়) পরিধান করেন। দক্ষিণ 'হাকামিনি' বংশীয় সম্রাট দারায়ুসের যে-প্রস্তর-আলেখ্য "বেহিস্থানলিপি"তে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ইজার পরিহিত নাই। ডাঃ ধাল্লা (৩) বলেন যে পারসিকেরা উত্তরের মেডীয় জাতির নিকট হইতে ইজার ও লম্বা জামা (Tunic) পরিধান করিতে শিক্ষা করেন এবং উত্তরের আরবেরা পারসিকদের নিকট হইতে 'আব্বাসীয়' যুগে ইজার ব্যবহার করিতে শিখেন (৪)। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে 'বরুণ' দেবতার পশমী (fur) কোট পরিধানের বর্ণনা আছে। মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন, ভারতীয় ক্ষত্রিয়েরা পর্য্যন্ত লম্বা কোট পরিধান করিত। পুনঃ 'ইজারের' সংস্কৃত নাম 'চালন্‌স্' (Chalans) (৫), এই 'ইজার' মালয় দ্বীপ-

৩। Dr. Dhalla, "Zoroastrian Civilization", p. 258

৪। Hitti, op. cit. p 334 ; Jahiz, "Bayan", Vol. III, p. 9 Dozy, "Noms des vitements", Pp. 203—204.

৫। Hastings, "Encyclopaedia of Ethics and Religion," Vol. V. P. 47.

পুঙ্গেও (যেখানে এককালে হিন্দুর সংস্কৃতি ও রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল) 'চালনস্' নামেই পরিচিত। আবার সমুদ্রগুপ্ত ও ২য় চন্দ্রগুপ্তের আবিষ্কৃত মুদ্রায়ও অঙ্কিত মূর্ত্তির পরিধানে 'ইজার' আছে বলিয়া অনুমিত হয়। আল-বেরুণী ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দু অভিজাতেরা এমন ঢিলা পায়জামা পরিধান করে যে তাহাদের পা দেখা যায় না (৬)। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রথমযুগের আরব ঔপনিবেশিকগণ ভারতীয় ফ্যাসানের ইজার পরিধান করিতেন।

ইজার ও চাপকান হিন্দুর পোষাক। ভারতীয় পোষাক বিভিন্নযুগে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে (৭)। এই প্রকারে দেখা যাইবে যে মাদুরে বা বিছানায় খাওয়া ইসলামীয় লক্ষণ নহে। প্রাচীন গরীব পারসিকেরা (৮) খাদ্য-দ্রব্য মাদুরে এবং ধনী পারসিকেরা টেবিলে খাইতেন, আর প্রাচীন হিন্দুরা জলচৌকিতে (tripod) খাদ্য রাখিয়া খাইতেন। রাজপুতনা, পঞ্জাবের পার্ব্বত্যাঞ্চল, আসাম এবং মণিপুরেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা নাই; বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্ম দ্বারা ছুঁৎমার্গ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরাণে (৩।১১।৮০) কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ত্রিপয়াদির উপরিস্থিত পাত্রে ভোজন করিবেনা বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতি 'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে তিনপায়া জলচৌকির উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে (উক্ত পুস্তক গৌরাঙ্গদেবের অনুজ্ঞায় তদীয় শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক লিখিত হয়)!

সাধারণতঃ হিন্দুদের ধারণা আছে যে শিক-কাবাব, পোলাও, হালুয়া প্রভৃতি খাদ্য মুসলমানদের দ্বারা এদেশে আনীত ও প্রচলিত হইয়াছে। অধ্যাপক আজাদ

৬। Alberuni—tr. by Sachau, p. 180-181

৭। প্রাচীন ভারতীয় পোষাক সম্পর্কে Rajendralal Mitra, "The Indo-Aryans" দ্রষ্টব্য।

৮। Dr. Dhalla—Zoroastrian Civilization, P. 188.

শেষোক্ত দুই প্রকারের খাদ্য মুসলমানদের দান বলিয়াছেন, কিন্তু আরবে চাউল উৎপন্ন হয় না এবং সভ্য হওয়ার পূর্ব্বে চাউলকে বিষাক্ত খাদ্য বলিয়া মনে করিত (৯) ; চাউল প্রাচীন ইরাণেও অজ্ঞাত ছিল। অন্যপক্ষে 'হেন' নামক এক জার্ম্মান পণ্ডিত (১০) অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে ম্যাসিডোনীয়েরা ভারত হইতে পারস্যে চাউল আমদানী করিত, তথা হইতে উহা আবার গ্রীসে আনীত হইত। তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় চাউলের নাম ছিল 'ব্রীহি', এই শব্দ পারস্য এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্যান্য ভাষায় Birinj, Vrize, Brinj প্রভৃতি রূপ ধারণ করে এবং গ্রীসে গিয়া উহা আবার aruza রূপ ধারণ করে (ইংরেজী Rice, ফরাসী Riz, জার্ম্মাণ Reis)। অন্যপক্ষে 'পোলাও'-এর সংস্কৃত নাম ছিল 'পলান্ন' (কোন কোন পুস্তকে আবার 'মাংসোদন' বলা হইয়াছে)। বাঙ্গালা কাশীরাম দাসের মহাভারতেও এই শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় "পলান্নে মিষ্টান্নে তারে করায় ভোজন"। সংস্কৃত পলান্নই ফার্শী 'পোলাও', তুর্কি 'পিলাফ্' (অর্থ 'সাদা ভাত') রূপ ধারণ করিয়াছে। আইন-আকবরীতে যে-কয়েক প্রকারের পোলাও-এর উল্লেখ আছে তন্মধ্যে আট প্রকারের ভারতীয় পোলাও বলা হইয়াছে। তদ্রূপ সংস্কৃত 'শূল্য-মাংস' হালের 'শিক কাবাব' হইয়াছে। এই প্রকারে 'উল্লুপ্ত মাংস' (সুশ্রুত সংহিতা ৩৯৩) 'সামী কাবাব' নাম ধারণ করিয়াছে।

এই প্রকারে দেখা যায় যে হালুয়ারও 'সংযাব' বলিয়া একটা সংস্কৃত নাম আছে। হিন্দুরা ইহাকে 'মোহনভোগ' বলেন। তবে হালুয়া নামটি বৈদেশিক, যদিও বিভিন্নদেশে ইহার মাল (contents) বিভিন্ন আকার ধারণ করে। পুনরায় কেহ

৯। Ibn-al-Faqih—Pp. 181—182 ; Hitti—Op. cit. p. 335.

১০। Hehn, 'Kultur Pflanzen···aus Asien', p. 485ff ; O. Schrader, "Real lexicon der Indogermanischen Altertuemerkunde"—P. 668.

কেহ বলিতেছেন 'রুটি' শব্দটি আরবদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, আবার কেহ কেহ দাবী করিতেছেন যে ইহা পর্ত্তুগাল হইতে আমদানীকৃত। কিন্তু লেখক কন্স-টাণ্টিনোপলে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত শব্দটি, আরবি, ফার্শী অথবা তুর্কী নয়। পশ্চিম-এশিয়ার লোকেরা খাম্বিরা (yeast) দ্বারা প্রস্তুত রুটি (loaf) আহার করেন, ইউরোপেও তদ্রূপ। কেবল 'Passover' পর্ব্ব উপলক্ষে ইহুদীরা unleavened bread (বিনা খাম্বিরায় প্রস্তুত রুটি) ব্যবহার করেন, কিন্তু ভারতে বিনা খাম্বিরায় প্রস্তুত রুটি বা চাপাটি চিরকালই ব্যবহৃত হইতেছে। লেখক অনুমান করেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত 'পুরোডাস্' হইতে আসিয়াছে ; যথা : 'পুরোডাস্'—পরোটা —রোটি। ফার্শীতে খাম্বির প্রস্তুত রুটিকে 'নান' বলে। পঞ্জাবের অনেকে তাহা ব্যবহার করেন, আফগানরাও তদ্রূপ ব্যবহার করেন।

এইগুলি এস্থলে আলোচনা করিবার কারণ এই যে, এবম্প্রকারের অনুষ্ঠান লইয়াই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন ও কটাক্ষপাত করা হয়। লেখক দিল্লী ও বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুদের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছেন ; সেই উপলক্ষে তিনি দেখিয়াছেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুরই ন্যায় রীতি প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার মুসল-মানেরা আহারের প্রথমে মিষ্টান্ন, পরে পাকৌড়ি আহার করেন না, কিন্তু পঞ্জাব ও দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুর ন্যায় মুসলমানও এই প্রথা অনুসরণ করেন! এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিন্দুর সহিত ভারতীয় মুসলমানদের রীতিনীতির যেটুকু প্রভেদ বা পার্থক্য বিদ্যমান আছে তাহা আরবদেশজাত নহে বরঞ্চ তাহা জারতুষ্ট্রীয়-পারসিক সভ্যতা-প্রসূত। ইহার কারণ এই যে ইসলামের অর্দ্ধেক হইতেছে পারস্য দেশ-সঞ্জাত।

৫। পারস্পরিক সামাজিক অ-সহযোগ

বর্ত্তমানে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের আলোচনাপ্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সামাজিক অসহযোগের কথা না বলিলে এদেশের সমাজতত্ত্বের একটি প্রধান তথ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান কেহ কাহারও বাড়ীতে আহার করেন না; উভয়ের মধ্যে connubium (বিবাহ) নাই এবং commensality-ও (একত্রে বসিয়া আহার) নাই। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে হিন্দুই গোঁড়ামী করিয়া বিদেশী অথবা বিধর্ম্মীর সহিত আহার করেন না। এই তথ্যটি বর্ত্তমানযুগে সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি কি বরাবরই এইরূপ ছিল?

ইহা সত্য বটে যে বৈদেশিক মুসলমানদের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হওয়ার পর হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার্থ কুর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিতে থাকে। এই সময়ে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরায় বৌদ্ধ ও তাজিকদের (আরব) সহিত বাক্যালাপ নিষিদ্ধ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণে তুরস্কের সহিত সংস্রব পরিত্যগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি সদিচ্ছামাত্র (pious wish)! কারণ ইতিহাস বলিতেছে যে বিজ্ঞানেশ্বরের দেশের রাষ্ট্রকূট রাজারা সিন্ধুদেশের আরবদের ক্রমাগত সাহায্য প্রদান করিয়া তাহাদের শত্রু গুর্জ্জর প্রতিহার রাজাদের বিপক্ষতাচারণ করিয়াছিল। তাহাদের কাছে ধর্ম্ম অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হইয়া দেখা দেয়! তৎপর পদ্মাপুরাণ খোদই দুঃখ করিতেছে যে, কলিকালে লোকে তুরস্কদের সহিত মিলিতেছে! ইতিহাস বলে (১) যে প্রথম হইতেই মগধে একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষু তুর্কদের সহিত মিলিয়াছিল এবং বাঙ্গালায় গোড়া হইতেই একদল ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক ও অভিজাত বক্তিয়ার খিলিজির সহিত মিলিত হয়।

১। *Lama Taranath,* History of Buddhism in India' tr. into German by Schiefner; বাঙ্গালা বিষয়ে মুসলমানদের লিখিত ফার্সি ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হইতেছে, কোন্ সময় হইতে উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়? মুসলমানেরা বলেন, হিন্দুরা 'স্পর্শদোষ' প্রণোদিত হইয়া আগে তাঁহাদের সহিত আহারাদি বন্ধ করেন, পরে মুসলমানের উহার পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দুর হাতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। এই অভিমত কি কোন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর স্থাপিত? সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি খাঞ্জাহান লোদীর আদেশে নিয়ামতুল্লা নামক এক ব্যক্তি দ্বারা 'আফগান জাতির ইতিহাস' নামক একখানা পুস্তক লিখিত হয় (২)। উক্ত পুস্তকে দেখা যায় যে ঘোরের একজন রাজপুত্র পলাইয়া আসিয়া দিল্লীর এক মন্দিরের মধ্যে তিন বৎসর লুক্কায়িত থাকেন। এই ঘটনাটি পৃথ্বিরাজের সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কবি চাঁদের "পৃথ্বিরাজ রাসো" নামক বীর-কাব্যে এই ঘটনাটিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে চিত্রলেখা নামক এক 'গক্কর' কুমারীকে লইয়া সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সহিত ঘোরের এক রাজপুত্রের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং দিল্লীতে সে পৃথ্বিরাজের শরণাগত হয়। ইহা হইতেই পৃথ্বিরাজ ও ঘোরীর মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে যুদ্ধ হয়।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এই ব্যাপারে হিন্দুর স্পর্শদোষ কোথায় গেল? আর এই মুসলমান রাজকুমার কি হিন্দুর মন্দিরে বা হিন্দুর আশ্রয়ে থাকিয়া হিন্দুর সঙ্গে অথবা তাহাদের হাতে খান নাই? ফার্শী কবি সেখ সাদী তাঁহার "বোস্তান" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তিনি যখন সোমনাথ মন্দির দর্শনে আসেন তখন পাণ্ডাদের দ্বারা প্রতিমার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শিত হইলে তিনি তাহাতে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। এই অবিশ্বাসের হাসিতে পাণ্ডারা তাহাদের দেবতার অলৌকিক ক্ষমতা

২। Neeamatullah, "History of the Afghans", tr. by Dorn.

প্রদর্শনের পশ্চাতে যে কোনরূপ জুয়াচুরী বা শঠতা নাই তাহা তাহার নিকট সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে মন্দিরের গর্ভগৃহে একদিন রাখিয়াছিল (তিনি বলেন, এই জুয়াচুরি তিনি ধরিয়া ফেলেন)। এইস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে তখন হিন্দুর স্পর্শদোষ কোথায় ছিল? আর সাদী যখন পশ্চিম-ভারতে ভ্রমণ করিতেন তখন তিনি আহার করিতেন কোথায়? মুসলমানদের দ্বারা ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে ইবন্ খোরদাদবে প্রভৃতি অনেক আরব-পর্য্যটক ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণকালে তাঁহারা কি তাঁহাদের স্বপাকেই খাইতেন, না হিন্দুর বাড়ীতেই থাকিতেন ও খাইতেন? আল-বেরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। তাঁহার পুস্তকের এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের আত্মীয়দের সহিত একপাত্রে আহার করেন। অবশ্য অনেক ব্রাহ্মণ ইহা পছন্দ করেন না (৩)। এখানে জিজ্ঞাস্য যে আল-বেরুণীর সহিত ব্রাহ্মণদের মিলিবার কালে বরাবরই কি তাঁহারা নিজেদের গা বাঁচাইয়া চলিতেন এবং পারসিক পণ্ডিতকে কেবল স্বপাকে খাইতে হইত? ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, খৃঃ ১০ম শতাব্দী হইতে তুর্কি-বিজয় পর্য্যন্ত অনেক

৩। Alberuniর উক্ত সাক্ষ্য হইতে এই তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে এক সময়ে হিন্দুরাও অনেকের সহিত এক থালায়ও খাইতেন। কিন্তু এই রীতি আজ মুসলমানী বলিয়া গণ্য হয়!

পুনঃ—বায়ুপুরাণে (৩০।৬৪।৬৭) দেবতাদের মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সকলে একত্রে ভোজন করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা কি ভূতপূর্ব্ব মানব অমর দেবতাদের মর মানবের রীতি অনুসরণ-সঞ্জাত? দেব-সমাজ মানব-সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সেই জন্য এক সময়ে সর্ব্ব বর্ণের লোকেরা একত্রে ভোজন করিত বলিয়া জানা যায়।

মুসলমান ফকির ভারতে আসেন এবং হিন্দু রাজাদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হন। সেখ চিস্তিকে আজমীরের রাজসভায় এবং সেখ তাব্রিজীকে বাঙ্গালায় লক্ষ্মণসেনের সভায় ('সেখ শুভোদয়া' দ্রষ্টব্য) দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালের হিন্দুরা বিদেশী বা ভিন্নধর্ম্মীদের হইতে ছুৎমার্গী ও আত্মসঙ্কোচিত হইয়া থাকিতেন না (৪)।

অন্যদিকে মুসলমানপক্ষীয় উত্তরের প্রতিবাদে এইসব তথ্য হাজির করিয়া দেখান যায় যে মুসলমানগণ স্বীয় ধর্ম্মানুশাসনের আজ্ঞাধীন হইয়া বিধর্ম্মীর হাতে খাননা। ইবন্ বেটুটা নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তে বলিয়াছেন যে যবদ্বীপ দর্শনের পর জাহাজের চীনা পরিচালনাধ্যক্ষ (কাপ্তেন) তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে চীনে যাইতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অস্বীকার করেন; কারণ তাহারা বিধর্ম্মী, তাহাদের খাদ্য খাওয়া আইন বা ধর্ম্মসঙ্গত নহে (but I declined, because being infidels it is not lawful to to eat their food) (৫)।

চৈতন্যের সময় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে কাজী মুলুকপতির নিকট যখন এই অভিযোগ আনীত হইল যে তিনি মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মুলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।

তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত।" (চৈতন্যভাগবত—আ, ১৬শ অধ্যায়)

ইহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে মুসলমানধর্ম্মেই বিধর্ম্মীর হস্তে

৪। পৌরাণিক গল্পে আছে যে নারদ শ্বেতদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের "Narad's Visit to Svetadwip" দ্রষ্টব্য। তন্ত্রেও উল্লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তন্ত্রের চীনাচার"ই তাহার দ্যোতক।

৫। Selections from the Travels of Ibn Battuta, tr. by H. Gibb, P. 279.

আহার করা নিষিদ্ধ আছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই মুসলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে খাইতেন না। তাহা হইলে হিন্দুর ছুঁৎমার্গের পাল্টা জবাবেই যে মুসলমানেরাও হিন্দুদের হাতে খান না, এই জবাব টিকিতে পারে না।

যদি কোথাও (ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বাদে) মুসলমান হিন্দুর হাতে খান তাহা হইলে ব্রাহ্মণদের ন্যায় অন্ততঃ বাঙলায় 'কাচ্চী' বা 'পাক্কী' খানার পার্থক্য রক্ষা করেন। এই আহারও গ্রামাঞ্চলে ফকির, ভিখারী শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যেখানে মুসলমান চাষী প্রজারা হিন্দু জমিদারের বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে খায় সেই স্থলে 'পাক্কী' খানা, অর্থাৎ ফলমুল, লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খায়। এতদ্বারা বুঝা যায় যে এই বিষয়ে মুসলমান সমাজে স্পর্শদোষ প্রবেশ করিয়াছে।

মুসলমানদের লিখিত ইতিহাস বলে যে সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশ্মীর গমনকালে পানপুর নামক স্থানে দেখিতে পান যে তথায় মুসলমান রাজাদের 'রাজা' উপাধি আছে; তাঁহারা হিন্দুদের কন্যা বিবাহ দেন। তিনি ইহা বন্ধ করিয়া দেন (৬)। সাজাহানও পঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই প্রকারের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দেন (৭)।

পূর্ব্ববঙ্গের একটা প্রবাদ কাহিনী আছে যে সোনারগাঁ-এর একজন মুসলমান হন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তিনি স্বগৃহেই বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মগুরু বলেন, "আমি তোমার বাড়ী যাওয়ার সময় তাহা কি

৬। 'Waqicat-i-Jahangiri', tr. by Elliot & Dowson, Vol, VI, P. 376; Qazvini, 'Badsanama' ff, P. 444-445; quoted by শ্রীরামশর্ম্মা, in 'মুসলমান রাজত্বে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার', 'হিন্দু মিশন', ৪৯শ সংখ্যা।

৭। Abdul Hamid Lahori—Quoted in Sarkar's 'History of Aurangzeb'.

প্রকারে অন্য হিন্দুদের বাড়ীর মধ্য হইতে চিনিয়া লইব ?" তখন ভক্ত বলিলেন, "আমি বাড়ীর সম্মুখে নিশানা (চিহ্ন) স্বরূপ একটা ঝাঁটা বাঁধিয়া রাখিব।" কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর হিন্দুরা গুরুকে হয়রান করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ বাড়ীর সম্মুখে ঝাঁটা বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে ভক্তের বাড়ী চিনিয়া লইতে না পারার অজুহাত বা নানা কারণ লইয়া গুরু স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট নালিশ করিয়া বলেন যে পল্লীশুদ্ধ হিন্দুদের মুসলমান করা হউক। অবশেষে কার্য্যতঃ তাহাই হওয়ায় সমস্যা মীমাংসিত হয় (৮)।

আবার ইহারও প্রমাণ আছে যে মুসলমান আক্রমণের সময়ে এবং শাসনের প্রথমযুগে অনেক হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরও পৈতৃক ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আল-বেরুণী একথা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; 'চাকনামা'য় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুনঃ, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের কুলজীগ্রন্থে দেখা যায় যে কোন কোন বংশে 'যবনদোষ' ঘটিয়াছিল, কোন কোন বংশে মুসলমান রক্তও প্রবেশ করিয়াছিল। কেহ আবার মুসলমান হইয়াও পুনরায় পুরাতন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। "মেলকুলীন সমাজে মুসলমান-প্রভাব" হইয়াছিল: "সর্ব্বানন্দস্য আর্ত্তি চট্ট জটাখোড অত্র ভুর্ব্বারখানস্য কন্যা বিবাহ জাতিদোষঃ (কুলপঞ্জিকা, পৃ ২৪।১); বৃহস্পতিজ গোপাল বন্দ্যোর প্রথমে ত্বকচ্ছেদ দোষ ঘটে (দোষতন্ত্র প্রকাশ)। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি একবার মুসলমান হইয়াছিলেন। পুনঃ "কাশীসুত হরিহর ফুলিয়ার মুখোটী। ভাল বিভা হৈল তোমায় জুনিখানের বেটি"।। (কুলতত্ত্ব-প্রকাশিনী)। আবাব 'খড়দহমেল'-এর প্রধান কুলীন মুখোটীবংশীয় কামদেব পণ্ডিতের সপ্তপুত্রই নানা দোষাশ্রিত ছিল; তন্মধ্যে তাঁহার শ্রীকণ্ঠ নামক এক পুত্রে যবন পরিবাদ এবং তাঁহার আর এক পুত্র ভাস্করে "যবনী-গমন দোষ" (মেলরহস্য) ঘটে (৯)।

৮। Romance of an Eastern Capital দ্রষ্টব্য।

৯। নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৫৩।

বিখ্যাত কুলীন পুরাই গাঙ্গুলীর পুত্র শৌরী যবনদোষে কুলচ্যুত হয়েন। পরে শুভরাজ খান শৌরীর কন্যার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়া যবনদোষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রবাদ এইরূপ যে "শৌরীর স্ত্রীর গর্ভে যবনের ঔরসে ঐ কন্যা জন্মে" (দোষোল্লাস)।

মুসলমান-শাসনের প্রথমযুগের বাঙ্গালার সমাজের অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটি হইতে কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইবে। দোষতন্ত্রপ্রকাশে (১০) উল্লিখিত আছে :

"কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্দারে।
নন্দো বন্দ্যো সুতা ঘরে আফিঙ্গ বিহরে" ॥

আবার

"কাশীশ্বর সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখুটী।
ভাল বিভা ছিল তার জুনিখার বেটী ॥"

পুনঃ বারেন্দ্র শ্রেণীর "কুল-সম্বন্ধ নির্ণয়—বিশেষ কাণ্ড" গ্রন্থ বলিতেছে,

"ভাদুড়ী প্রচণ্ড খাঁ রোহিলা মহিলা।
বাদসার দেওয়ান হয়ে, সাথে লয়েছিলা।
সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি দুভাই।
দেশে আসি মাতা কয় হাম রোহিলা জাই।"

পুস্তভাষায় 'জাই' (Zye) শব্দের অর্থ 'পুত্র'। এই দুই ছেলে ঠিকই বলিয়াছে, যে তাহারা রোহিলার পুত্র।

"ওকিকাৎ-ই-মুস্তফী" নামক তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে সেরখান মুসলমানদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান শেখ এবং হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত আহার-বিহার করিতে ভালবাসিতেন (১১)। বসু মহাশয়ের পুস্তকে উদ্ধৃত এই সকল দৃষ্টান্ত

১০। "নদীয়া-কাহিনী", পৃ ২৬৯—২৭০

১১। নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাহ্মণকাণ্ড।

হইতে অনুমিত হয় যে মুসলমান শাসনের প্রথমযুগে উভয় সমাজের মধ্যে ততটা ব্যবধান ছিল না যতটা আজ নিরীক্ষিত হইতেছে (১২) সমাজতত্ত্ব বলে যে যখন দুইটি স্বতন্ত্র পৃথক জাতি একস্থানে বাস করে তখন তাহাদের মধ্যে Domestication of ideas and habits হয়। ভারতবর্ষেও হিন্দু এবং মুসলমান , এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহাই হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহনশীলতা উদ্ভূত হইয়াছিল। তৎপর হিন্দুসমাজের লোকই যখন অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল তখন এই ব্যবধান আরও কমিয়া যায়, কারণ বিজাতীয় মুসলমান অপেক্ষা স্বজাতীয় মুসলমান আরও নিকট।

যখন মুসলমান শাসকেরা গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিয়া Theocratic (ধর্ম্ম-রাষ্ট্রীয়) শাসন আরম্ভ করিলেন (১৩) তখনই হিন্দুর উপর নির্য্যাতন সুরু হইল; কোন কোন হিন্দু মুসলমান পুনঃ পুরাতন ধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইসলাম ধর্ম্মানুযায়ী তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান হইতে লাগিল, যখন নূতন মুসলমানদের উপর পুরাতন সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার জন্য ফতোয়া জারী করিতে লাগিল, যখন হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে অ-ভারতবাসী করিয়া তোলা চলিতে লাগিল তখনই মনে হয় উভয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ বাড়িয়া গেল। আজ যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ব্যবধান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে মুসলমান পুরোহিতেরা মুসলমানদের হিন্দু আচার-ব্যবহার ও পুরাতন স্মৃতি সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিবার জন্য ফতোয়া দিতেছেন (Ahl-i-Hadith,

---

১২। এই বিষয়ে অধুনালুপ্ত "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ দ্রষ্টব্য।

১৩। মুসলমানধর্ম্মরাষ্ট্রানুযায়ী শাসনে হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ Dr. Iswari Prasad-এর "History of Mediaeval India," বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ" দ্রষ্টব্য।

Tabliq, Tanzim—প্রভৃতি আন্দোলনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়) (১৪)। আজ আফগানীস্থান হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সকল স্থানে মুসলমানদের জাতীয়-পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত করাইয়া দেওয়া হইয়াছে! তাঁহারা আজ সকলেই পৈতৃক বাসভূমে বিদেশাগত ঔপনিবেশিক বলিয়া নিজেদের মনে করেন! আজ যে এইসকল জাতির মধ্যে কিছু কিছু জাতীয়তাবোধের চেতনার উদ্বোধনের কথা শোনা যাইতেছে তাহা ইউরোপীয় সভ্যতা-প্রসূত জাতীয়তাবাদের (nationalism) নিকট ঋণী। ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল পশ্চিম-এশিয়ার ওসমানলী-তুর্ক এবং ইরানী জাতি দুইটি। ইহারা নিজেদের মূলজাতিগত (racial) বৈশিষ্ট্য কখনও ভুলেন নাই।

—উভয়ের আচারের সাদৃশ্য—

এই স্থলে গুটিকতক হিন্দুর প্রচলিত ও অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে; এগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, এক সময় হিন্দুর আচারের সহিত মুসলমানের আচারের কতটা নৈকট্য ও সাদৃশ্য ছিল। বিষ্ণুসংহিতা বলিতেছে, লেখ্য, অর্থাৎ দলিল ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে, 'রাজসাক্ষিক' (রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষ করচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্। ৭।৩) এতদ্বারা করচিহ্ন (দস্তখত বা মোহরের বদলে করতলের ছাপ) সাহায্যে দলিল দস্তখত করার প্রথাও ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়, রাজসভায় সভাসদের হাঁটু গাড়িয়া অর্থাৎ "বীরাসন" করিয়া বসা হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি ('বীরাসনং সদা তিষ্ঠেৎ'—শঙ্খ, ১৮।২);

১৪। পূর্ব্ববঙ্গের একজন মুসলমান শিক্ষক লেখককে বলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিরা এখনও আছেন; পূর্ব্বে জন্মপত্রিকাতে তাঁহাদের পূর্ব্ব কুলপরিচয় ও গোত্রাদি উল্লিখিত হইত কিন্তু আজকাল মৌলুবীরা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শোনা যায় পার্ব্বত্য রাজগণের সভায় এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজদরবারে আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা আছে; পারস্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। জাপানীদের বসিবার ভঙ্গীও এই প্রকারের মত। বোধ হয়, পারস্যবাসীরা মঙ্গোলদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা একটি প্রাচীন প্রথা। তৃতীয়, বাৎসায়ণের কামসূত্র নামক পুস্তকের সপ্তম অধিকরণে (২—১৪।১৫) দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে একটি আচারের কথা উল্লিখিত আছে। ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় যুবক ও বালকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা মুসলমানদের "সুন্নত" (মুসলমান ও ইহুদীর লিঙ্গত্বকচ্ছেদ-সংস্কার, Circumcision) প্রথার ন্যায়। এই সম্পর্কে স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন, "মুসলমানদের যেমন 'সুন্নত' এই সূত্রেও সেই ভাবের কর্ম্মের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা যে ভোগার্থ (ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) তাহাও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।...এই যে বহির্বিপ্লবজনিত অভ্যন্তর-দ্বন্দ্বের বিরাম ইহারই অন্যতম পরিণতি 'সুন্নত' জাতীয় ত্বকচ্ছেদ নিবৃত্তি। বিশেষতঃ এই কার্য্য ঐ জাতির ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ঐদিকে সকলেরই বিদ্বেষ বা অকর্ত্তব্যতাজ্ঞানও উদ্বুদ্ধ হইল" (ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮) (১)। এক্ষণে কথা, এই 'সুন্নত' জাতীয় প্রথা দক্ষিণের হিন্দুরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজকালকার মত, কামসূত্র দ্বিতীয়,-তৃতীয় শতকে লেখা হইয়াছিল; কারণ, এই পুস্তকে শতবাহন রাজবংশের উল্লেখ দেখা যায়, অন্যদিকে দেখা যায় যে আরব ও ইহুদীরা দক্ষিণ-ভারতে গমনাগমন করিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কচ্ছের 'ভুজ' নামক স্থানে তিনখানি তাম্রলিপি

১। তর্করত্ন মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, এই সূত্রের কোন ভাষ্য বা টীকা আজকালকার ভারতীয় ভাষায় আজ পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই; তিনি করিবেন বলিয়াও উহার বঙ্গানুবাদ করেন নাই। বস্তুতঃ ৭ম অধিকরণের কোন ভাষ্য এবং আধুনিক ভাষায় অনুবাদ আজ পর্য্যন্তও হয় নাই। হিন্দু লেখকেরা এই বিষয় একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন।

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ; ঐগুলি আরব ও ইহুদীদের স্মরণার্থে কবরস্থানে প্রোথিত ছিল। এইগুলি ১২৫ খৃষ্টাব্দের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং, ইহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এই সকল জাতি তথায় যাতায়াত করিত। ইহাদের মধ্যে ইহুদীদের ভিতর এই উপরোক্ত প্রথাটি ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য। এই সেমিটিক জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া দক্ষিণের হিন্দুরা উক্ত প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, মোগল বাদশাহদের ন্যায় প্রাচীন হিন্দু রাজারাও বরফ (নীহার) খাইত (বশিষ্ঠ-সংহিতা, ১৯ অধ্যায়, "নীহার সার্থনামস্মান্ন মূল্যমাত্রং নৈহারিকং স্যান্মহামহস্থঃ স্যাৎ...) (২)। পুনঃ স্মৃতি বলিতেছে যে, ময়ূর, কপিঞ্জর, বাদ্ধ্রীণস্ ভক্ষণ করা যাইতে পারে। শঙ্খ সংহিতা বলিতেছে যে, যমসংহিতায় এই সব খাওয়ার ব্যবস্থা আছে (শঙ্খ, ১৭।২৭)। কেহ কেহ শেষোক্ত জীবটীকে পক্ষী বলিতে চাহেন, কিন্তু অন্যত্র ইহা খাসী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক সময়ে ইহার মাংস বিষ্ণু পূজায় প্রদত্ত হইত। নূলা পঞ্চানন বলিয়াছেন, "বিষ্ণু পূজায়...কৃতক্লীব শাস্ত্রের বিধান"। 'হালুয়া'র সংস্কৃত নাম 'সংজাব' (ব্যাস সংহিতা ৩।৫৫)।

[চার]

১। খৃষ্টীয় সমাজতত্ত্ব

ভারতের খৃষ্টীয় মণ্ডলী একটি ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রদায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে এই সমাজ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। খৃষ্টানধর্ম্মের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। দক্ষিণের খৃষ্টানেরা বলেন, খৃষ্টের শিষ্য সাধু টমাস্ (St. Thomas) প্রচারার্থে ভারতে আগমন করেন, সুদূর দক্ষিণে

২। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যুগে যখন বরফের ব্যবহার প্রচলন আরম্ভ হয় তখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহা ব্যবহার করিতেন না !

তাঁহার সমাধি আছে। কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। মালাবার অঞ্চলে সিরিয় (Syrian) খৃষ্টানমণ্ডলীভুক্ত একদল লোক বহুকাল হইতে আছেন ; তাঁহাদিগকে "নাজারা" (Nazarene) বলা হয়। ইঁহাদের আকৃতি ও আচারে প্রতিবেশী ভারতীয়দের সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ইহারা এবং স্থানীয় ইহুদীরা নাম ও বাহিরের আচরণে স্থানীয় হিন্দুদের অনুকরণ করেন। এই খৃষ্টীয় মণ্ডলী যে অতি প্রাচীন তদ্বিষয়ে তাঁহারা অতি সচেতন। একবার একটি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের এক স্কুলে গিয়া তাঁহাদিগকে মুরুব্বি চালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কতদিন তোমরা খৃষ্টান হইয়াছ ?" প্রত্যুত্তরে ছাত্রেরা বলে, "তোমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা যখন জার্ম্মানীর জঙ্গলে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত তখন হইতে আমরা খৃষ্টান" (১)।

এইরূপ কথিত আছে যে, এই মণ্ডলী খৃষ্টীয় যুগের প্রাক্কালে সিরিয়া দেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পরে অনেক ভারতবাসীকেও স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের আকৃতি স্থানীয় ভারতবাসী হইতে পৃথক নহে, যদিচ হিন্দুদের সহিত ইহাদের সামাজিক আদান-প্রদান নাই। একজন শিক্ষিত সিরিয় খৃষ্টান লেখককে বলেন, ইহা হইতে পারে যে, দুই একজন লোক সিরিয়া হইতে ঐ স্থলে ঔপনিবেশিকরূপে আসিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে, দুই একটি সিরিয় ভাষার শব্দ ধর্ম্মের ভিতর দিয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা আসলে ভারতীয় মদ্র জাতির (race) লোক (২)।

১। Henry Bruce—Letter from Malabar.

২। মালাবারের এই খৃষ্টানেরা যে সিরিয়া হইতে আসিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। আরব খলিফাদের শাসনকালে সিরিয়াতে (সাম) দুই দল খৃষ্টীয় মণ্ডলী ছিল। জাকবাইট ও নেষ্টোরিয়। এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্তেরা বোগদাদের খলিফার অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। তাঁহাদের পাট্রিয়ার্ক বোগদাদে থাকিতেন। সেখান হইতে তাঁহারা ভারত ও চীনে মিশনারী-কার্য্য পরিচালনা করিতেন। মালাবারের "Christians of St Thomas" নেষ্টোরিয় পাট্রিয়ার্কের অধীনে ছিল। এই সম্পর্কে Hitti—"History of the Arabs," p. 356 দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক-মণ্ডলী সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহাদের অনেকেই পর্ত্তুগীজ ভারতে বাস করেন। পর্ত্তুগীজেরা অনেক ভারতবাসীকে জোর করিয়া খৃষ্টান করিয়াছে। পশ্চিম ভারতের পর্ত্তুগীজ এলাকার গোয়া নামক স্থানের খৃষ্টানদের গোয়ানীজ (Goanese) বলা হয়। পর্ত্তুগীজ ভারতের খৃষ্টানেরা পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে ইউরোপীয় চালচলন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়গণ এসিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার যেখানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে সেখানে স্থানীয় লোকদের জোর জবরদস্তি করিয়া খৃষ্টান ও ইউরোপীয় ভাবাপন্ন করিয়াছে। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের "ফিলিপিনোরা" এবম্প্রকারের একটি জাতি।

সাধু জেভিয়ার (St. Xavier) ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসেন তখন রোমের পোপ ভারতে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে এই মর্ম্মে একটি বিশিষ্ট "বুল" (৩) (অনুজ্ঞা) প্রকাশ করেন যে, খৃষ্টান হইলে হিন্দুর পূর্ব্ব আচার রীতি, সামাজিক পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার ফলে, গোয়ানীজ প্রভৃতিগণ খৃষ্টান হইয়া জাতিভেদ ও তৎ-প্রসূত আচার পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের ইউরোপীয় নাম ও পোষাকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে হিন্দুর বর্ণভেদ। গোয়ানীজদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে 'চিৎপাবন' ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করেন, কেহ বা আবার নিজেকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় গোয়ানীজদের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি চলিত না, এক্ষণে আহারাদি চলে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু বিবাহাদি এখনও চলে না।

পর্ত্তুগালে যখন 'রিপব্লিক' (সাধারণতন্ত্র) শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তখন উহার রাষ্ট্রীয় সভাপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন জনৈক 'গোয়ানীজ'

৩। মিশনারী সোসাইটির সেণ্ট্ সেভিয়ারের জীবনী দ্রষ্টব্য।

ভদ্রলোক। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কুটুনিয়ে (৪)। তিনি ১৯১৪ খৃঃ আমেরিকা পরিভ্রমনকালে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত সমিতিতে ভারতবাসীদের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য সস্ত্রীক আসেন। তিনি নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন।

দক্ষিণের মাদ্রাজ অঞ্চলে ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে উচ্চ জাতীয় ও 'পারিয়া' জাতীয় খৃষ্টানদের সামাজিক ব্যবধান এখনও দূরীভূত হয় নাই বলিয়া শোনা যায়; পারিয়া জাতির খৃষ্টানদের জন্য পৃথক গির্জ্জা আছে।

উত্তরে প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য নাই বলিয়া হালে খৃষ্টীয়-মণ্ডলী দাবী করেন। এই সমাজে আগেকার উচ্চজাতীয় লোকদের প্রাধান্য আর নাই, কাঞ্চন-কৌলিন্যই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে তাঁহারা ভারতীয় পদ্ধতিই আঁকড়াইয়া আছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের সহিত হিন্দুদের বাহ্যিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এমন কি, উদার খৃষ্টানদের সহিত উদার হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ চলিতেছে!

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম যুগে খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণকারী ভারতীয়দের গোয়ানীজদের ন্যায় ইউরোপীয়করণ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরলোকগত শ্রদ্ধেয় জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের নিকট লেখক শোনেন, পাছে খৃষ্টান-বাঙ্গালীরা স্বজাতীয়-দের সহিত পুনঃ মিশিয়া পুরাতন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এইজন্য Rev. Duff ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, নব-দীক্ষিতদের পোষাকে এমন পার্থক্য থাকা দরকার যদ্দ্বারা তাহারা সাধারণের নিকট চিহ্নিত হইতে পারে এবং স্বজাতীয়দের সহিত আর মিশিতে না পারে। এই নীতি মধ্যযুগীয় রীতিপ্রসূত। এই সময়ে প্রথা ছিল, লোকে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে নূতন ধর্ম্মগুরুর জাতির পোষাক ও আচার

৪। এই প্রকারে তুর্কি সাম্রাজ্যর প্রধান মন্ত্রী (Grand Vizier) কিয়ামিল পাশার (১৯১৩ খৃঃ) প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকার একজন মুসলমান বাঙ্গালী।

গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য আফ্রিকা ও এশিয়াতে খৃষ্টান হইলে বেশভূষায় ইউরোপীয় সাজিয়া স্বজাতির সহিত আলাদা হইতে হয়, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন সাধিত করা হয়। ভারতে মুসলমান হইলে তাহার এই পরিবর্ত্তন করিতে হয়। মধ্যযুগীয় 'রসুল-বিজয়' পুস্তকে ব্রাহ্মণকে মুসলমানকরণে উক্ত পরিবর্ত্তনের বর্ণনা আছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে কাট্রু (Catrou) নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্য্যটক তাঁহার মোগলবংশের ইতিহাস পুস্তকে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট নৈষ্ঠিক কাজি ও ইমামদের আহারে নিমন্ত্রণ করেন; সেই সময় তাঁহার আহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস এবং মদও ছিল ...ইহাতে নৈষ্ঠিকদল তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, আল-কোরআনে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন ধর্ম্মে মদ্য ও সকল প্রকার খাদ্য খাওয়ার অনুমতি আছে। ইহাতে তিনি উত্তর পান যে, কেবল খৃষ্টানধর্ম্মেই এই প্রকার অনুজ্ঞা আছে। প্রত্যুত্তরে তিনিও বলিলেন, "তাহা হইলে আমরা খৃষ্টান হই। পোযাককে কষাবাঁধা কোটে (close coats) এবং পাগড়ীকে হ্যাটে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য দর্জ্জি ডাকা হউক।" ইহাতে নৈষ্ঠিক-দল নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন...এবং সুর নামাইয়া বলেন যে সম্রাট এই সকল নিষেধবিধি দ্বারা আবদ্ধ নন" (৫)।

এইস্থলেও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা পুরাতন জাতি-তাত্ত্বিক বাহ্যিক চিহ্নগুলিও পরিবর্ত্তন করার সংবাদ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপীয়দের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া ভারতীয় খৃষ্টানদের ইউরোপীয় সাজিতে হইত। পশ্চিম ভারতের ন্যায় বাঙ্গালায় যেসব পর্ত্তুগীজ নামধারী খৃষ্টান আসেন তাঁহারা সকলেই পর্ত্তুগীজ বংশোদ্ভূত না-ও হইতে পারেন। বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে

৫। Elliot and Dowson, "History of India", Vol. VI, Pp. 513-514 টাইটাস কর্ত্তৃক উদ্ধৃত; পৃঃ ৭০।

জানা যায় যে ভূষণার রাজকুমার খৃষ্টান হইয়া পর্ত্তুগীজ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আরব-উম্মিয়াদদের খলিফাদের সময় বিজিত জাতীয় লোকেরা মুসলমান হইলে তাহাদের আরব নাম ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইত। ইহাকে "আরব-সাম্রাজ্যবাদীয় যুগ" বলা হয়। ইহারই ফলে পারসিক, ঈজিপ্ত ও পশ্চিম-এশিয়ার মুসলমানদের সকল বিষয়েই আরব সাজিতে হইয়াছিল। পরে পারসিক জাতীয়তাবাদ উদ্ভূত হইলে, তাঁহারা ধীরে ধীরে পারসিক নাম পুনঃ প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন; আরব সাহিত্য ছাড়িয়া ফার্সী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে থাকেন। উপস্থিত সময়ে বিগত প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পারস্যে আরব সংস্কৃতির সমস্ত বাহ্যিক চিহ্ন বিতাড়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ফারসী ভাষা হইতে আরবী শব্দ বিতাড়িত হইতেছে। লোকের প্রাচীন জারতুষ্ট্রীয় যুগের নামকরণ হইতেছে, পোষাকেও তদ্রূপ। কেমালের সময় হইতে তুর্কিতে সেই প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে ইহার বিপরীত অবস্থা চলিতেছে। কথিত আছে যে, সম্রাট আকবর ভারতীয় মুসলমানদের পারসিক নাম রাখিবার প্রথা প্রচলিত করেন। তাঁহার রাজ্যে পারসিক "নও-রোজ" উৎসব (ইহা আসলে জারতুষ্ট্রীয় উৎসব, তাহা মুসলমান পারসিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন) প্রচলন করেন। তাঁহার "দীন-ইলাহীর" মধ্যে দিন ও মাসের প্রাচীন পারসিক নাম প্রচলন করেন (৬)।

ভারতীয় খৃষ্টানদের প্রতি হিন্দুদের যে মনোভাব দেখা যায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি তাহা অন্য প্রকার। খৃষ্টান ও হিন্দুর মধ্যে সেইপ্রকার তিক্ততা নাই যেরূপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আছে। অবশ্য খৃষ্টান-জন-সংখ্যার অত্যল্পতাও তাহার একটি কারণ। কিন্তু পূর্ব্বের মুসলমান শাসকদের

৬। আবুল ফজলের "আকবর নামা" দ্রষ্টব্য।

নির্য্যাতন ও ভারতীয়দের মুসলমানকরণকালে জাতিতাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাদের "বিদেশী" করায় এই তিক্ততা সৃষ্টি হইয়াছে এবং ফলে উভয় সমাজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়াই গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

—হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান—

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান কোথায় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাজের বাস্তব জীবনে এবং আইনে পার্থক্য আছে। বাস্তব জীবনে ভারতে স্ত্রীলোক সম্মান পাইয়াই আসিয়াছেন, কিন্তু আইনতগতভাবে স্ত্রীলোকের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না এবং এখনও নহে। এই বিষয়ে প্রাচীন ভারত সভ্যপদবাচ্য অন্যান্য ঐতিহাসিক জাতি-সমূহ অপেক্ষা পৃথক ছিল না, বরং সামাজিক জীবনে ভারতীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা ভালই ছিল। গ্রীসের কৌমাবস্থায় সামন্তযুগীয় হোমার-বর্ণিত আড্রোম্যাখি ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদের অবস্থার সহিত হিন্দুর পৌরাণিক মধ্য-যুগীয় রামায়ণ ও মহাভারতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার তুলনা করিলেই তাহা পরিলক্ষিত ও বোধগম্য হইবে। ব্যবহারিক জীবনে রোমীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা তৎকালীন ভারতীয় স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনা করিলে তাহা প্রতীত হইবে। সামাজিক জীবনে যে অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা ভালই ছিল, তাহার প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঘোষা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রীলোক ঋক্‌স্তোত্রের রচয়িত্রী ছিলেন। উপ-নিষদে যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় তথ্য শিক্ষা দিবার কথা পাওয়া যায়। মায়ার বলেন, প্লেটো কিম্বা অরিষ্টটলের কাছে কিম্বা খৃষ্টীয় মণ্ডলের ধর্ম্মনায়কগণ (Council of Fathers of the Church)—

যাঁহারা বরং স্ত্রীলোকের আত্মা আছে কিনা তাহা লইয়া তর্কবিতর্কে প্রস্তুত হইতেন, তাঁহাদের নিকট ইহা এক অসম্ভব প্রকারের হাস্যাস্পদ ব্যাপার হইত (৭)। কিন্তু ভারতে প্রস্তরযুগ হইতেই নানা মূলজাতীয় জাতিসমূহের বাসস্থান হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন জাতির সমাজতাত্ত্বিক বিবর্ত্তনও এক প্রকারের ছিল না এবং কোন সর্ব্বশক্তিমান রাষ্ট্রশক্তি সকলকে সভ্যতার সমস্তরে আনয়ন করিয়া সকলের একত্ব সম্পাদন করে নাই, আর হিন্দুধর্ম্ম তাহার নরতাত্ত্বিক ভিত্তিতেই অবস্থিত থাকাবশতঃ তাহার সমাজকে বাঁধা-ধরা একটা কাঠামোর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করায় নাই। এই জন্যই আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে এত বৈচিত্র্য ও অনৈক্য বিদ্যমান আছে। মায়ার যথার্থ বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকাল হইতে ভারতের লোকেরা এবং তাহাদের সংস্কৃতি আর্য্য ও আদিম জাতিদের মিশ্রণ দ্বারা উত্তরোত্তর জটিল হইতেছে (৮)। কাজেই নানাবিধ আচারে এবং সামাজিক অবস্থা আজ পর্য্যন্ত ভারতে দৃষ্ট হয়; বিভিন্ন জনসমষ্টি সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে আজ পর্য্যন্ত অটুট আছে, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এক সময়ে বাকোফেনের মতটি গৃহীত হইত যে, জগতে "মাতার-অধিকার" রূপ (Mother-right) প্রতিষ্ঠান দ্বারা পৃথিবীর সকল জাতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে (৯)। কিন্তু এই মত আজকাল আর অবিসম্বাদিতরূপে গৃহীত নহে। এক্ষণে বলা হয়, খুবই সম্ভব ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহে "পিতার অধিকার" রূপ (father-right) প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে 'পিতার অধিকার' প্রতিষ্ঠানটিই দৃষ্ট হয়, যদিচ ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে যে,

---

৭। J. J. Meyer, "Sexual Life in Ancient India", Vol. II, P. 44.

৮। Ibid; Op. cit P. 130.

৯। Bachofen, "Das mutter-recht."

সংসার পিতার স্বেচ্ছাচারিত্ব (Pater familias) রোমানদের ন্যায় ছিল না। গোলাপ শাস্ত্রী (১০) বলিয়াছেন, প্রাচীন আইনানুসারে স্ত্রীলোককে জীবন-ব্যাপীই অধীনতা স্বীকার করিতে হইত (মনু, ৯৩ ; যাজ্ঞবল্ক্য, ৮৫)। স্ত্রী-লোকের বিবাহের অর্থ, তাহার উপর পিতার যে অধিকার ছিল তাহা স্বামীকে হস্তান্তর করা। স্ত্রীলোক সম্পত্তিবিহীন হইত (মনু, ৮।৪।১৬)। কিন্তু পরে দায়ভাগোক্ত মনু ও কাত্যায়নে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোক ছয় প্রকারের 'স্ত্রীধন' প্রাপ্ত হয় (মনুকাত্যায়নৌ—৪।১।৪)। আবার নারদ, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রী-ধনের কথা বলিয়াছেন ; এবং দেবল বলিয়াছেন, এই স্ত্রীধনের উপর আপৎকাল ব্যতীত স্বামীর কোন অধিকার নাই। ব্যাসও বলিয়াছেন যে, এই সম্পত্তিতে তাহার জ্ঞাতিদের কোন অধিকার নাই (দায়ভাগোক্ত ব্যাস—৪।১।১৬)।

পিতৃগৃহে বাসকালে কন্যা ও পুত্রের কোন সম্পত্তি থাকিত না, বরং তাহারা নিজেরাই সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। কারণ তাহার উপার্জ্জিত অর্থ পিতারই সম্পত্তি হইত (মনু, ৮।৪।:৬)। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের আইনগত অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু কন্যার হইত না ; পরে গোলামের অবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে বিবর্ত্তিত হয়। বৌধায়ন বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা দায়াধিকার (inheritance) পাইতে পারে না, কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, ''শক্তিবিহীন এবং দায়াধিকারের অযোগ্য হইয়া স্ত্রীলোকেরা অকর্ম্মা" (বৌধায়ন, দায়ভাগোক্ত ১১।৭।১১), কিন্তু পরে স্ত্রীলোক 'স্ত্রীধন' পাইতে লাগিল এবং পরে অন্য প্রকারেও বিষয় পাইতে লাগিল (১১)।

খৃঃ চতুর্দ্দশ শতকে দুর্গাচার্য্যকে বলিতে শোনা যায়, পিতার কন্যা তাহার পুত্রের সহিত সমান, যেহেতু কন্যার পুত্র তাহার দৌহিত্র। তৎপর দুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, পুত্রের জন্মকালে যেসব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান (sacrifical rites) হয় তাহা কন্যার বেলার অনুরূপ। তৎপর গর্ভাধান ক্রিয়ার উৎসবকালে

১০-১১। G. shastri, "A Treatise on Hindu Law", Pp. 581-582.

যে সব শাস্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাও এক। এক প্রকারের শারীরিক অবস্থা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের জন্ম হয় (১২)। কিন্তু কৌমগত রীতি এই যুক্তি গ্রাহ্য করে নাই; যাস্কের (১২ ক) তর্কে প্রাচীনকালের বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখা যায়, এবং এই বোধগম্য হয় যে, লোকাচারই বরাবর বলবৎ থাকে।

বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠনের কথা পাওয়া যায় না। মদ্‌গলনী পত্নী সশস্ত্র শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গোধন উদ্ধার করিয়াছিলেন; জনকের সভায় গার্গী সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের তর্ক ও আলোচনা করিতেছেন। যজ্ঞস্থলে রাজমহিষীরা আসিয়া যোগদান করিতেছেন, ইত্যাদি সংবাদ জানা যায়। মায়ার বলেন, প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় রমণীগণ যে অবগুণ্ঠন ও অবরোধে থাকিতেন না তাহা পরিষ্কার দেখা যায় (১৩)। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত নাটকগুলি হিন্দুর সামন্তযুগে লেখা হয়; সেইজন্য রাজার বহুপত্নী, সহস্রাধিক কামপত্নী, তজ্জন্য রাজাবরোধ ও তাহা পাহারা দিবার নিমিত্ত প্রহরী, কঞ্চুকী (সৌরিদল্ল), নপুংসক ইত্যাদির অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহা সম্রাট ও সামন্ত রাজাদের ঘরের কথা। মায়ারই স্বীকার করিতেছেন, বর্ত্তমানের অবগুণ্ঠন বা অবরোধপ্রথা মুসলমান-বিজয়ের পর আবির্ভূত হয় (১৪)। দক্ষিণ-ভারত বা ভারতের যে সব প্রদেশ মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয় নাই, সেই সকল দেশের স্ত্রীলোকের এই সকল বিষয়ের প্রথার সহিত তুলনা করিলেই আসল তথ্য প্রকাশ পাইবে।

১২। The Nirghanta and the Nirukta of Yaska—tr, by L. Sarup, P. 229.

১২ (ক)। Idid—P. 41

১৩। Meyer—Op. Pp. 447—448.

১৪। Meyer—Op. cit. P. 512.

কিন্তু আইনতঃ স্ত্রীলোক তৈজসপত্রের ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় তাহাকে যে সব কদাচারের ভাগী হইতে হইত ইউরোপীয় জাতির স্ত্রীলোকদেরও প্রাচীনকালে সে সব বিষয়ের ভাগী হইতে হইত। মায়ার বলেন, রাজা মাত্রশ্বন প্রিয়তমা পত্নীকে বশিষ্টকে দান করিতেছেন (মহাভারত ১৩।১৩৭।১৮) এবং অতিথিকে স্ত্রীলোক উপহারের উদাহরণও সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। যুদ্ধে শত্রুদের স্ত্রীগণকে কয়েদ করা (মনু, ৭, ৯৬) ও এক ধার্ম্মিক সবরকে যুবতী বিধবা প্রদান করার কথাও (মহাভারত, ১৩।১৬৮।৩৩) তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (১৫)। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশেও এই রীতি ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকদের নিকট সংবাদ পাওয়া যায়। রোমের বড় পিউরিটান কেটো (Cato) তাঁহার বন্ধুকে নিজের স্ত্রী উপঢৌকন দিতে কিছু অন্যায় মনে করেন নাই। পশ্চিম এশিয়ার লিবেসন পর্ব্বতের আরবভাষী জাতিদের মধ্যেও এই প্রথা আছে বলিয়া পর্য্যটকেরা বলেন (১৬)। আটাইশ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের জনৈক রুশ সহপাঠী বলিয়াছিলেন, রুশদেশের উক্রেইন কৃষকদের মধ্যে আহারান্তে অতিথিকে রাত্রিতে নিজের স্ত্রীকেও উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা আছে। কোনও ভারতীয় পর্য্যটক শুনিয়াছেন, দক্ষিণ-জার্ম্মাণীর ব্যাভেরিয়ার কৃষকদের মধ্যে "গুরুপ্রসাদী" বা "গুরু-গাঁই" (Mercheta Mulierum বা Lex Primus Noctis—the right of first night) অনুযায়ী পুরোহিত বা জমিদারের নিকট স্ত্রীকে তাহার বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি যাপন-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। শেষোক্ত অনুষ্ঠানটি ফ্রান্সের বিপ্লব কাল পর্য্যন্ত সেই দেশে প্রচলিত ছিল (১৭)। তবে একথা সত্য যে, ভারতে 'গুরুপ্রসাদী' প্রথা এখনও অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত

১৫। Mayer—Op. Cit. P. 512

১৬। Burton's Travels

১৭। এই প্রথা সম্পর্কে Westermarck, "History of Human Marriage" এবং Alison, "History of Europe", Vol V দ্রষ্টব্য।

নহে। ইহা এই দেশের ধর্ম্ম ও সামন্ত-তন্ত্রের সহিত বিজড়িত হইয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে চলিয়াছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে চলিতেছে (১৮)।

এই সব প্রথা ধর্ম্মের ও অর্থনীতিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institution) সভ্যতার উন্নতি ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও পরিবর্ত্তিত হইলে অন্তর্হিত হয়। এই সব প্রথা কেবল ভারতেই আছে বা ছিল বলিয়া কটাক্ষপাত করা কেবল জাতিগত কুসংস্কার প্রদর্শন করা হয়।

মায়ার ভারতীয় প্রাচীন স্ত্রীলোকদের বিষয়ে আরেকটি আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মহাভারতে বর্ণিত তৎকালীন স্ত্রীলোকেরা দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য সাহিত্যে পুরুষের তুলনায় দৃঢ় মন এবং অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় ও কামযুক্ত স্ত্রীলোকের নজির পাওয়া যায়। প্রেমালাপের সময়ই এই সব লক্ষণ ধরা পড়ে। তিনি বলেন, প্রাচ্যের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সম্পর্কিত গল্পেও এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ইহা হয় ভারত হইতে, না হয় তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সেই সব দেশে আসিয়াছে। আর মধ্যযুগীয় ফরাসী সাহিত্যে ইহা নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এই প্রকারের স্ত্রীলোক ক্রিয়াশীল (active), পুরুষ ক্রিয়াহীন (passive); তাহার প্রিয়াই তাহাকে সুখী করে এবং ভারতে তাহার কাছে প্রিয়াই অভিসার করিতে আসে। তুর্গোনিয়েভ, পুস্কিন এবং অন্যান্য লেখকের মধ্যেও ইহা প্রতিভাত হয়। আবার ফরাসী সাহিত্য হইতে এই ভাবটি মধ্যযুগীয় জার্ম্মাণ সাহিত্যে আসিয়াছে (১৯)।

১৮। এই সংবাদ আজকালকার মার্জ্জিত রুচির ভদ্র লেখকেরা গোপন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গলার মেদিনীপুর, সিংভূম ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এই প্রথা এখনও কৃষকদের মধ্যে আছে।

১৯। J. J. Meyer—Op.cit. Vol. II. Pp. 437-438.

সমাজতত্ত্বের গবেষণার প্রথম তথ্যগুলি জাতিতত্ত্বের (Ethnology) উপর সত্য বটে, ভারতীয় স্ত্রীলোক প্রেমালাপকালে খুবই active এবং aggressive-রূপে সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও সত্য যে, সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব পদাবলী পর্য্যন্ত ভারতীয় বা হিন্দু সাহিত্যে "স্ত্রীলোক অভিসার করিতে যাইতেছে" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের শ্রীমতী বলিতেছেন, "যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে, যেখানে নিঠুর হরি।" সত্য বটে, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যে আজকালকার ইউরোপীয় সাহিত্যে-বর্ণিত coyish নায়িকা পাওয়া যায় না; কিন্তু তদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা ভারতীয় রমণীগণ অধিক কামুকা। বরং বলা যাইতে পারে যে, যে-কারণে ভারতীয় সাহিত্যের অনুকরণে প্রাচ্য ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সাহিত্যে নায়িকারা active ও aggressive বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন তদ্রূপই ভারতীয় এক সাহিত্যের লেখককে অনুকরণ করিয়া আর একজন লেখক তাঁহার নায়িকাকে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কারণেই ভারতীয় কবিদের নায়িকারা অভিসার করিতে বহির্গত হইতেন। ইহা সমাজতাত্ত্বিক 'অনুকরণ" (Imitation) (২০) তথ্যানুসারেই সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমালোচকদের মতানুসারে, ইহা ভারতীয় মূলজাতি-গত লক্ষণ (racial characteristic) না হইয়া, সাহিত্যিকের অনুকরণপ্রবৃত্তি দ্বারাই নায়িকা এইভাবে বিচিত্রিতা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

এবার স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

সমাজ-রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম্ম-পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হইয়াছে। হারিত বলিতেছেন,"ব্রহ্মবাদিনী" ও "সদ্যোবধূ' নামে দুই প্রকারের স্ত্রীলোক সমাজে আছেন। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তেরা উপনয়ন-

২০। Tarde—'Imitation.'

সংস্কারে, পবিত্র অগ্নিস্থাপনে, বেদাধ্যয়নে এবং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যায় অধিকারী। (২১) অন্যপক্ষে বিবাহিত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, দানার্থেই হউক, ধনার্থেই হউক, ধর্ম্মার্থেই হউক স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য নাই। তবে তিনি যুবতী বিধবার অসচ্চরিত্র হইলে খোরপোশ প্রাপ্তির আদেশ করিয়াছেন (স্মৃতি-চন্দ্রিকা)। আবার তিনি স্বামীকে তাহার অসৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই (মিতাক্ষরা ২। ১৩৫)। আপস্তম্ভ ও শাঙ্খ লিখিত প্রভৃতি স্মৃতিকারেরা স্ত্রীলোকের পুরুষের বিষয় অধিকার-প্রাপ্তি-বিষয়ে অস্বীকৃত হইয়াছেন ; যদিচ শেষোক্তেরা নিয়োগ-প্রথা সমর্থন করিয়াছেন(২২)। আবার বৌধায়ন কশ্যপের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন, (১-১১-২০) "ক্রীত স্ত্রীলোক পত্নীরূপে গৃহীত হইতে পারে না এবং এবম্প্রকারের স্ত্রীলোক দৈব ও পিতৃকর্ম্মে যোগদান করিতে পারে না"। 'স্মৃতিচন্দ্রিকা' স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যসমূহের মধ্যে 'পতির শুশ্রূষা করিলে স্ত্রীর পরম গতি হয়' বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন (২য়-খণ্ড,পৃঃ ২৫২) ; পুনঃ অপরার্ক পৈঠিনসী হইতে দুইটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণী ব্যতীত অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের 'সতী' হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন (পৃঃ-২৩৯)। আবার ইনি শঙ্খলিখিত গ্রন্থ হইতে একটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, রাজা স্ত্রীলোকের ধন অপহরণ করিবেন না (বিবাদরত্নাকরে শঙ্খ, পৃঃ ৫৯৪)। শাতাপক বলিতেছেন, স্ত্রীলোকের বিবাহের পর তাহার স্বামী-গোত্রপ্রাপ্তি হয় (শ্লোক ৭৮)। এই শ্লোকটিই মিতাক্ষরাতে উদ্ধৃত হইয়াছে (যাজ্ঞবল্ক্যের টীকা ১।২৫৪), কিন্তু কতিপয় খোদিত-লিপিতে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। একটী লিপিতে সম্রাট ২য় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা তাহার স্বামী-গোত্রের পরিবর্ত্তে পিতৃগোত্র প্রদান করিয়াছেন। (২৩)

২১। চতুর্বিংশতিতম ব্যাখ্যা—পৃঃ ১১৩। বারাণসী সংকলন।

২২। Kane : History of Dharmasastra Vol. I. Page 8.

২৩। Ep. Ind Vol. XV No. 4.

যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় (২।১৪৫) যম বলিয়াছেন, আসুর প্রথায় বিবাহিত স্ত্রীলোক অপুত্রক হইলে তাহার স্ত্রীধন তাহার পিতার প্রাপ্য (স্মৃতিচন্দ্রিকা), পৃঃ ২৮৬)। পুনঃ যম বলিতেছেন (৭৩), বেদ কিংবা ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি নাই। তাহার যথার্থ ধর্ম্ম হইতেছে, স্বজাতীয় স্বামীদ্বারা পুত্র প্রজনন করা (স্মৃতিচন্দ্রিকা, ব্য, পৃঃ ২৫৪)।

মধ্যযুগীয় নিবন্ধকারদের মধ্যে জীতেন্দ্রিয় এবং জীমূতবাহনের দায়ভাগে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী, পৃথক সংসারযুক্ত হউক বা যৌথ হউক বা সংসারের লোক হউক তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইবে (দায়ভাগ, পৃঃ ২৫৬)। পুনঃ বিশ্বরূপ (যাজ্ঞবল্ক্য টীকা ২।১১৯) বলেন, একজন লোকের জীবদ্দশায় তাহার সম্পত্তির ভাগ হইলে তাহার মৃত পুত্রদের এবং পৌত্রদের বিধবারা সম্পত্তির একটি অংশ পাইবে। পুনঃ, শ্রীকর বলিতেছেন, একজন মৃত পুরুষের ক্ষুদ্র বিষয় থাকিলে তাহার বিধবা সেই বিষয়ের অধিকারিণী হইবে (মিতাক্ষরা ২।১৩৫)। কিন্তু হরিনাথ তাহার 'স্মৃতিসার' পুস্তকে ইহার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (স্মৃতিসার I. O. Cat. NO 301. Folio128-a)। আবার আমরা দেখি বশিষ্ট (১৭।৭৪) বালিকা বিধবার বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন। কৌটিল্য (৩।৪) ও নারদ (বিবাহ সম্বন্ধ ৯৭) তাহার সমর্থন করিয়াছেন। পরাশরও তাহার সমর্থন করিয়াছেন। অন্যপক্ষে মনু বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন (৫।১৬১-১৬৫)। পুনঃ বিধবার অধিকার বিষয়ে মনু নীরব, কিন্তু মিতাক্ষরাতে সন্তানহীন লোকের সম্পত্তিতে 'বৃহৎ-মনু' নামক পুস্তকে একজন সন্তানহীন লোকের, সম্পত্তিতে তাহার বিধবার অধিকার আছে বলিয়া শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে (মিতাক্ষরা ২।১৩৫)। অন্যপক্ষে, নারদ বিধবার স্বামীর বিষয়াধিকারিণী হইবার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিচ তাঁহার পূর্ব্বে যাজ্ঞবল্ক্য ইহার স্বপক্ষে বলিয়াছেন। বৃহস্পতিও বিধবার স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (যাজ্ঞবল্ক্যের উপর টীকা অপরার্ক দ্বারা উদ্ধৃত ২।১৩৫)।

এই প্রকারে স্ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন যুগে স্মৃতি ও নিবন্ধকারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এত দ্বারা সামাজিক রাষ্ট্রে তাহা স্থান কি তাহা জানিতে হইলে আমাদের যে আইন দ্বারা হিন্দুরা পরিচালিত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা দেখি হিন্দুরা মিতাক্ষরা দায়ভাগ দ্বারা শাসিত। এই দুই আইন পুস্তক দ্বারা হিন্দুর দায়শাসিত ...তে আইনের ক্ষেত্রে হিন্দুনারীর স্থান নিরূপিত হইয়াছে। অবশ্য বর্তমানে বাতাবরণে আইনগত এই স্থান সুবিধাজনকও নয় এবং ন্যায্যও নয়। *

* "হিন্দু সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান" এই অধ্যায়টি ১৫৯ পৃষ্ঠায় যাইবার কথা ছিল। ভুলক্রমে বাদ পড়ায় এখানে দেওয়া হইল।

—গ্রন্থকার

B... ...RARY
... ২২২৪ ম ...১১০
C...
১১৬৩
Acc...
Date of Acc...